শ্রীশ্রীমহাবিরাট্-যুগললীলা

(শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ)

শ্রীগুরুপদ ভৌমিক কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩৪১ সাল, ইং ১৯৩৪।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী ও লেখকের নিজ বাটী
দেওভোগ।

এই পুস্তক বিক্রয় দ্বারা যে আয় হইবে তাহা
শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে
এই সংকল্প রহিল।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রিণ্টার—এস, সি, গুহ,
হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট

সমালোচনা।

কতকগুলি বিশদ সূচীপত্র

ভূমিকা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

যদিও সমালোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয় তথাপি প্রথমবারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্রের পুস্তকের মিথ্যা উক্তি সকল জনসাধারণকে দেখাইয়া দিবার জন্য কতকগুলি অপ্রিয় সত্য বিজ্ঞ, হিতৈষী বন্ধুদের আপত্তি সত্ত্বেও লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এবার তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রথমবারের ভূমিকা হইতে তাহা উঠাইয়া দিলাম। কতগুলি পুস্তকের শেষভাগে সমালোচনা হেডিং এতে দেওয়া হইল।

উক্ত বন্ধুব্যক্তিদের আরও আপত্তি ছিল যে, কোন কোন যায়গায় এ অঞ্চলের গ্রাম্যশব্দ লেখা হইয়াছে, যথা :—"বাপ মশয়," "কাবু," "কায়দা," "আইখা আলা বাঁশ" ইত্যাদি। কিন্তু সে আপত্তি আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না ; কারণ যে শব্দগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর বা শ্রীশ্রীমা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা রাখাই আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম।

আরও আপত্তি ছিল যে, কোন ঘটনায় রুচিবিরুদ্ধ কথা, * ঠাকুরের হিংসা, মাতাঠাকুরাণীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার, রাগ †

---

* শশিভূষণ ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৩৩২ সন সংস্করণ পৃঃ ১৯০, ২০০, ২১১। শ্রী—ম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ২৪০, ২৭১।

† স্বামী শারদানন্দের লীলা প্রসঙ্গ (সাধক ভাব) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৬৯, ১৭১, ১৭২। শশিভূষণ ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৩৩২ সন সংস্করণ পৃঃ ১৪৭। শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাধুনাগ মহাশয় ৫ম সংস্করণ পৃঃ ৭২, ৭৩, ৭৪, ১০৭, ১১২।

ইত্যাদি লেখা হইয়াছে; যথা ঃ—মাছধরার সঙ্গে ছিলেন, মা'কে চুবাইয়া মারিতে নিলেন, ননদিনীর নিন্দা ইত্যাদি। সে সব আপত্তিও আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ লীলাচ্ছলে যে সব ঘটনা হইয়াছে তাহার একটীও ছাড়িয়া বা অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি।

জীববুদ্ধিদ্বারা মহাপুরুষদের দোষগুণ ধরা বা কল্পনা করিয়া কিছু লেখা আমার নিকট ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। কাজেই বিশুদ্ধভাবে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। কেন করিয়াছেন, ইহার উত্তর যিনি করিয়াছেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাস্য এবং উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

বিনোদিনী মিত্রের দ্বিতীয় ছেলে শ্রীমান দুর্গাপদ মিত্র এম,এ, বি, এস্-সি, বি, এল এড্ভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট প্রথমবারের ভূমিকার জন্য একখানা সমালোচনা কলিকাতার ৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের গৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করে। অশ্লীল উক্তির দরুণ নারায়ণগঞ্জের ফৌজদারী আদালতে ৫০০ ধারায় ৭৩৪।১৯৩০নং মোকদ্দমায় মানহানির অপরাধে তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরিমানা তদ্বিনিময়ে পাঁচ মাস কারাদণ্ডের এবং $\frac{৭৩৪}{১৮৯}$ } ১৯৩০নং মোকদ্দমায় কোর্টে লিখিত ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও ১০০৲ এক শত টাকা জরিমানা তদ্‌বিনিময়ে তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এবং ঢাকা দ্বিতীয় সব্‌জজ-আদালতে মানি স্যুট ১৯।১৯৩১নং মোকদ্দমায়

লিখিত ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ও তাহার খরচ ডিক্রী হয়। উক্ত পুস্তিকার প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রথমেই নারায়ণগঞ্জ ফৌজদারী আদালতে ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্রের বড় ছেলে শ্রীমান দুর্গাদাস মিত্র এম্, বি ও তাহার বড় মাসী শ্রীমতী সৌদামিনী বসু, আলিপুরের উকিল ৺ সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী, শিয়ালদহ ফৌজদারী আদালতে আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। তাহা ডিস্‌মিস্ হয়। সকলগুলি ফৌজদারী মোকদ্দমাই তাহারা ঊর্দ্ধতম আদালত পর্য্যন্ত লড়িয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। লোকে বলে "যথা ধর্ম্মঃ তথা জয়ঃ"।

পুস্তকের লীলাপ্রসঙ্গ সবই ঠিক রহিল, মাত্র ২।৪টী ঘটনা যাহা পরে সংগৃহীত তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং স্থানে স্থানে ভুল সংশোধন করা হইল। ষষ্ঠ অধ্যায়ের টাকা আদান প্রদানের কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। যে জন্য তাহা লেখা হইয়াছিল প্রথমবারের ভূমিকায় ১৲ পৃষ্ঠায় তাহার কারণ বর্ণিত হইয়াছিল।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তকখানা দেশী কাগজে কম খরচে ছাপান হইল, এবং লাভের দিকে না চাহিয়া খুব কম মূল্য ধার্য্য করা হইল। আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বসাধারণ এই 'ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি' জীবনের লীলাকাহিনী অবগত হইবার জন্য ঘরে ঘরে একখানা করিয়া পুস্তক রাখিবেন ইতি।

(প্রথম সংস্করণ)

আমি এই যুগললীলা প্রসঙ্গ লিখিবার উপযুক্ত মোটেই নহি, তথাপি যে কারণে লিখিতে প্রয়াস পাইলাম, তাহা উল্লেখ করিতেছি। সমালোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়; সত্য প্রচার হয় এবং অসত্য চাপা পড়ে ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে দুইখানা পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ঘটনাই লেখক ও লেখিকার নিজ কল্পিত ও মনগড়া; সত্যের সঙ্গে সংশ্রব নাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "সাধু নাগ মহাশয়" নামে একখানা পুস্তক বাহির করিয়াছেন। বহির নাম শুনিয়াই, যাঁহারা ঠাকুরের কাছে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই পুস্তক পড়েন নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও ইহার মর্ম্ম অবগত ছিলেন না। পরে শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র "শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়" নাম দিয়া আর এক খানা পুস্তক বাহির করিয়াছে। বিনোদিনী মিত্র আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের সাক্ষাৎ মামা শ্বশুর ৺রাজকুমার নাগের দ্বিতীয়া কন্যা।

একদিন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের শ্বশুর উমাচরণ ঘোষ আমাদের বাড়ী আসিয়া বিনোদিনীর পুস্তকের কথা বলেন। তিনি বিবাহাবধি রাজকুমার নাগের বাড়ীতেই বসবাস করেন। আমি সেই পুস্তক আনাইয়া পড়িয়া যখন দেখিলাম, কেবল মিথ্যারই ছড়াছড়ি, তখন শ্রীশ্রীমা'কেও পড়িয়া শুনাইলাম। এই পুস্তকে এবম্বিধ মিথ্যা উক্তি দেখিয়া শরৎ বাবুর বহিও

আনিয়া পড়িলাম; এবং তাহা দেখিয়াও অবাক্ হইলাম। তাহাও মা'কে পড়িয়া শুনাইলাম। এই দুই পুস্তকের ঘটনা শুনিয়া মা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

মোটকথা দুই চারিটী ঘটনা বাদ দিলে বই দুখানা সবই মিথ্যা অতি রঞ্জিত বা প্রক্ষিপ্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মজীবন শেষ করিয়া দেশে অবস্থান কালীন শরৎ বাবু কলেজে পড়িতে ৪ বৎসর ঢাকা ছিলেন, পার্ব্বতী মিত্রও ঢাকা পড়িতেন, তখন মধ্যে মধ্যে দেওভোগ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতেন, বিনোদিনীও পূজা পার্ব্বনে ও প্রতি মাসে ৫।৭ বার তাহার অন্যান্য ভাই, ভগ্নি, বাপ মা কিম্বা অন্যের সঙ্গেও পিত্রালয় হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিত। কাজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনিক জীবন বৃত্তান্ত কিম্বা কলিকাতা অবস্থান কালীন পাঠ্য বা কর্ম্মজীবনের কোন ঘটনাই তাহারা নিজে অবগত নহেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী মা ছাড়া কাহাকেও কিছুই বলিতেন না এবং শ্রীশ্রীমাও বলেন নাই, সুতরাং শরৎবাবু ও বিনোদিনী মিত্র ভিত্তিহীন শুনা কথা অথবা নিজ কল্পিত মনগড়া কথা লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম ও শ্রীশ্রীমা'র নামদিয়া লোকের প্রত্যয় জন্য অনেক কথা লিখিয়াছেন। পাঠকবর্গ এই বই পড়িলেই প্রকৃত সত্য জানিতে পারিবেন, তাঁহাদের মিথ্যা বুঝিতে ও ধরিতে পারিবেন। শরতবাবু কলেজে পড়ার সময় প্রথম দেওভোগের সত্য গোপালের প্রিয়তম ভক্ত হন। তাহাকে ভগবান বলিয়া বলিতেন এবং তিনি ছাড়া আর

কেহই নাই এরূপ প্রকাশ করিতেন; এবং তাহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। তৎপর সত্য গোপালের শুভড্যার এক শিষ্যাকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং তথায় যাইতেন। কিছুদিন পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া ভক্ত সাজেন। ঢাকা হইতে কলিকাতা পড়িতে যাইয়া বেলুর মঠের ভক্ত হন এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য বলিয়াও দাবি করেন। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহি লিখেন কাজেই সত্যের অপলাপ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের পূর্ব্বে 'সাধু' লিখিতে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরমহংস দেবের শিষ্য সাজাইতে এবং কল্পিত মনগড়া কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসানের পড়ই কলিকাতা যাইয়া যে পত্রখানা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা পড়িলেই দেখিবেন যে কালের কুটীল গতিতে তাহার কিরূপ ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং কেন সত্যের অপলাপ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনাগাবধূতায় নমঃ ॥

৭৩নং বীডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৮।১।০০

গুরু ভ্রাতৃগণ সমীপেষু ঃ—

কে বলে শ্রীগুরুদেব হইয়াছে তিরোধান ?
প্রতি পদক্ষেপে তাঁরে হেরি যবে বিদ্যমান।
সেই মূর্ত্তি, সেই হাস্য,
জ্যোতির্ম্ময় সেই আস্য,
সতত বিতরে স্নেহ-দৃষ্টি-সুধা হৃদি মাঝে।
সেই সুমধুর স্বর দিবানিশি কর্ণে বাজে ॥১॥ (এবমেতৎ)

কি ভয়, কি ভয়, ভাই সম্মুখে জ্বলন্ত জ্যোতিঃ।
ত্যজহ ক্লীবতা,—হবে করে আসমুদ্রক্ষিতি ॥
নাম—জয়ডঙ্কা তাঁর,
কাঁপাবে স্বর্গের দ্বার,
সন্দেহ না করি কিছু থাকে যদি গুরুবল।
বিশ্বাস-বিশ্বাস মাত্র আমাদের সুসম্বল ॥২॥ (এবমেতৎ)

গুরুতে বিশ্বাস যার সে-ই ধন্য ধরাধামে।
জীবনে মরণে সুখ সতত শ্রীগুরু নামে॥
এক মাত্র কৃপা তাঁর,
আমাদের কর্ণধার,
সংসার-সাগর-ঘোরে নিশ্চয় জানিও স্থির।
সিংহের তনয় মোরা—মহাবল—মহাবীর ॥৩॥
(এবমেতৎ)

যদি ভক্তি করে থাকি গুরুদেবে একদিন।
যদি মন হ'য়ে থাকে বারেক সমাধিলীন্॥
দিব্য করে বলি তবে,
নিশ্চয় মঙ্গল হবে,
শ্রীদুর্গা চরণে যেই সপিয়াছে মনঃ প্রাণ।
মিথ্যা হ'লে কেটে ফে'ল এদীনের নাক কাণ ॥৪॥
(এবমেতৎ)

সম্মুখে সমস্যা বটে, ভীষণ জলদ-জাল্।
তাঁর কৃপা কটাক্ষেতে রবেনা এহেন হাল্॥
অচিরে তিমির ভেদী,
উঠিবে প্রদীপ্ত রবি,
জ্বলন্ত প্রভায় যার ধাঁধিবে জগতবাসী।
একথা না মিথ্যা হবে থাকিতে দিনেশ শশী ॥৫॥
(এবমেতৎ)

ক্লীবতা, সন্দেহ সবে ছাড়,—মনে আন বল।
গুরু গুরু গুরু নাদে কাঁপাও গগনতল ॥
সিংহের তনয় হয়ে,
হীন জম্বুকের ভয়ে,
স্রোতজলে অঙ্গঢেলে ভাসিতে সময় নাই।
মার মার শব্দে এবে অগ্রসর হও ভাই ॥৬॥
(এবমেতৎ)

মরিতে হইবে সবে যদি না সন্দেহ তার।
বীরসাজে মরা ভাল, উৎসর্গ কি আছে আর ?
পশ্চাতে করুণা তাঁর,
সম্মুখে পুরুষকার,
এই সে বীরের বাক্য—এই সে বিতত পথ।
গুরু নামে আজ হতে হও সবে একমত ॥৭॥
(এবমেতৎ)

তাঁর মত পূর্ণজ্ঞান পূর্ণভক্তি একাধারে।
জগতে দেখিনি কভু বলি আমি বারে বারে ॥
তাঁর নাম নিয়ে মুখে,
তাঁহারে ধেয়ানি বুকে,
আর কি মজিতে পারি কামিনী কাঞ্চন রসে।
তরিব—তরাব জীব কোটী কোটী অনায়াসে ॥৮॥
(এবমেতৎ)

যার ইচ্ছা হাস্য কর—মিথ্যা নয় বাক্য মোর।
নিশ্চয় কাটিব মায়া পেয়েছি করুণা জোর ॥
বুঝেছি জগৎভান্
মহামন্ত্র পরাজ্ঞান্
দেহ অন্তে মহাশিব গুরুতে হইব লয়।
ছার দেব, ছার ধর্ম্ম—গাও গুরু জয় জয় ॥৯॥
(এবমেতৎ)

দ্বিগুণ উৎসাহে মাত অদ্য হ'তে মহারণে।
ঘৃণা লজ্জা জঞ্জালাদি দেহ বিজ্ঞান আগুনে ॥
দুর্ব্বলতা অবিশ্বাস
সাক্ষাৎ নরকবাস
মনে রেখ ভ্রাতৃগণ ছাড় বাদ বিসম্বাদ।
গুরু পদে ভক্তি হোক্—কর মোরে আশীর্ব্বাদ ॥১০॥
(এবমেতৎ)

মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী মা যে আমাদের ভাই।
তাঁর প্রতি আমাদের নিরবধি দৃষ্টি চাই ॥
তাঁর বিন্দু অশ্রুজল,
পড়িলে ধরণীতল,
আমাদের নাহি মুক্তি সে মহাপাতক হ'তে।
মোরা ভিন্ন কেবা আছে তাঁহারে সান্ত্বনা দিতে ॥১১॥
(এবমেতৎ)

চিরকাল গুরুপদে রহিয়াছ তোমা সবে।
বঞ্চিত ছিলাম আমি দূরে থেকে সেবা ভাবে॥
তোমরা সুবুদ্ধিমান্
গুরু জ্ঞান, গুরু প্রাণ,
বৃথা বাচালতা মোর ক্ষম সবে নিজগুণে।
জন্মে জন্মে বাঁধা ইন্দু শ্রীগুরু দুর্গাচরণে ॥১২॥

(এবমেতৎ)

Sd. Sarat Chandra Chakrabarti.
73, Beadon Street, Calcutta.
8-1-00

শ্রীশ্রীমা'কে বহুদিন কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলাম যে যার যাহাইচ্ছা তাহাই মিথ্যা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমা'র নামে লিখিবে এবং লোক সমাজে প্রচার করিবে, আর সত্যের বিনিময়ে যে কোন মিথ্যা লোকে সত্য বলিয়া বুঝিবে, এ কেমন ব্যাপার! আর এমন 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' জীবনের ঘটনাসমূহ লোকাপবাদে গণ্য হইবে, এ বড় কষ্টের বিষয়। এইরূপে বহুকাল ধরিয়া বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীমা নিজগুণে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা

প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কথাচ্ছলে মা'র নিজের জীবনেরও কয়েকটী কথা বলিয়া ফেলেন। শ্রীশ্রীমা যেরূপ যখন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তখন লেখা হইয়াছিল, এবং মা'র আদেশানুসারে যুগল লীলার একটী কথাও অতিরঞ্জিত না করিয়া ছাপাইবার পূর্ব্বে মা'কে পড়িয়া শুনাইয়া প্রকাশ করা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের দুই চারিটী ঘটনা অন্যের নিকট হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদের নামও উল্লেখ করা গেল। এই পুস্তকের ভাষার ত্রুটী মার্জ্জনীয়। কারণ, আমি সাহিত্যিক বা পুস্তক লেখক নহি; কিন্তু ইহার একটী ঘটনাও মিথ্যা বলিয়া যাঁহার সন্দেহ হইবে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীমা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা হাটখোলার দত্তবংশের সুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেওভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়—ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ লিখিতে শ্রীশ্রীমা'র নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন, এবং মা'র নিকট লীলা প্রসঙ্গ জানিতে চাহিয়াছিলেন। মা কাহাকেও কোন প্রসঙ্গ বলেন নাই বা লিখিতে অনুমতি দেন নাই।

পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন কি দুইটি অপূর্ব্ব নির্ব্বিকার মূর্ত্তি সংসারে প্রকৃতি পুরুষ রূপে যুগল লীলা করিয়াছেন।

অধিক আর কি লিখিব? যিনি মাতার মূর্ত্তি ও আচার ব্যবহার দেখিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইবেন, ইনি জৈবিক ধর্ম্মের অধীন মানবী নন মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ ভগবতী জননী।

"নির্গুণ পিতা মম, স্বগুণ মাতারী, কাকে নিন্দি কাকে বন্দি দোন পাল্লা ভারী।" "তাইর চেয়ে তাই বাড়ে।" এইরূপ অভিনব লীলা সংসারে আর হয় নাই। ঠাকুর ও মা প্রকৃতি পুরুষরূপে লীলা করিয়াছেন। ছায়া যেমন সঙ্গে থাকে সেইভাবে মা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঠাকুরের প্রত্যেক কার্য্যের সহায় হইয়া লীলার মহিমা বাড়াইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া বেদের অগম্য সার, বেদান্তের তত্ত্ব, মন্ত্র, পুরাণের নিগূঢ় তত্ত্বের খেলা এই যুগলরূপে দেহ ও কর্ম্ম দ্বারা করিয়া দেখাইয়াছেন। অবতারদের ভিতর যে সব বিষয় বা ভাবের বিকাশ নাই, অথবা সমষ্টি অবতারের ভাবের একত্র বিকাশ এবং অবতারগণ যাহা নিজেরা সম্যক্ পালন করিতে পারেন নাই, মাত্র উপদেশ চ্ছলে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভাব সমষ্টির বিকাশ শ্রীশ্রীঠাকুর জীবনে একটী একটী করিয়া লীলাচ্ছলে প্রতিফলিত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্ব প্রেমের কি বিচিত্র বিকাশ! যিনি একটী গাছের পাতা পর্য্যন্ত ছিঁড়িতে পারেন নাই, যুবক-যুবতী স্বামী-স্ত্রী আজীবন একত্র বসবাস করিয়া একে অন্যের ভাবে বিভোর হইয়া মাতা ও শিশুর ন্যায় কালযাপন করিয়াছেন; যিনি

আজীবন পশুযোনি পর্য্যন্ত মাতৃযোনি জ্ঞান করিয়াছেন; যিনি কীট, পতঙ্গ ও দেবতাকে সমজ্ঞান করিতেন, এবং ধূলি কণায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মভাব অনুভব করিতেন; এক কথায় যিনি ভালবাসার একখানা খনি ছিলেন; যিনি জন্মাবধি বিদেহী ছিলেন, সেই ঠাকুরের অদ্ভুত লীলা রহস্য পড়িয়া একটুকু বিচার করিলেই দেখিতে পারিবেন যে, ঠাকুরের জীবনে কোনরূপ বাসনার লেশমাত্র ছিল না। অবতারগণের মধ্যে দেখা যায় প্রত্যেকে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়া আসিয়াছেন এবং তাহা করিতে যাহা প্রয়োজন সবই করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়োজন খাওয়া পরার পর্য্যন্ত ছিল না। লোকের নিকট দীনহীন ভাব—যেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এমন কি, একটী কথাও আমি বলিতেছি, এরূপ ভাবে বলিতেন না। কোন কথা হইলে বলিতেন,—গীতা বলে, ভাগবত বলে, অবধূত বলে, ইত্যাদি। বাঁচিয়া থাকিতে যতটুকু বাসনার দরকার সেটুকুও একমাত্র আত্মগোপনই মনে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কেহ যদি কোথাও এইরূপ জীবন দেখিয়া থাকেন, আমাকে জানাইলে ধন্য হইব এবং কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই যুগললীলায় যাহা প্রস্ফুটিত, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন অবতারের মধ্যেই আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহাবিরাট্‌ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। এজন্যই সর্ব্বোচ্চ বিশেষণ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীশ্রীমহাবিরাট্‌ বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমহাবিরাট্-যুগল লীলা।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীমাতৃভ্যঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিদ্যারূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ইতিবৃত্ত।

বংশ পরিচয়

শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয় দেওভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণগঞ্জ—দেওভোগ ঢাকা জিলার অন্তর্গত। তিনি দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের পুত্র ও প্রাণকৃষ্ণ নাগ মহাশয়ের

পৌত্র। দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের দুই ভগিনী—ভগবতী দেবী ও ভারতী দেবী। ভগবতী দেবী বালবিধবা। তিনি পিত্রালয়ে থাকিতেন। ভারতী দেবী স্বামী গৃহে থাকিতেন এবং ভগবতী দেবীর পূর্ব্বেই মারা যান।

নাগ মহাশয়দের আদিপুরুষ বরিশাল জিলার করাপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা জমিদার ছিলেন। মাতা-পিতৃহীন এক শিশু সেই জমিদারীর আংশিক মালিক ছিল। সে এক পরিচারিকা দ্বারা প্রতিপালিত হইত। সরিকৃগণ তাহার অংশ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য লোক নিযুক্ত করে। পরিচারিকা তাহা টের পাইয়া রাত্রিকালে সেই শিশুকে নিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করে। নদীর পারে আসিয়া এক নৌকা পায়, নৌকার মাঝিকে কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাতে উঠে। উহা ঢাকা জিলাস্থ ধান্যের বেপারীদের নৌকা ছিল। মাঝিরা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তাহাদিগকে নিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া দিল। সেই সময় বিক্রমপুরের অন্তর্গত তিলারদী নামে এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান মালখানগরের নিকট তিলারদী গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া অদ্যাপি এক চর তিলারদী নামে খ্যাত আছে। তথায় এক হাট বসিত ; সেই হাটে ধান্য বিক্রয়ের জন্য বেপারীরা নৌকা লাগাইল। সেই গ্রামে হাটের মালিক ছিলেন ভূঞারা (ভৌমিকরা)। কিংবদন্তি যে এই ভূঞা নবাব আমলের বার ভূঞার এক ভূঞা ছিলেন। ইঁহারা অতি

দুর্দ্দান্ত ও প্রতাপান্বিত ছিলেন। মাঝিদের মুখে ভূঞাদের প্রতাপের কথা শুনিয়া শিশুকে নিয়া সেই পরিচারিকা ভূঞাদের বাড়ী যাইয়া সব বৃত্তান্ত বলিল। কর্ত্তা সব শুনিয়া তাহাদিগকে স্থান দিলেন এবং শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথাসময়ে বংশের এক কন্যা বিবাহ দিয়া এই বালককে একখানি গ্রাম যৌতুক দিলেন। কালক্রমে তিলারদী নদীগর্ভে বিলীন হইলে ভূঞারা নারায়ণগঞ্জ—দেওভোগে স্বস্ব নামে তালুক করিয়া বাড়ী করেন, ও অন্যান্য জায়গা খরিদ করেন। রামদয়াল ভূঞা শ্রীশ্রীমা'র পিতা,—এই ভূঞাদের একজন বংশধর। কাশীরাম নাগ ও আত্মারাম নাগ তথায় বাড়ীর জন্য জায়গা খরিদ করেন। আত্মারাম নাগ বিক্রমপুরের অন্তর্গত পঞ্চসার—মোক্তাপুর গ্রামে বিবাহ করিয়া ঘর-জামাই থাকেন। রাজকুমার নাগ এই আত্মারাম নাগের বংশধর। কাশীরাম নাগের পুত্র রামমণি। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র দীনদয়াল। কাশীরামের অপর পুত্র রামমোহন নাগের বংশধর রঘুনাথ নাগ দেওভোগ ঠাকুর বাড়ীরই সরিক ছিলেন। তিনি দীনদয়ালের জ্যেঠতুত ভাই ছিলেন। তাঁহার এক পৌত্র এখনও বিক্রমপুর বেতকায় বাস করিতেছেন। অপর পৌত্র সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে এখনও মা'র জন্ম-মৃত্যুতে পূর্ণ অশৌচ হয়।

জন্মভূমির পরিচয়।

দেওভোগ গ্রাম ঃ—উত্তরে মাসদাইর, তিন মাইল দূরে সেহাচর। দক্ষিণে—মাড়ইলার মাঠ। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে—কাশীপুর। পূর্ব্বে— নারায়ণগঞ্জ। পশ্চিমে—বারৈভোগ, তিন মাইল দূরে হরিহরপাড়া ও ধর্ম্মগঞ্জ।

পূর্ব্ব ভিটীতে ছনের দোচালা বারান্দা-ওয়ালা ঘর, "আয় সতর বন্দ। পশ্চিমের ভিটীতে একখানি পনর বন্দ দোচালা বারান্দা-ওয়ালা ছনের ঘর ছিল। দক্ষিণের ভিটীতে পনর বন্দ দোচালা ঘর—বারান্দা ছিল না। উত্তরের ভিটীতে রান্নাঘর পনর বন্দ দোচালা—বারান্দা ছিল না,—এই ঘরে রান্না হইত। পূর্ব্ব ভিটীর দক্ষিণ দিকে উত্তরের ভিটীতে উনিশের বন্দ চৌচালা ঘর ছিল— সম্মুখে বারান্দা ছিল; এইটীই বাহির বাড়ীর মণ্ডপ ছিল। ঐ বাহির বাড়ীর পশ্চিমে দোচালা ছনের পনর বন্দ গরুর ঘর ছিল। দাদা পূর্ব্ব ভিটীর মালিক ছিলেন। অন্যান্য ভিটী পরে তিনি খরিদ করেন।

পূর্ব্বে এই বাড়ীতে ছয় সরিক ছিলেন। তাঁহাদের যার যার সীমানায় উঠানে কাঁটার বেড়া ছিল। ক্রমে লোকজন বাড়ীতে না থাকায় সমস্ত ঘরই পচিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এক দক্ষিণের ভিটীর ঘর ভাল ছিল। আর পূর্ব্ব ভিটীর ঘরের বারান্দার চাল খাড়া ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বেড়া ছিল না। লাবণ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাগ্নি জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া ঠাকুর নিজ হাতে বাঁধিয়া পশ্চিমের ভিটীতে ছোট একখানি ঘর উঠান। সেই

বৎসরই পূর্ব্ব ভিটাতে সাবেক রকম ঘর উঠান হয়। শেষে ঐ পশ্চিমের ঘরেই রান্না হইত। পূর্ব্ব ভিটার ঘর তৈয়ারী হইলে কিছুদিন পরে দক্ষিণের ঘর পড়িয়া যায়, কেবল খুঁটী খাড়া থাকে।

যে বৎসর প্রথম দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়, সেই বৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে উঠান যখন জলে ভরা ছিল, তখন উত্তরের খালি ভিটাখানি বড়ই সুন্দর দেখাইত—যেন হাসিতেছে। ঠাকুর বলিতেন, "ভিটাটা এমন দেখা যায় কেন?" ঠান্-দিদি অনেক সময় এই ভিটার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেন, ঠাকুরকেও বলিয়াছিলেন। ঐ বৎসর উত্তরের ভিটাতে আয় সতর বন্দ বারান্দা সহ ছনের চৌচালা মণ্ডপ, এবং দক্ষিণের ভিটাতে বারান্দা ছাড়া ছোট দোচালা ঘর উঠান হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে ছোট একখানা ছনের ঘর ছিল; সে জায়গাটী মণ্ডপ ও পূর্ব্বের ঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ছিল। পূর্ব্বের ঘরের পিছনে ও উত্তরের ঘরের পূর্ব্ব প্রান্তে বাঁশ ঝাড় ছিল। উঠানের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটী ঝাঁপাল চারা আম গাছ ছিল। গাছটি একটু পূর্ব্বদিকে হেলিয়া প্রায় উঠান ছাইয়া ফেলিয়াছিল। উঠানের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটী ঝুমকা জবা গাছ ছিল। একটী রোয়াইল গাছ উত্তর পশ্চিম কোণে ছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে একটী আমগাছ মণ্ডপের সম্মুখে পশ্চিম দিকে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণের ঘরের পূর্ব্বদিকে তিনটী আমগাছ ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণের

ঘরের পশ্চিম দিকে দুইটী ও গড়ের কিনারায় একটী আম গাছ ছিল, এখনও আছে। একটী বড় তেঁতুল গাছ দক্ষিণে ছিল, তাহার তেঁতুল এত মিষ্ট ছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখা যায়না। একটী চালিতা গাছ দক্ষিণের ঘরের পূর্ব্বদিকে ছিল, তাহার ফল অতি মিষ্ট ছিল, এবং পশ্চিম দিকে একটী ডহুয়া গাছ ছিল, তাহার ফল ও অতি মিষ্ট ; এতদ্দেশে এই ফল এত মিষ্ট কেহ দেখে নাই। বাড়ীর পশ্চিমে একটী ছোট পুকুর ছিল, তাহা শুকাইয়া যাইত। দক্ষিণে একটী গর্ত্ত ছিল তাহার পারে একটী বড় হিজল গাছ ছিল। গর্ত্তের দক্ষিণ পারে একটী মাঠের চারিদিকে জঙ্গল ছিল। বাড়ীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে গড় ছিল। পশ্চিমের গড় পশ্চিম দিকের পুকুরে আসিয়া পড়িয়াছে। উত্তরে চৌধুরীদের পুকুর, তাহাতে ভাণ্ডবাসন মাজা হইত। দক্ষিণের গর্ত্তের জলই স্নান ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঐ গর্ত্ত ফাল্গুন চৈত্র মাসে শুকাইয়া যাইত। পলসাইদের পুকুরে যাইয়া স্নান করা হইত ও খাবার জল আনা হইত, কয়েকদিন গগন দত্তের পুকুর হইতে জল আনা হইত, কিন্তু পাগলিনীর ছেলে জলে ডুবিয়া মরার পর হইতে তাহার জল আর আনা হয় নাই। পাগলিনী গগন দত্তের কন্যা ; তাহার নাম সারদা। পলসাইদের পুকুর ও এ বাড়ীর মধ্যে একখানি মাঠ মাত্র। এই বাড়ীতে বর্ষায় অনেক জল হইত।

দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের জীবনী।

দীনদয়াল নাগ মহাশয়কে ছোট সময় লেখাপড়া শিখিতে ভগিনীবাড়ী হরিহরপাড়ায় দেওয়া হয়। সুপারি বেচিতে বলায় তথা হইতে বার বৎসর বয়সে একাকী কলিকাতা চলিয়া যান, তখন রেলগাড়ী হয় নাই। কলিকাতা যাইয়া দেশের একজন পরিচিত লোকের নিকট উপস্থিত হন, অভিপ্রায় ছিল ওখানে দুই চারি দিন থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিবেন, কিন্তু লোকটি তাঁহাকে নৌকার বৈঠার মধ্যে জমা খরচ লেখার সঙ্কেত দেখাইয়াই চলিয়া গেলেন, আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। পরে এক দোকানে যাইয়া চিড়া কিনিয়া খাইয়া এক পয়সা দিয়া থালাখানি ধোয়াইলেন, অসম্মানের ভয়ে নিজে ধুইলেন না। একবার গ্রামস্থ রাউৎবংশীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কলিকাতা যাওয়ার পথে এক নমশূদ্রবাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন, রান্নার বেশ বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু লাকড়ী ভিজা ছিল। দাদা তাহাদের আনাগোনায় ডাকাত বলিয়া টের পাইলেন এবং তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "বাহ্যের বেগ হইয়াছে, আমার সঙ্গে দাঁড়াও, অন্ধকার রাত্রি ভয় করে।" এই ভাণ করিয়া পলাইয়া আসেন।

একবার নৌকাযোগে আসিতে নদীর ভাঙ্গা পারের ফাটল দিয়া একটী বরিশালী ঘটির কান্ধা দেখেন, কিন্তু তাহার মধ্যে টাকা, কি মোহর, তাহা দেখিতে উৎসুক না হইয়াই চলিয়া আসেন।

পালদের আত্মীয় কুণ্ডবাবুদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল, একটী মোকদ্দমায় তাঁহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন। আরও বলেন, “সাক্ষ্য দিয়া এস, তোমাকে গয়া কাশী তীর্থ করিবার খরচ দিব।” দাদা বলেন, যে এখন স্বর্গ থেকে নামাইয়া, পরে আইখাওয়ালা বাঁশ * পোঁদে দিয়া উপরে উঠিতে ঠেলিয়া ধরিবে? এমন তীর্থে আমার দরকার নাই।

একটা বেদনা তাঁহার পিঠ দিয়া উঠিয়া কাঁধে আসিত। বেদনা আরম্ভ হওয়া মাত্র অস্থির হইতেন এবং যেখানে বেদনা উঠিত, সেখানেই শুইয়া পড়িতেন। বেদনা বেশীক্ষণ থাকিত না। বলিতেন, এ বেদনা যে দিন বুকে আসিবে সেই দিনই মৃত্যু। তাঁহার অন্য কোন ব্যাধিই ছিল না। মা বলেন, তাঁহাকে মাত্র একবার দুই তিন দিন জ্বরে ভুগিতে দেখিয়াছেন।

বার বৎসর বয়সে কলিকাতা যাইয়া যখন দেখিতে লাগিলেন যে, লোকগুলি গঙ্গাতে যাইয়া কি সুন্দর পূজা করে, তখন দাদাও মনে মনে বলিতেন, “আমি যদি মন্ত্র নিতাম তবে আমিও পূজা করিতাম।” একদিন স্বপ্নে তিনি দীক্ষা পান, কিন্তু তাহাতে প্রত্যয় হয় না। সত্য কি মিথ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া বাড়ী আসিয়াই গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র নেন। তখন দেখেন, স্বপ্নে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, গুরুও তাহাই দিলেন। তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ

---

* আইখাওয়ালা বাঁশ—বাঁশের কমচির কতকাংশ সহ গাঁট যে বাঁশে আছে।

করিয়া সারাজীবন প্রতিদিন সন্ধ্যা পূজা করিতেন। শেষ সময় পূজা করিয়া বলিতেন, কৈলাস যে জবা ফুল দেয়, তাহা হইতে আমি যখন ফুল দিতে থাকি, ভগবতী তখন হাত পাতিয়া ফুলগুলি নেন। কৈলাস দাস প্রতিদিন আঁচল ভরিয়া জবা ও অন্যান্য ফুল আনিয়া দিতেন। ঘুম হইতে উঠিয়া একবার সন্ধ্যা করিতেন পরে ১১।১২টায় স্নান করিয়া ফুল বেলপাতা দিয়া গাল বাজাইয়া পূজা করিতেন—দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় আবার সন্ধ্যা করিতেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, তুফান, শীত ও গ্রীষ্মে ভিজা কাপড়ে নির্দ্দিষ্ট সময় পূজা করিতেন—তাহাতে বাধা ছিল না। তিনি পূজা না করিয়া কিম্বা দিনে দুইবার কখনও খান নাই।

ভাদ্র মাসে একদিন দাদা ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের খুঁটীতে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর দুই তিন ছিলুম তামাক দিলেন তবুও পায়খানায় যান না। পরে উঠিয়া পায়খানায় গেলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও উঠিয়া কালীচরণ ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ী তাঁহার ছেলের অসুখ ছিল, তাহাকে দেখিতে গেলেন; পূর্ব্ব দিন যাওয়ার জন্য খবর আসিয়াছিল। দাদা পায়খানার রাস্তায় কাইত হইয়া পড়িয়া আছেন। কাছা খোলা, পোঁদের কাপড় উঠান। পায়খানা হইতে আসিতে দেরী দেখিয়া মা খোঁজ করিতে যাইয়া তদবস্থায় দেখেন। মা ডাকিলে, পাড়ার জ্ঞানীর মা ও বিপিন দের মাসী-শাশুড়ী আসিলেন। মা ও তাঁহারা দুই জনে তুলিয়া আনিতে অক্ষম। মা ধরিয়া

বসিয়া রহিলেন, জ্ঞানীর মা যাইয়া পুরোহিত বাড়ী বলায়, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তীর মামাতভাই আসেন। এই চারি জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে মণ্ডপের বারান্দায় আনেন। অশ্বিনী চক্রবর্ত্তীর মামাত ভাই ঠাকুরকে যাইয়া ভূঞা-বাড়ী খবর দেন। এদিকে মা নটবর মুখার্জ্জিকে খবর দিয়াছেন। তিনিও আসিলেন। ঠাকুর আসিয়া তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী খবর দেন। শাশুড়ী ও ভায়রা কৈলাস দাস আসিলেন। পরে শ্যালী ও তাঁহার কন্যা বিনোদিনী আসেন। ঠাকুর আসিয়া ধরাধরি করিয়া পূর্ব্বভিটীর ঘরের বারান্দায় নিলেন। তদবধি আর জ্ঞান হইল না, কথাও বলিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর জোরে জোরে নানারূপ দেবদেবীর নাম করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধশ্বাস বহিতে লাগিল, নটবর বাবু ঠাকুরের ইঙ্গিত মত শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১টা কি ২টার সময় প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বর্ত্তমানে যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ঐ স্থানে তাঁহাকে দাহ করা হইয়াছিল।

দাদাকে দাহ করিয়া আসিয়া যে জায়গায় দাদা শুইতেন, বসিতেন সেই জায়গায় যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন বসিয়া রহিলেন এবং পিতার মঙ্গল প্রার্থনা জোরে জোরে করিতে লাগিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে পিতার সমবয়স্ক ঠাকুর-পুতি কাশীকান্ত গাঙ্গুলীকে দেখিতে তাঁহাদের নূতন বাড়ী গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণতঃ স্নান করিতেন না কিন্তু হবিষ্যের এক মাস রোজই স্নান করিতেন। রাত্রে প্রায়ই হবিষ্য করিতেন।

টাকা সংগ্রহ, হাট্, বাজার ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে সারাদিন ঘুরিতেন। মাথা মুণ্ডন করিয়া ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ করেন। খুব সমারোহে সম্পন্ন হয়। সব লোককে পাকা খাওয়ান। পাঁচ শত টাকায় বাড়ী বন্ধক রাখিয়া বৃন্দাবন পালদের নিকট হইতে টাকা আনেন। কামিনী গাঙ্গুলী কৰ্জ্জ দিতে চাহিয়াছিলেন, ঠাকুর তাহা নিলেন না, গ্রামের লোকের তাগাদা বেশী। প্রথম ইচ্ছা ছিল, গয়া যাইয়া শ্রাদ্ধ করিবেন তাই দশাহে গ্রামের সকলকে চিড়া খাওয়াইলেন। এই পাঁচ শত টাকা ছাড়া ভোজেশ্বরের পালদের নিকট হইতেও প্রাপ্য টাকা আনান।

দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের মাতার নাম রুক্মিণী দেবী এবং স্ত্রীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী। ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী নামটী যেমন তাঁহার কাজও তেমন ছিল। সর্ব্বদা হাসিভরা মুখ। দয়া দাক্ষিণ্যে পরোপকারিতায় তাঁহার প্রাণটী ভরা ছিল। তিনি একজন দেবদুর্ল্লভ আদর্শ রমণী ছিলেন, কিন্তু শাশুড়ী ও ভগবতী ননদিনীর যন্ত্রণায় তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে নাই। শাশুড়ী ও ননদিনী তাঁহাকে সর্ব্বদা গালাগালি করিতেন, অযথা অপমান ও নির্য্যাতন করিয়াছেন, তিনি শব্দটী পর্য্যন্ত করেন নাই। ননদিনীর অনেকটা পাগলের ধাত ছিল, এমনকি তাহারা মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করিয়া দুই তিন দিন পর্য্যন্ত খাইতেন না! তিনি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া প্রতিদিন সমস্ত দিন বসিয়া থকিতেন, তাহারা না খাইলে তিনিও খাইতেন না। ছেলে মেয়েদিগকেও

তাহাদের বিনানুমতিতে কখনও খাইতে দিতেন না। স্বামী কলিকাতা কাজ করিতেন, তিনি নিজে বাড়ী থাকিতেন, কাজেই সারাজীবন শাশুড়ী ও ননদিনীর অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন। অকালে কালগ্রাসে পতিতা না হইলে দেবপূজিত পুত্রের মাতৃভক্তিতে ও দেবী পুত্রবধূর আদর ও যত্নে জীবনের সকল জ্বালা ভুলিতে পারিতেন। কিন্তু বিধির বিধানে তাহা আর হইল না। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় ছেলে। ঠাকুরের চারি বৎসরের ছোট এক ভগিনী, নাম সারদা। সারদার দুই বৎসর পরে আর একটী ভগিনী হইয়া চারি মাসে মারা যায়। এই ভগিনীর দুই বৎসর পর আর একটী ভাই হয়। প্রসব-গৃহ হইতে বাহির হইয়াই মা সূতিকা রোগে পরলোক গমন করেন। তার এক মাস পরে সেই ভাইও মারা যায়, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স সাত আট বৎসর, সারদার বয়স তিন চারি বৎসর। ভগবতী পিসী তাঁহাদিগকে আদরে পালিতে লাগিলেন। দীনদয়াল আর বিবাহ করিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের রূপ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ডা'ন কাঁধের গোড়ে একটী তিল ও দক্ষিণ পঞ্জরে একটী তিল ছিল। বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটী মোটা ও চেপ্টা ছিল, কিন্তু দুইটী ভিন্ন নখ। উহাকে জোড়া অঙ্গুলী বলা হইত। শ্রীচরণ একটু উচা ছিল, যাহাকে খরম পা বলে। পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলীর উপরে কয়েক গাছ লোম ছিল। উভয় পায়ের পাতার উপর মধ্যখানে গোল দাগ ছিল। হাতের তালু ও পায়ের তল রক্তবর্ণ ছিল। কপালে তিনটী রগ ছিল, দেখা যাইত। নাসার দিক হইতে একটী রগ সোজা উপর দিকে গিয়াছিল। তাহার দুই দিকে দুইটী ডাল উপর দিকে কিছু বাঁকা হইয়া উঠিয়াছিল। কাণের ভিতরে বড় বড় লোম ছিল। বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ। দেশে অবস্থান কালীন চাপদাড়ি ছিল—পাকা দশ আনা, কাঁচা ছয় আনা। অতি সুন্দর গোফ। চক্ষু ভাসা,—উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। পলকহীন প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়ন। শরীর ক্ষীণ। চুল স্বাভাবিক, নাক অতি সুন্দর, ভ্রূ অতি চিক্কণ। বক্ষে পদ্মাকৃতি চক্রাকার রক্তবর্ণ চিহ্ন ছিল। শরীরে সর্ব্বদা একটী মনোমুগ্ধকর গন্ধ ছিল। কণ্ঠের আওয়াজ যেন ঝন ঝন করিত,

অতি মধুর। সে স্বর আজ পর্য্যন্ত কোথাও আর শুনা যায় নাই কখনও উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাক দিতেন না। গঠনটী অতি সুন্দর সুঠাম ছিল। সামান্য বেশ ভূষা হইতে— যেন জ্যোতিঃ বাহির হইত। যে একবার ঐ রূপ দেখিয়াছে বা ঐ স্বর শুনিয়াছে সেই তাহার মাধুরী জানে। গায়ে সর্ব্বদা ভাগলপুরি চাদর দিতেন। কাপড় কুচা দিয়া পরিতেন। কুচা পায়ের পাতা পর্য্যন্ত পড়িত। বাল্যকালাবধি কলিকাতা থাকিতেন, বাড়ী আসিয়া দুই চারিটী কলিকাতার কথা বলিতেন,—বড্ড, উনান, চো ইত্যাদি। শরীর রুক্ষ ছিল। বিবাহাবধি মা স্নান করিতে দেখেন নাই। শরীরে তৈল বা সাবান দিতেন না।



শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মরাশি চক্র।

বৃ ৪	কে ১	শ ২৪
শু ৭ লং	১৭৬৮	শকাব্দা
র ১০ বু চন্দ্র ১১ ম ১১	রা ১৫	

পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত সিংহরাশি-চন্দ্রে, নরগণ, ক্ষত্রিয়জাতি রাশি কর্কটলগ্নে যামিনীমান ২৪ দণ্ড ৩৮ পলে জন্ম। সেই দিন তিথিমান ৬০ দণ্ড ছিল।

বাল্যলীলা, ছাত্রজীবন ও বিবাহ।

শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয় দেওভোগ গ্রামে কায়স্থ কুলে দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের ঘরে ১২৫৩ সনের ৭ই ভাদ্র শনিবার শুভ শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ ২২শে আগষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজষষ্ঠি হইয়াছিল। তাহাতে ৬০ খানা সরা, দেউল্ক বাতি, কলা, কাপড়, দধি, গামছা লাগিয়াছিল অর্থাৎ সমস্ত জিনিষই ৬০ খানা হিসাবে লাগিয়াছিল। দীনদয়াল নাগ মহাশয় অতি আনন্দে সমারোহে ষষ্ঠি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীশ্রীমা'র ঠাকুর মা উৎসুক হইয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা'র জ্যেঠা মহাশয় ও পিতা রামদয়াল ভৌমিক মহাশয় ঐ উপলক্ষে আসিয়া কাজ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ঐরূপ কাজ কর্ম্ম অন্যান্য ক্রিয়া উপলক্ষেও করিতেন। তিলারদি হইতে আসা অবধি নাগ ও ভূঞাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে সৌহৃদ্য ছিল। কাজে কর্ম্মে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতেন। দীনদয়াল নাগ মহাশয় কলিকাতা হইতে রামদয়াল ভৌমিক মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতেন, তিনি সব কিনিয়া কাটিয়া দিতেন। শৈশবে শ্রীশ্রীঠাকুরের চেহারা খুব সুন্দর ছিল। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই আদর করিয়া কোলে নিত। অনেকের এরূপ অবস্থা ছিল যে দিনে একবার আসিয়া কোলে না নিলে ভাল লাগিত না। চেহারা দেখিলেই

লোকের মন আকৃষ্ট হইত। দীনদয়াল নাগ মহাশয় বাড়ী আসিয়া ছেলের অন্নারম্ভ ধূমধামের সহিত সম্পন্ন করেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মেয়েলোক, পুরুষ খাওয়াইলেন। সাত আট বৎসর বয়সে মা মারা যাওয়ার পর হইতে পিসীমাই মাতৃস্নেহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও সারদাকে পালন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলিতেন, ইনি আমার জন্ম জন্মান্তরের মা ছিলেন। পিসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষবার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পরে পরলোক গমন করেন।

ঠাকুরের বয়স যখন পাঁচ ছয় বৎসর তখন একদিন কাশী চৌধুরীর বাড়ী হইতে একটী লেবু ছিঁড়িয়া আনিয়াছিলেন। চৌধুরী তখন বাড়ীর উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসা। তাহার নিকট দিয়াই ঠাকুর লেবু ধরা হাতটী পিছনে নিয়া—লুকাইয়াছেন মনে করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তবু তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেই পড়িলেন। চৌধুরী ডাকিয়া বলিলেন, "দুর্গা! দেখিয়াছি।"

ছোট সময় পিসীমা এক হাড়ি গুড় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কোন কার্য্যবশতঃ আনিতে যাইয়া দেখেন, কম। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া সেই হাড়ি উঠানে ফেলিয়া দিলেন। হাড়ি ভাঙ্গিয়া গুড় ছড়াইয়া পড়িল, শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দের সহিত সেই গুড় খাইতে লাগিলেন। শিশুকালে তাঁহাকে যে খাবার দেওয়া হইত, তাহা অন্যকে দিয়া ফেলিতেন।

শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর মজুমদার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য খেলার সাথী। তিনি বলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত শান্তশিষ্ট

ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। একদিন গ্রামের বালকদিগের সহিত খেলা করিবার সময় তাঁহার দলভুক্ত ছেলেরা তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া অপর পক্ষকে হার মানাইয়া দিবার জন্য জেদ করিতে থাকে, তাহাতে তিনি অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার পক্ষের ছেলেরা সকলে মিলিয়া ধরিয়া, তাঁহাকে মাঠের মধ্যে ফেলিয়া মাটীর উপর দিয়া টানিতে থাকে। তাহাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, তবুও তিনি মিথ্যা কথা বলিতে রাজী হইলেন না। তিনি এই কথা বাড়ী আসিয়া আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, কারণ পিসীমা শুনিলে সকলকে মন্দ বলিবেন ও মহাহুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। শরীর কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। পরদিন খেলার সাথীরা ভয়ে আসেনা, উকি, ঝুকি মারে এই ভয় যে, হয়ত তিনি পিসীমার নিকট বলিয়াছেন; তাহারা গেলেই বকুনি খাইবে। তাহাদিগকে দেখিয়াই তিনি আদর করিয়া ডাকিয়া আনিলেন তখন ছেলেরা বুঝিল, তিনি পিসীমার নিকট বলেন নাই। তাহাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিলেন, যেন কোন ঘটনাই হয় নাই। পরে পিসীমা স্নানের সময় গা দেখিয়া না বলার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভর্ৎসনা করিলেন। এই ঘটনার পর ছেলেদের ভিতর ঝগড়া হইলে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মধ্যস্থ মানিত। তিনি যাহা মীমাংসা করিতেন, সকলেই মানিয়া নিত।

স্কুলে পড়ার সময়, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন স্নান করিতেন তখন পুকুরে নামিয়া একদমে শত শত ডুব দিতেন, কোন খেয়ালই

থাকিতনা। ডুবাইতেছেন ডুবাইতেছেনই। পিসীমা গালাগালি না করিলে সহজে উঠেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে প্রকাশ করিয়াছেন "পাঁচ বৎসর বয়সে স্নান করিয়া তিনি বন-জঙ্গলে লোকের অগোচরে ভগবানের নাম করিতে বসিতেন। এই ধারণা ছিল যে, নির্জ্জনে ডাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায়। গাছের উপর বসিয়া ঐরূপ ধ্যান ধারণা করিতেন, যেন কেহ না দেখে। ঐ বয়সেই এরূপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ভগবানই আছেন, আর কিছু নাই"।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে খড়ি দেওয়া হইল। বাড়ীতে কয়েক বৎসর পড়িলেন। নয় দশ বৎসর বয়সে নারায়ণগঞ্জ পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই নারায়ণগঞ্জের পড়া শেষ করিয়া স্থির করিলেন, ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবেন। নিজেই যোগার যন্ত্র করিয়া তথায় ভর্ত্তি হইলেন। পিতা ঢাকা রাখিয়া পড়াইতে অক্ষম, কাজেই নিজের উদ্যম ও উৎসাহেই বন-জঙ্গলের মধ্যদিয়া দশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া—প্রতিদিন বাড়ী হইতে যাইয়া আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পিসীমাতা কোন দিন ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিতেন। কোন দিন বা বাসীভাত, কোন দিন মুড়ি চিড়া, কোন দিন বা কিছুই নাখাইয়া ঢাকা স্কুলে যাইতেন। আসিতে প্রত্যহই রাত্রি হইত। আবার ভোরেই স্কুলে রওনা হইতে হইত। পড়ায় খুব ভাল দেখিয়া শিক্ষকগণ সকলেই অতি আদর করিতেন। এক শিক্ষক এই কষ্ট দেখিয়া

নিজের বাসায় রাখিয়া পড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই। তিনি যখন ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে যাইতেন, তখন একদিন আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টি ও দেবগর্জ্জন হইতে থাকে, যেন প্রলয় কাণ্ড। রাত্রি হইয়া গেল। সোজা চলিয়া আসিবেন বলিয়া ফতুল্লা ছাড়াইয়া পঞ্চবটী হইতে বাড়ী বরাবর মাঠের মধ্যের রাস্তা ধরিলেন। যখন কালিয়ান্দি বিলের মাঝখানে নামিলেন, খালে জল হইয়াছে দেখিলেন, তখন বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক ভীষণ মূর্ত্তি ভূত খালের পরপারে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন খালের খাড়া পারের মাটী ধরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না গড়াইয়া পড়িতেছেন। বাতাসে, শীতে একেবারে মৃত প্রায়। বহুক্ষণ এভাবে চেষ্টা করিতে করিতে পারে উঠিলেন; ভূত ও চলিয়া গেল। নির্ভীক বালক অন্ধকারে শীতে জর্জ্জরিত হইয়া নিকটস্থ এক মুসলমান বাড়ীতে গেলেন। তাহাদিগকে ডাকাতে এবং পরিচয় দেওয়াতে তাহারা যত্ন করিয়া ঘরে নিয়া আগুন দিয়া সেকিয়া ঝড় থামিলে একজন সঙ্গে আসিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, পরে অনেক দিন অমাবস্যার গভীর রাত্রে ঐ জায়গায় যাইয়া ভূতকে ডাকিয়াছেন, কিন্তু ভূত আর দেখা দেয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঢাকার স্কুল হইতে পাশ করিলে পর, দাদা তাঁহাকে কলিকাতা নিয়া নিজে যে পাল বাবুদের মধ্যে কাজ

করিতেন,তাহাদের মধ্যে কোন কাজ দিবেন,মনে করিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের ১৮।১৯ বৎসর বয়স। পিসীমা জেদ করিলেন, বিবাহ না করাইয়া কলিকাতা নিতে দিবেন না। দাদা নানাস্থানে সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিবাহের কথা শুনিয়াই পিসীমার নিকট নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন তাহাতে কোন ফল হইতেছেনা, তখন পিতার নিকট জানাইলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কিন্তু বিবাহ না করিলে বংশরক্ষা হয় না কাজেই পিতা কোন আপত্তি না শুনিয়া বিবাহ করাইতে জেদ করিলেন। সকলের নানারূপ কথায় অগত্যা শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক বাছাবাছির পর দাদা বিক্রমপুর রাইজদা নিবাসী জগন্নাথ দাস মহাশয়ের কন্যা প্রসন্নকুমারী দেবীর সহিত সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন। তাহার অবস্থা ভাল, মেয়ের বয়সও পনর ষোল দেখিতে সুশ্রী, আসিয়াই কাজ করিতে পারিবে; কারণ ঘরে দীনদয়ালের স্ত্রী ছিলেন না সংসারে কেবল বিধবা ভগ্নি ও বৃদ্ধা মাতা ছিলেন। জগন্নাথ দাসমহাশয়ের ঐ এক মেয়ে ছাড়া আরও তিন ছেলে ছিল, নাম মহেশ, হরেন্দ্র ও ভগবান।

দাদা সারদাদেবীর বিবাহও ঐ তারিখেই ঠিক করিলেন। শুভ গোধূলি লগ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং রাত্রে সারদাদেবীর বিবাহ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম বিবাহ খুব সমারোহের সহিত হয়। নায়রীগণ এক মাসের উপর ছিলেন—ঠাকুরমার

শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত। ঠাকুরমা বিবাহের পাঁচ, সাত দিন পরই পরলোক গমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিবাহের পর দুই চারি দিন স্ত্রীর সহিত নিরুদ্বেগে শুইয়াছিলেন। যুবতী স্ত্রী; যখন দেখিলেন, তিনি কিছু ত্যক্ত করিতে প্রস্তুত এবং করিতেছেনও, তখন স্ত্রীর সঙ্গে শোয়া একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

বধূর সহিত রাত্রে শুইতে হইবে এই ভয়ে গাছে উঠিয়া বসিয়া রহিতেন। কোনদিন বা পালাইয়া থাকিতেন। পিসীমা নিরুপায় হইয়া যখন বলিতেন যে পিসীমার নিকট শুইতে দিবেন, তখন তিনি ঘরে আসিতেন। পিসীমা হয়ত মনে করিতেন, কালে এসব থাকিবে না; হয়ত বধূর সহিত সদ্ভাব হইবে। কিন্তু তাহা আর হইলনা। তিন বৎসর পরে আমাশয় রোগে বধূর মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময় ঠাকুর নিকটে ছিলেন, কর্ণে দেবদেবীর নাম বলিয়া তাঁহাকে বাহির করেন। বধূ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "জীবনে কোন সুখ হয় নাই, আপনাকে দেখিয়া যে মরিতে পারিলাম এই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার যেন সদ্গতি হয়।" সতী শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হাতের উপর প্রাণত্যাগ করিলেন। রোগশয্যায় বধূর ময়লার অতীব দুর্গন্ধ হইয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন। সামান্য আরোগ্যোন্মুখ হইলে তিনি কলিকাতা চলিয়া যান, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাড়ী পাঠান। তিনিও নিজ হস্তে স্ত্রীর মলমূত্র ফেলিতেন; এবং যথেষ্ট

যত্ন চেষ্টায় শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধও যথারীতি করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতার শেষ দুইবৎসরে মধ্যে তিনি স্ত্রীর পিণ্ড দিতে গয়া যান; কিন্তু তথায় যাইয়া জানিলেন, পিতা বর্ত্তমানে স্ত্রীর পিণ্ড চলেনা। তখন তিনি ইহা বলিয়া আসিলেন যে, "আমার পিতা জীবিত থাকুন, গয়াপিণ্ডের দরকার নাই।"

প্রথমা স্ত্রীর পরলোক গমনের ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ। একদিকে বহু অনুসন্ধানেও বড় মেয়ে পাওয়া যায় না—দাদার পছন্দমত হয় না। অপর দিকে বিবাহ করিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবল আপত্তি। তিনি পিতাকে সর্ব্বদা বলিতেন, "আপনি বাড়ী ঘর বেচিয়া তীর্থে চলিয়া যান, আমি কলিকাতায় থাকিব।" বিবাহের জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলেও যখন তিনি বিবাহ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হইলেন না, তখন দাদা বলিলেন "শাপ দিয়া যাইব, যেন তোর ধর্ম্ম না হয়।" বিষম বিপদ, পিতৃ আজ্ঞা। তথাপি কাতর হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন, "বিবাহ হইতেই জীবের যত যন্ত্রণা। এই বিবাহে আমাকে কেন অনুরোধ করিতেছেন? একবার বিবাহ করাইয়া ত দেখিয়াছেন, আবার কেন? যতদিন আপনার শরীর আছে, আমিই আপনার সেবা করিব। বধূ অপেক্ষা শত সহস্র গুণে আপনার যত্ন করিব।" কিন্তু বিবাহ না করিলে বংশ লোপ হইবে এই কথা ভাবিয়া পিতা কিছুতেই বিবাহ দিবার সংকল্প ছাড়িতে পারিলেন না। এমনকি,

একদিন কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবার কান্না দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব। আপনি কাঁদিবেন না।"

বিবাহ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম কলিকাতা যান। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার উপযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে তথায় ভর্ত্তি হইতে পারা যাইবে না বলিয়া তিনি বর্দ্ধমান চলিয়া যান; এবং তথায় কয়েক বৎসর পড়িয়া আসিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। তাঁহার মেডিকেল কলেজে পড়ার দাদার অমত ছিল। তিনি বলিতেন, "যে বাবুদের অধীনে আমি চাকুরী করি, তাঁহারাই তোমাকে কাজ দিতে ইচ্ছুক, এবং দিবেন বলিতেছেন। তোমার আর পড়িয়া দরকার নাই।" দাদা কেদারপুরের মহিমবাবু, মহারাজপুরের বাবু, ভোজেশ্বরের পালবাবু এই তিন ঘরে কাজ করিতেন। তখন তাঁহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল—বড় ধনী। তিনি কিছুতেই তাঁহাদের অধীনে কাজ করিবেন না; কাজেই বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন। দাদা বলিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর শীতের দিনে একবার বর্দ্ধমান যান। যাওয়ার সময় রেলগাড়ীতেই গিয়াছিলেন, আসার সময় পয়সার অভাবে হাটিয়া আসেন। সেইবার দিনে একটী কাঁচা বেগুন খাইয়া আসেন। গায়ের শালখানা কাহাকেও দিয়া আসিয়াছিলেন। বাসায় আসিলে শাল না দেখিয়া পিতা গালাগালি করিলেন। তিনি নিরুত্তর।

যখন শ্রীশ্রীঠাকুর কলেজে পড়িতেন, তখন বাসায় একটী অতি অল্প বয়স্কা সুন্দরী ঝি ছিল। সে তাঁহার পড়ার পুস্তক

প্রভৃতি টানিয়া নিয়া যাইত, এবং নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করিত। ইহার হাত হইতে এড়াইবার জন্য তিনি অন্য বাসায় চলিয়া যান। তখন দাদা দেওভোগের পীতাম্বর দত্তের বাসায় থাকিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম বিবাহের পর নাত জামাইর জন্য দাদা ভাল কাপড় জামা আনেন, সেই সঙ্গে ছেলের জন্যও আনেন কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই পরিধান না করায়, দাদা অত্যন্ত রাগ করিয়া তাঁহাকে বাঁশ নিয়া দৌড়িয়া মারিতে গিয়াছিলেন। এই একদিন মাত্র মারিতে গিয়াছিলেন, আর কখনও মারেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তবুও কাপড় পরেন নাই। মেডিকেল কলেজে কোট প্যাণ্ট পরিয়া যাইতে হইত, তাহা বাসা হইতে পরিয়া যান নাই, কলেজের নিকট যাইয়া পরিতেন। প্র্যাক্‌টিসের সময় কখনও প্যাণ্ট পরেন নাই।

শ্রীশ্রীমা'র বিবাহের পর দুই বৎসর দাদা বাড়ী ছিলেন। ঠাকুর মেডিকেল কলেজের ফাইন্যাল পরীক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে কলেজ ছাড়েন। তিনি অনেক সময় বলিয়াছেন যে অল্পের জন্য ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। না দিতে পারার কারণ তখনকার প্রফেসার সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদিগের কোন একটা ঘটনা নিয়া স্কুলে ভয়ানক মারপিট হয়, চেয়ার টেবিল অনেক ভাঙ্গিয়া যায়, মহা বিরাট কাণ্ড। সেই সময় তাড়াতাড়ি কলেজ হইতে বাহির হওয়ার সময় হাঁটুতে চোট লাগায় বাৎসরাধিক হাটিতে পারেন নাই, কলেজেও যাইতে পারেন

নাই, কাজেই কলেজ হইতে নাম কাটাইলেন। আর পড়া হয় নাই। এই কলেজে পড়ার সময় নিজে রাঁধিয়া খাইয়া পড়িতেন।

শ্রাবণ মাসে চিঠি আসিল,—শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব অসুখ,অবস্থা খারাপ—হাঁটুর আঘাতে যে সকল অসুখ হইয়াছিল তাহা সারে নাই। নানারূপ হাতুরিয়া ঔষধ ও অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়ায় হিতে বিপরীত হইয়াছে, মাথা ধরা, মাথা কামড়ানি ইত্যাদিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, নাক ও গলা দিয়া রক্ত পড়ে। পিতা ব্যস্ত হইয়া কলিকাতা গেলেন। ব্যারাম কিছু কমিলে তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইলেন। বাড়ী হইতে যাইয়া তিনি বি,এল ভাদুড়ীর নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন।

ডাক্তারী পড়ার সময় একটী লোককে গঙ্গা যাত্রা করাইয়া গঙ্গার ঘাটে রাখা হইয়াছিল। দৈবক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আনিয়া ঔষধ ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা ভাল করেন। যোগমায়া, বাসার ঝি উহাকে আনায় অত্যন্ত গালাগালি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোন আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে রাখিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা'র জন্ম ও বিবাহ

শ্রীশ্রীমা ১২৬৪ সনে ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে দেওভোগ গ্রামে রামদয়াল ভৌমিক * মহাশয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সন্তান হইয়া বাঁচেনা, এই জন্য মা বড় আদরের ছিলেন। কন্যা হইলেও পিতা মঙ্গল কামনায় মহাসমারোহে বহুলোক খাওয়াইয়া অন্নারম্ভ করেন। এবং কন্যার নাম রাখিলেন শ্রীশ্রীশরৎকামিনীদেবী। রামদয়াল ভৌমিক মহাশয়ের বড় দুই ভাই ছিলেন,—রামলোচন, ও কমললোচন। রামদয়ালের স্ত্রীর নাম হরসুন্দরী দেবী, বিক্রমপুর কুকুটিয়ার দেব বংশের মেয়ে। রামদয়াল ভৌমিক মহাশয় বড় দয়ালু ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাড়ীতে অতিথি বিমুখ হইতেন না। অতিথির যত্ন এভাবে করিতেন যে, তিন চারি দিনের কম কেহ তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারেন নাই। অতিথির জন্য দুধ মাছ, আনিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। পূর্ব্ব দিন দুধ আনিয়া দধি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইতেন। লোকের সম্পদে, বিপদে,—সব সময় সাহায্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বাড়ীতে

---

* প্রাণকৃষ্ণ ভৌমিক
|
মুক্তারাম ভৌমিক
|
রাজকৃষ্ণ ভৌমিক

কমললোচন ভৌমিক	রামলোচন ভৌমিক	রামদয়াল ভৌমিক

আর অতিথি স্থান পান নাই। তিনি বালিয়াটীর মধ্যে নায়েবী কাজ করিতেন। অন্য দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় জন কখনও বা কিছু করিতেন, কিন্তু মধ্যম জন কিছুই করেন নাই। তিনি সংসার খরচ ইত্যাদি সব চালাইতেন। সামান্য তালুকদারী, তাহাতে কুলন হয় নাই। তাঁহার অত্যন্ত সাহস ছিল। এতদ্দেশে বাঘের ভয় ছিল। বাঘে গরু নিলে তিনি বাঘের মুখ হইতে টানিয়া রাখিতেন। বাছুর নিয়া বাঘে মারৈলার চকে জঙ্গলে খাইতে বসিলে, তথা হইতে ছিনাইয়া আনিতেন। এমনও হইয়াছে যে, অন্ধকার রাত্রে কোথাও হইতে আসিতে বাঘের সঙ্গে টক্কর লাগিয়াছে। তাঁহার দশ বার বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা বাপের বাড়ী গেলে, তিনি বাড়ীতে একাকী পাহাড়া স্বরূপ থাকিতেন। অন্য ভাইরা মাতার সঙ্গে যাইতেন। তাঁহার দুই কন্যা এক ছেলে শিশু অবস্থায়ই মারা যায়। পরে শ্রীশ্রীমা'র জন্ম। তার পাঁচ বৎসর পরে হরকামিনী দেবীর জন্ম। সন্তান হইয়া বাচেনা, তাই মা হইলেন পর ঠা'ন্-দিদি জোর শ্যামা পূজা, রক্ষাকালী পূজা, কালী পূজা ও বুড়া বুড়ীর নিকট শূয়র মানত করিলেন। দশ টাকার হরিরলুটও মানত করিয়াছিলেন। রাজানগর হরির বাড়ী যাইয়া হরিকে সোণার দানা ও হরিরলুট দেওয়া হইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ, কাজেই বিবাহের পূর্ব্বে মানত দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ঠা'ন্-দিদি সেই সব পূজার জন্য টাকা উঠাইয়া রাখিলেন। বিবাহের পর সব পূজা করা হইয়াছিল। রামদয়াল ভৌমিক

মহাশয়ের কাশের ব্যারাম ছিল। দশ মাস ভুগিয়া পরলোক গমন করেন। দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই শয্যাশায়ী। মরিবার পূর্ব্বদিন রাত্রে বড়ভাই রামলোচন ভৌমিককে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন "আমার সময় নাই, শেষ হইয়া আসিয়াছে; চাকুরীর ও নিজেদের সব কাগজপত্র বুঝিয়া লও।" সারারাত্র কাগজ পত্র বুঝাইলেন। অতি প্রত্যুষে রামলোচন ও ঠা'ন্-দিদি মুখ ধুইতে গেলেন, তিনি শুইলেন। ঠা'ন্‌দিদি মুখ ধুইয়া আসিয়াই দেখেন, তিনি কেমন কেমন করিতেছেন,—চক্ষু যেন স্থির। অমনি কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া বাহির করিল, তাঁহার প্রাণবায়ু চলিয়া গেল। তখন শ্রীশ্রীমা'র বয়স ছয় সাত বৎসর, হরকামিনী দেবীর দেড় বৎসর।

ছয় সাত বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমা একবার সমস্ত রাত্রি শ্মশানে মশানে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মুখ চক্ষু ফুলাইয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর দিদিমার সঙ্গে শুইয়াছিলেন। ঠাকুর-দাদা (মাতামহ) বারান্দায় ছিলেন। রাত্র প্রায় ভোর, এমন সময় ঠা'ন্‌দিদি যে ঘরে শুইয়াছিলেন, তার দরজা ধরিয়া ঠেলিতে লাগিলেন। ঠেলা শুনিয়া ঠাকুর-দাদা বাহির হইয়া দেখেন শ্রীশ্রীমা। তখনও তাঁহার হুঁস নাই। এইরূপ অনেক সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় দরজা খোলার শব্দ পাইয়া তাঁহারা ধরিয়া রাখিতেন। ডাকিলেও তিনি শব্দ করিতেন না, কোনরূপ ব্যথা দিলে হুঁস হইত। বিবাহের পরও এরূপ

যাইতে চাহিলে শ্রীশ্রীঠাকুর টানিয়া ফিরাইতেন, অথবা দুঃখ দিলে হুঁস হইত। ছোট ভগিনীকে তিনি সাথে সাথে রাখিতেন, অন্য কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিলে নিজের বোন্‌কে মারিয়া টানিয়া নিয়া আসিতেন। উদ্দেশ্য, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করিতেও দিবেন না, অন্যকে মারিতেও দিবেন না। বোন বলিত, "মারে অন্যে মারুক, তুই মারিস্ কেন ?" মা বলিতেন, "আমি মারি মারি, অন্যকে মারিতে দিব না।"

ছোটকালে খেলিতে খেলিতে হাত কাটিয়া গেলে, শ্রীশ্রীমা তাঁহার নিজভগ্নী ও জ্যেঠতুত ভগ্নীদিগকে বলিতেন, "হাত কাটিয়াছে হাত দুঃখ পাইয়াছে, আমাদের কি ?" নিজের মাতা সম্বন্ধে বলিতেন, "এই মা ত শ্যালু-মা, আসল মা ভিন্ন। বাপ মা দুই দিন পরে মরিয়া যাইবেন, তাঁহারা আপন কিভাবে ?" একবার মা'র জ্যেঠতুত ভগ্নীকে সাপে কামড় দেয়। মা তাঁহাকে ও অন্যান্য ভগ্নীকে নিয়া মাঠের একধারে যাইয়া বসিয়া থাকেন; কাহাকেও বলিবেন না। মনের ভাব এই যে, যে পায় কামড় দিয়াছে সে পায়ের দুঃখ ! মাঠের ধারে বসাইয়া মা জল গরম করিয়া আনিয়া ধোয়াইয়াছিলেন। আর যা ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ভগিনী কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় ঠা'ন্‌দিদি যাইয়া দেখিলেন যে, সাপে কাটিয়াছে। তারপর বাড়ী আনিয়া তোলপাড় কাণ্ড। তিনি ভাল হইয়াছিলেন। ছোট বোনটি জন্মিবা মাত্রই শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন "আমার মা'র আর সন্তান হইবে না।" মা বলেন, এমন কালমুখ যে,

মা'র আর সন্তান হইল না। ছোট সময় হইতেই বোনকে খুব ভাল বাসিতেন। কেহ নিবে বা কিছু বলিবে, তাহা তাঁহার সহ্য হইত না। কাহাকেও কিছু বলিতে দিতেন না।

রতন ভৌমিকের স্ত্রী গ্রাম্য দেবতা বিশেষ। তাঁহাকে না ডড়াইত এমন বাড়ী ছিল না। যেখানেই নিমন্ত্রণ হইত, তাঁহার পাতে মাছের মাথা ও ক্ষীরের সর পড়িত। একদিন ক্ষীরের সর চিনি দিয়া মাখিয়া লইয়াছেন, মা নিকটে বসা, ঐ চিনি মাখা সর মা'কেও দিলেন। না নিয়া উপায় নাই, তাঁহার আদর; কাজেই হাত পাতিয়া লইলেন। কিন্তু শত ঘৃণা সত্ত্বেও তাহা খাইলেন। এমন ঘৃণা শ্রীশ্রীমা জীবনে পান নাই।

শ্রীশ্রীমা'কে খাওয়ার জন্য অনেক তোষামোদ না করিলে খাইতেন না। ঠা'ন্-দিদি এরূপ সাধাসাধি করিতেন দেখিয়া ঠাকুর দাদা বলিতেন, মেয়েদিগকে যাইয়া খাবার জন্য পায়ে ধর। বিবাহের পর দীনদয়াল নাগ মহাশয় অনেক সময় বলিয়াছেন, "সোণার হাতে এত দ্রব্য নাড়াচাড়া করে কিন্তু নিজের মুখে তুলিয়া কিছুই দেয় না" মা'র সেই অভ্যাস এখন পর্য্যন্ত যায় নাই। পরকে খাওয়াইতেই ব্যস্ত; নিজের জন্য কিছুই না।

বিবাহের সম্বন্ধের জন্য পিতা-পুত্র বাড়ী অসিয়াছেন। অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মেডিকেল কলেজে পড়েন। শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, দাদা নাপছন্দ করিলেন, কারণ তাঁহার বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র। ছেলে দ্বিতীয়বর, সংসারে দীনদয়ালের বিধবা ভগ্নী ছাড়া ঘরে অন্য মেয়েলোক

নাই, আসিয়াই গৃহিণী হইতে হইবে। ঠা'ন্-দিদির একান্ত ইচ্ছা এসম্বন্ধ করেন, কিন্তু জ্যেঠা কমললোচন ভৌমিক এসম্বন্ধ কিছুতেই করিতে দিবেন না। কারণ পূর্ব্বের বিবাহের স্ত্রীর সঙ্গে পিসী শাশুড়ী ননদিনী সর্ব্বদা ঝগড়া করিতেন, নানারূপ যন্ত্রণা দিতেন মেজ জ্যেঠা নিরপেক্ষ। বৈরাগী,বৈষ্ণব ও দেশের অন্যান্য সকলের এসম্বন্ধে অমত। গ্রামের লোকে বলিত "নাগে আসিলে রান্ধাবাড়ি,নাগে না থাকিলে কাঁন্দাকাটি।" আরও বলিত ছেলে চৌকির তলে যাইয়া থাকে, বধূর সঙ্গে শোয়না, বাহিরে বাহিরে থাকে, গাছে উঠিয়া থাকে, এমন সম্বন্ধ করিতে নাই। মেয়ের কাছে মেয়েকে দেয়! ঠা'ন্-দিদি কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই সম্বন্ধ যাহাতে হয় তাহার জন্য নিতান্ত উৎসুক। দাদার জ্যেঠতুত বড় ভাই রঘুনাথ নাগ ও জামাতা অভয়চরণ ঘোষ এই সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। একদিন হঠাৎ তারিণী চরণ পলসাইকে নিয়া ইঁহারা ভূঞাবাড়ী উপস্থিত হন। কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি প্রায় ভোর। কমললোচন ভৌমিক ঘরে দরজা দিয়া রহিলেন; কারণ এই সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত। রামলোচন ভৌমিক মহাশয় কথা সাব্যস্ত করিলেন। তখনকার দিনে মেয়ে দিয়া বাবীআনা খরচ লওয়া সম্মানের ছিল। ঠা'ন্-দিদি তাহা নিতে অস্বীকার করিলেন। পুরোহিত বলিতেন, "আপনাকে দুই তিন শত টাকা লইয়া দিতে পারি।" ঠা'ন্-দিদি বলিতেন, "টাকা লইয়া কেন সম্বন্ধ করিব? লোকে বদ্‌নাম করিবে!" গুরু পুরোহিত পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে অমত ছিল।

তাঁহারা সকলে বলিতেন, মেয়ে ছালায় বাঁধিয়া জলে ফেলা উচিত, তবুও এসম্বন্ধ করা উচিত নহে। এমন মেয়ে এই জায়গায় দিতে আছে। কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া ঠা'ন্-দিদি সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন।

যখন সম্বন্ধের নানারূপ ভাঙ্গানি আসিতে লাগিল, তখন মা মনে মনে বলিয়াছিলেন, "যদি এই সম্বন্ধ না হয় তবে উপায় কি করিব ?" যেদিন সম্বন্ধ ঠিক হইল, বিবাহ তাহার পরের দিন রাত্রি চারিটার সময় হইল। বিদায় লইয়া খট্‌কা। অধিবাস করার দধির অভাবে দুধে তেঁতুল দিয়া দধি হইল। হাতে শাঁখার অভাব, অল্প সময়ের মধ্যে কে আনে ? হাতে যে রূপার বালা ছিল, তাহা দিয়াই বিবাহ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর কলেজ বন্ধ হইবে বলিয়া চতুর্থ-মঙ্গল করিয়াই চলিয়া গেলেন। এই বিবাহ করিয়া তিনি কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে মা'র সঙ্গেই শুইতেন। পুনরায় দুই বৎসর পরে বাড়ী আসেন। শ্বশুরবাড়ী বিবাহের যাত্রা ছাড়া আর কখনও খান নাই। শাশুড়ী যখন যাহা হইত, এখানে পাঠাইতেন, তাহা খাইতেন। মাও সেখানে খাইতেন না। শ্বশুরবাড়ীর লোক কেহ কেহ পাগল বলিত, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করিতেন না, ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম কলিকাতা হইতে বাড়ী আসেন, দাদা তখন কলিকাতায়। কার্ত্তিক মাসে বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমের গড় হইতে শৌল মাছ পূর্ব্বের গড়ে

৩—

তেঁতুল গাছের নিকট লাফাইয়া যাইতে থাকে। বঙ্গচন্দ্র সে তথায় একখানা নৌকা রাখে, তাহাতে মাছ সব পড়িতে থাকে। বঙ্গ দৈনিক ৭০।৮০টী করিয়া মাছ পাইতে থাকে। ঠাকুর তাহার সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুইটী শোল মাছ সে দিয়া যায়। মা একটী জলে জীয়াইয়া রাখেন,একটী ঠাকুরকে পাক করিয়া দেন। কিছুক্ষণ পরে জীয়ান মাছটী মা জলে ছাড়িয়া দেন।

পূজার সূচনা।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা গেলেন। সেইবার ৺দুর্গাপূজা করিবেন মনে করিয়া প্রতিমার সমস্ত সাজ আভরণ নিয়া যথাসময় বাড়ী রওনা হ'ন। কিন্তু পথে ঝড় হওয়ায় অধিবাসের পূর্ব্বদিন বাড়ী পৌছেন। এত অল্প সময় মধ্যে প্রতিমা পাওয়া, ব্রাহ্মণ পাওয়া অসম্ভব বলিয়া পুরোহিত বলায় পূজা স্থগিত রহিল। ঠাকুর ঐ সাজ অলঙ্কার দ্বারা মহাষ্টমীর দিন রক্ষাকালী পূজা মহাসমারোহে করিলেন।

শ্রীশ্রীমা একবার ৺দুর্গাপূজার চৌদ্দ পনর দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কাশীপুরে ভগবতী মা'কে কোলে নিয়া বলিতেছেন,

"আমাকে তুই পূজা দে।" মা বলিলেন, "আমি কি দিয়া তোমার পূজা করিব ?" তিনি বলিলেন, "আর কিছুই না পারিস্ দুটা ছোলা ভিজাইয়া পূজা দে।" কতকদিন পরে দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, "এবার অষ্টমীর দিন কালীপূজা করিতে পার ?" ঠাকুর বলিলেন, "দেখা যাউক, কি হয়।" ঠাকুর পশ্চিমের ঘরে গেলে মা বলিলেন, "৺কালীপূজা না করিয়া ৺দুর্গাপূজাই করা যাউক।" ঠাকুর বলিলেন, "কি দিয়া পূজা হইবে ? টাকা কোথায় ?" তখন মা'র হাতে মাত্র একটী টাকা ছিল। মা বলিলেন, "সম্প্রতি টাকার কাজ আমি চালাইব। দেখি কালীকুমার ভূঞা যে বাড়ী বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছেন, তাহা হইতে পাই কিনা।" মা'র কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাকে বলিয়াছিলেন, "পূজা করিলে কেমন হয় ?" দাদা বলিলেন, "টাকা নাই, কি দিয়া করিব ?" ঠাকুর দুইখানা কার্ড লিখিয়া বাজারে গেলেন, মা কালীকুমার ভূঞার নিকট যাইয়া একশত টাকা চাহিলেন, তিনি তখনই তাহা দিলেন এবং মা'র সঙ্গেই আসিলেন। ঠাকুরও বাজার হইতে আসিলেন। মা ঠাকুরের নিকট টাকা দিলেন। ঘর ও প্রতিমা তৈয়ার করিতে সব টাকা ব্যয় হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র সঙ্গে রাগারাগি আরম্ভ করিলেন, "তোমার প্রতিমা তুমি নিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাও, আমি পূজা করিব না; আমার পূজায় কোন কাজ নাই। তুই তোর প্রতিমা লইয়া যা, আমার পূজা মাঠে মাঠে জঙ্গলে জঙ্গলে।" বকাবকি করিতে

দেখিয়া কৈলাস দাসমহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি শুধু হুকুম করিবেন, আমি সব করিব এবং টাকার কাজ চালাইব।" ঠাকুর যখনকার যাহা বলিতে লাগিলেন কৈলাস দাস তাহা করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে তখনও টাকা আসে নাই। অষ্টমীপূজার দিন বৈকালে তিনশত টাকা আসিলে কালীকুমার ভূঞার ও কৈলাস দাসের টাকা পরিশোধ করা হয়। ব্রাহ্মণগণ পাকা খান, কায়স্থেরা চিড়া। দোকানের বাকী প্রভৃতি নিয়া দেখা গেল এই পূজায় প্রায় ৬০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

দশ বার দিন পূর্ব্বে প্রতিমা ফরমাইস দেওয়া হয়। সারদা-চরণ গণক আর কোনদিন দুর্গাপ্রতিমা তৈয়ার করে নাই। অসুরের এবং সিংহের মাথায় ও গলায় মাটী কিছুতেই লাগে না। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, ভক্তি নাই বিশ্বাস নাই, সেইজন্য মাটী লাগে না। ঠাকুর বলিতেন সারদার কালী দক্ষিণেশ্বরের কালীর ন্যায়। তার হাতে অনেক প্রতিমা গ্রামেই হইয়াছে কিন্তু এবাড়ীর ন্যায় সুন্দর হয় নাই। এই প্রথম পূজা কার্ত্তিক মাসের দুই এক দিনে হয়। সেবার উঠানে জল ছিল না; অন্যান্য বার উঠানে জল কাদা থাকিত। হয়ত এমন হইত যে ষষ্ঠীর দিন জল নামিত। এই পূজার গহনা ঢাকা হইতে আনা হয়। অন্যান্য বৎসর পূজার পূর্ব্বে কার্য্য উপলক্ষে দুই তিনবার ঠাকুর কলিকাতা গিয়াছিলেন তখন গহনা কলিকাতা হইতেই

আনিয়াছেন। যেবার কলিকাতা যান নাই, সেবার ঢাকা হইতেই আনিয়াছেন।

এই পূজার পূর্ব্বে চৌদ্দ পণ আবাত্তি কলা কিনা হয়, সকলেই দেখিয়া বলিল, "এই কলা কখনও পাকিবে না।" মা বলেন, "এমন কলা কেহ কোনদিন পাকিতে দেখে নাই।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সমস্ত কলাই পূজার তিন দিনে সম্যক্ পাকিল ও পূজায় লাগিল। ৺দুর্গাপূজা করিলে দ্বীপান্বিতা কালীপূজাও করিতে হয়। এ পূজাও করা হইল। মা'র বিবাহের পূর্ব্বেও দ্বীপান্বিতা কালীপূজা হইত। মধ্যে বাদ ছিল। পূজার বৎসর হইতে পুনরায় আরম্ভ হইল। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যার নিশি পরিলে তিনি বরাবর ৺কালীপূজা করিতেন।

৺জগদ্ধাত্রী পূজার দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ঘরে পঞ্জিকা দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, "পরশ্ব দিন ৺জগদ্ধাত্রীপূজা।" মা বলিলেন, "পূজা করা যায় কিনা?" ঠাকুর বলিলেন, "টাকা কোথায়?" মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা লাগিবে?" ঠাকুর বলিলেন, "পঁচিশ টাকা হইলেই হয়।" মা বলিলেন, "দেখি যোগাড় হয় কিনা।" মা পুরোহিত বাড়ী ভারতী ঠাকুরের নিকট পঁচিশ টাকা চাহিলেন। তিনি পঁচিশ টাকা দিলেন। পরে এই পূজায় দেড়শত টাকা লাগে। গ্রামের সব লোক খায়। বাকী টাকা রামলক্ষ্মীর যে টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহা হইতে ব্যয় হয়, টাকা আসিলে তাহা পূরণ করিয়া রাখেন।

সকল পূজাই আরম্ভ হওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি রীতিমত চলিতেছে। পূজার সময় কলা রাখিতে একজনকে জাগিয়া থাকিতে হইত, নতুবা দিগ্‌লেজ সব খাইয়া ফেলিত। অনেক সময় মা দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বলিতেন, পূজা করিবেন না। কিন্তু মনে থাকিত, পূজা না করিয়া পারিবেন না। এ পর্য্যন্ত পূজা বন্ধ হয় নাই। যে বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, মা পূজা করিবেন না, সেবারও কৈলাস দাস প্রতিমা ফরমাইস দেন ও হাটবাজার সব করেন; পূজা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর আদিত্য ঘোষ পূজা করার জন্য পঞ্চাশ টাকা পাঠান এবং সারদা আচার্য্যকে প্রতিমা তৈয়ার করিতে বলেন।

একবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজা মা করিবেনই না, কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে মা আর ঠিক থাকিতে পারেন না, পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; এবং বিপিনদের বাড়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল, এরূপ করিলে আপনি পাগল হইবেন। মা পুরোহিত অশ্বিনী চক্রবর্ত্তীর নিকট সব বলিলেন, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী বলিলেন "পূজা করুন। আমার ভাই রোহিণীর নিকট হইতে টাকা আনুন"। মা তাঁহার নিকট হইতে টাকা আনেন। সেবারও পূজায় ধূমধাম, খাওয়া দাওয়া হয়। মা'র ইচ্ছা ছিল, একবার বাসন্তীপূজা করেন, কিন্তু তাহা এতাবৎ হয় নাই।

একবার জগদ্ধাত্রী পূজায় আরতি হইতেছে, অভয়া চরণ চক্রবর্ত্তী আরতি দিতেছেন, তুমুল গান নৃত্য চলিয়াছে—ঢাক

বাজিতেছে, সব বেহুঁস। শ্রীশ্রীঠাকুর করতালি দিতেছেন। রাত্রি প্রায় ভোর, পুরোহিত আর পারেন না। ধূপতির আগুনে তাঁহার কাপড় পুড়িয়া গেল। তিনি রাগ করিয়া দৌড়িয়া চলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও হরপ্রসন্ন বাবু পিছন পিছন চলিলেন, কিন্তু পুরোহিত আসিতে না চাহিলে হরপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে কোলে করিয়া আনিলেন।

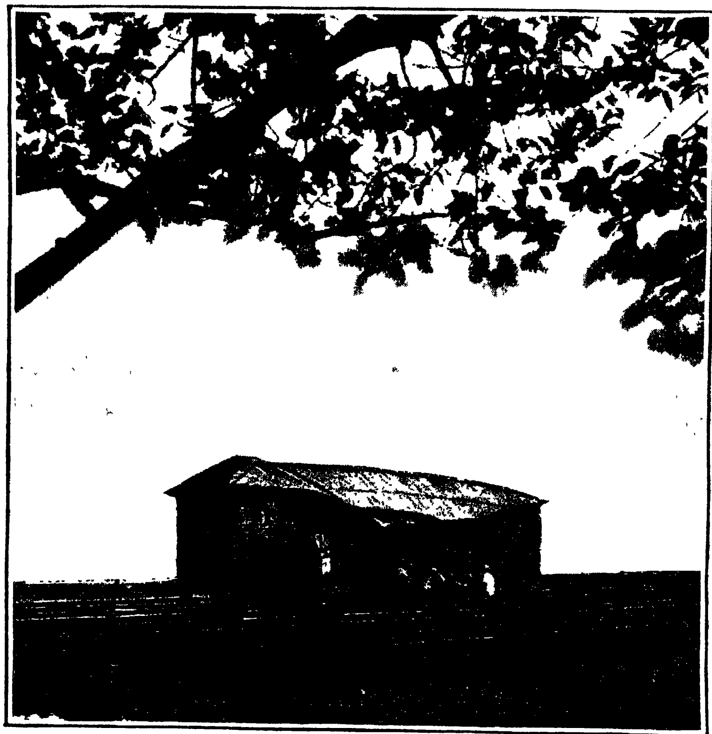
শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর পূজা সম্বন্ধে ভোজেশ্বরের পালেরা অনেক বলিয়াছেন, "পূজা দিয়া কি কাজ? পূজা ছেড়ে দেন।" মা বলিয়াছেন, "পূজা আমার আপন ইচ্ছায় হয় নাই, আমি পূজা ছাড়িতে পারিব না। আপনারা টাকা দেন, আর নাই দেন, পূজা হওয়ার হইলে হইবেই।" একবার মাত্র তাঁহারা পূজায় কুড়ি টাকা দেন। ঠাকুর কখনও কোন পূজায় নমস্কার করেন নাই কিম্বা অঞ্জলি দেন নাই; শ্রীশ্রীমা দিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতায় কর্ম্মজীবন।

কলিকাতা কুমারটুলি বর্ত্তমান ঘর যেখানে তাহার লাগ পশ্চিমে গঙ্গার ধারে দাদার একখানা ভাল সুন্দর ঘর ও ফুল বাগিচা প্রভৃতি ছিল। রেল কোম্পানী ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর দাদা অতি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরে এই বর্ত্তমান ঘর তোলেন। ১৬নং বিশ্বাম্বর মল্লিক লেন। প্রথম ইহাতে এক বৈষ্ণবী ছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহার এক বৈবাহিক অনেক বেশী ভাড়া দিয়া ঘর নিতে আসে। ঠাকুর রাগিয়া বলেন, "তাহা হইবে না, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কীর্ত্তিবাসজানা প্রভৃতি তিনজনেই নিবে।" তাহাই হইল। অদ্যাবধি তাহাদেরই আছে। ঐ ঘরে দুইখানা কামরা নিজেদেরই থাকিত। এখনও সেইরূপই আছে। যখন কেহ যায়, আহারা ছাড়িয়া দেয়। অনেকে অনেক বেশী ভাড়া দিতে চাহিয়াছে; তাহা সত্ত্বেও ঐ ঘর অন্যকে ভাড়া দেওয়া হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্ব্বে কলিকাতা কুমারটুলীর বাসায় তাঁহার কলেরা হয়। অবস্থা খুব খারাপ, একেবারে জীবনের আশা নাই, গঙ্গা যাত্রার জন্য



১৬নং বিশ্বাম্বর মল্লিক লেন, কলিকাতা

খাটিয়া প্রভৃতি আনা হইয়াছে; কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, আমি ঔষধ দিব। সকলেই আগ্রহের সহিত আসিয়া বলিলেন, "দিন।" তিনি কয়েকটী গোলমরিচ নিজের নিকট হইতে দিয়া বলিলেন, "বাটিয়া খাওয়াইয়া দাও!" তখনই তাহা করা হইল। ক্রমে জ্ঞান হইতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুর আরোগ্য লাভ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ঔষধ দিয়া কোথায় গেলেন, দেখা গেল না। পরেও দেখা যায় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন প্রথম প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন এবং কুমারটুলী হইতে স্থানান্তরে থাকেন, তখন বিক্রমপুর—কৈলাল নিবাসী ফটিক চক্রবর্ত্তীর বাসার একবৃদ্ধা ঝি তাঁহাকে বহু রোগী আনিয়া দিত। বলিত, "এ ডাক্তার খুব ভাল।" এই ঝিটি ঠাকুরকে খুব ভালবাসিত। অধিকাংশ সময় বাসার কাজকর্ম্ম করিয়া দিত, এবং লোকের নিকট একবাক্যে ডাক্তারের প্রশংসা করিত। লোকজন হইতে টাকাও চাহিয়া দিত। কারণ, ঠাকুরের ভিজিট চাওয়ার কখনও অভ্যাস ছিল না।

পিসীমা আমাশয় রোগে শয্যাশায়ী হন, সংবাদ পাইয়া পিতাপুত্র বাড়ী আসেন। তাঁহারা আসার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা'ই তাঁহার সেবা যত্ন করিতেন, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন। পিসীমার অসুখ দিন দিন বাড়ীতে লাগিল। তাঁহারা বাড়ী আসিলেও মা'ই মলমূত্র ফেলিতেন, এবং তাঁহার নিকট শুইতেন। যখন মল একেবারে দুর্গন্ধ হইয়া গেল, তখন ঠাকুর মা'র বিছানা

বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং নিজে পিসীমার সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলেন, মলমূত্র পরিষ্কার করিতে লাগিলেন এবং অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিছুদিন পরে এই রোগেই পিসীমার মৃত্যু হয়। শ্রাদ্ধ সমারোহে করা হইল। শ্রাদ্ধান্তে দাদা বাড়ী রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একাকী কলিকাতা গেলেন। এই সময় ১২৮৫ সনে কার্ত্তিক মাসে দাদা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি শিব চৌধুরীর বাড়ী (বর্ত্তমান গগন দত্তের বাড়ী) ৩৫০৲ টাকায় বিক্রি করেন। বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করেন ও গয়াকাশী যান। পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা যান।

দাদা ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাড়ী পাঠান সারদা কন্যাকে আনিয়া বাড়ী রাখিতে, এবং বাড়ীতে কিছুদিন থাকিতে। তিনি গোয়ালন্দ হইতে নৌকা করিয়া বাড়ীতে একদিন থাকিয়া তাঁহার শাশুড়ী এবং শ্রীশ্রীমা'কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের ভগিনী বাড়ীতে ও শ্রীশ্রীমা'র মাসীবাড়ী তাঁহার দিদিমাকে দেখিতে যান এবং ভগিনীকে ছেলেপেলে সহ কলিকাতা নিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহার স্বামী ও শ্বশুর আপত্তি করায় আর নেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীমা'কে নিয়া নৌকায় গোয়ালন্দ পৌঁছেন ও তথা হইতে গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হন। গোয়ালন্দের পথে নদীতে অত্যন্ত তুফান হয়। মাঝিরা দুই ভাই। তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল,

"সবংশে গেলাম।" কিন্তু নৌকা যেন জলের তল দিয়া বাদামে উড়িল, এবং দুই দিনের রাস্তা এক দুপুরে অতিক্রম করিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা যাইয়া কুমারটুলীর বাসায় উঠিলেন। দাদা তখনই বাসা হইতে পুত্র ও বধূকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত। অজস্র গালি দিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি সারদাকে বাড়ী আনিয়া বাড়ী থাকিতে বলিয়াছি, তুমি কেন বধূ নিয়া আসিলে?" তখন তিনি রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আর ভাত রাঁধিতে পারিব না, পাক করিবার জন্য আনিয়াছি।" তবুও তিনি কিছুতেই থাকিতে দিবেন না। তখন পাড়ার লোক নানারকম বুঝাইয়া বলিলেন, "যখন আসিয়াছে, তখন তেরাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া যাউক। এখন কোথায় তাড়াইয়া দিবেন।" তখন দাদা নিরস্ত হইলেন। শ্রীশ্রীমা পিসী শাশুড়ীর মৃত্যুর পর এই প্রথম কলিকাতা আসেন এবং এবার আড়াই বৎসর কলিকাতায় থাকেন। কুমারটুলীর বাসায় তিন দিন থাকিয়া পরে কাশীমিত্রের ঘাটে এক বাসায় চলিয়া যান। দাদা তথায় যাইয়া খাইতেন, নিজ বাসায় আসিয়া শুইতেন।

কলিকাতা যাওয়ার ১৫।২০ দিন পরে শ্রীশ্রীমা'র সাংঘাতিক জ্বর হয়। তখন কলিকাতায় জ্বরে খুব লোক মরিত। মা'র মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যেও বলিতেন, শ্রীশ্রীমা মরিয়া গেলে তিনি উপায় কি করিবেন। কয়েক দিন পর মা নিরাময় হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিতেন, "মরিয়া গেলে ঘণ্টা হইত।"

সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরই মা'কে ঔষধ দিতেন এবং অত্যন্ত যত্ন করিতেন। জ্বরের সময় ঠাকুর দুগ্ধ রোজ করিয়াছিলেন, তাহাতে দাদা অসন্তুষ্ট হন। ঠা'ন্‌দিদি তৈল মালিশ করিতে এক জায়গায় মা'র ব্যথা হয়, তাহা শুনিয়া ঠাকুর ঠা'ন্‌দিদিকে হুঁসিয়ার ভাবে মালিশ করিতে বলেন। যত্ন দেখিয়া ঠা'ন্‌দিদির মনে হইয়াছিল, এবার শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র প্রতি আসক্ত হইবেন।

শ্রীশ্রী মা কাশী মিত্রের ঘাটেই দুই বাসায় ভিন্ন জায়গায় দুই বৎসর থাকেন। মা কলিকাতায় গেলে কিছুদিন পরে ঠাকুর খিদিরপুর কুদের কাজে যাইয়া দেখেন, ভোজেশ্বরের পালদের পনর বিশ হাজার টাকা মূল্যের এক লবণের নৌকা পুল পার না হইতে পারায়, পারের চড়ায় পড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে। তাহা তিনি সাহেবের বিনানুমতিতেই অন্য নৌকাতে পাল্টাইলেন, সাহেব কিছুই বলিলেন না। লোকজন হুরিতে ড্রেণের পারেই ছিল। কুদের কার্য্য সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক হওয়ায় এক সাহেবকে গুদামে ফেলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর খুব মারিয়াছিলেন।

যখন মা কুমারটুলীর বাসায় ছিলেন সেই বৎসর মাঘ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা দীক্ষা নেন। গুরু নিজেই একমাল্লাই—ডিঙ্গি নৌকায় যাইয়া বাসায় উপস্থিত হন এবং সেই দিনই মন্ত্র দেন। তারপর দিনই দেশে চলিয়া আসেন। গুরুরা দুই ভাই ছিলেন,—শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দাদার ইচ্ছা ঠাকুর বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে ও মা নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে মন্ত্র নেন। বঙ্গচন্দ্র ঠাকুর

মহাশয় বলিলেন, "প্রাপ্য বরং তুমি দুই ভাইকে বাট করিয়া দিও, মন্ত্র আমিই দিব।" মা'র এবং ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা বঙ্গচন্দ্র ঠাকুর হইতেই স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে দীক্ষা নেন। দাদার ইচ্ছা ছিল, মা পরে মন্ত্র নেন; কারণ নবীনচন্দ্র ঠাকুর দেশে। পরে দুই জনই একত্র দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে তিনি দীক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামত কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কুলগুরু যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তাই মন্ত্র নিলেন।

৺বঙ্গ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী বিক্রমপুর কামারখাড়া। তিনি তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। গেরুয়া বসন পরিতেন। কপালে সিন্দুর, হাতে ত্রিশূল, বাহুতে, গলায় ও কব্জায় রুদ্রাক্ষ, মাথায় জটা, দেখিতে গৌরবর্ণ—যেন সাক্ষাৎ শিব। তিনি একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজী ছিলেন। তাঁহার একটী মাত্র ছেলে ও একটী মেয়ে সন্তান হওয়ার পর সাংসারিক ব্যাপারে আর যাইতেন না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে "ধর্ম্ম কোথা গেলে হবে," এই চিন্তায় শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা অস্থির ছিলেন এবং যেখানে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা হইত বা সাধু সন্ন্যাসীর নাম শুনিতেন, তিনি সেখানেই যাইতেন। এমন কি তিনি খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মদের বক্তৃতা পর্য্যন্ত শুনিতে গিয়াছেন। দীক্ষা লইয়া মাছ মাংস ছাড়িলেন।

ঠা'ন্ দিদি ছোট মেয়ের অসুখের জন্য এক বৎসর মধ্যেই আষাঢ় মাসে দেশে চলিয়া আসেন। তখন ঠা'ন্‌দিদি স্বীকার

করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে ডিস্‌পেন্‌সারি দিতে ১০০৲ টাকা দিবেন; শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া শ্যালীকে চিকিৎসা করিবেন। কিন্তু এই সময় ভোজেশ্বরের রাজকুমার বাবুর ছেলের কলেরা হওয়ায় আর আসা হইল না।

মাঘ মাসে ছোট মেয়ে ভাল হইলে ঠা'ন্‌দিদি কলিকাতা যান। কলিকাতা যাইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দুইহাতে এমন অসহ্য বেদনা হয় যে তাহা কোন অবস্থাতেই রাখা যায় না; এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করা যায় না। ঠাকুর বলিতেন, "পাপের শাস্তি, শিক্ষার জন্য" ইত্যাদি।

ঠা'ন্‌-দিদি কলিকাতা থাকা কালীন একবার দাদার চক্ষু উঠিয়াছিল। পথ্য দু'বেলা দুই সের দুধ। এক দিনকার দুধ একেবারে জল। দাদা ভাত মাখিয়া খাইতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, মা'র সব খাইতে হইবে। ঠা'ন্‌-দিদি আপত্তি করিতে লাগিলেন যে ও কোন দিন দুধ খায় না, ইহা খাইতে পারিবে না। দাদা বলিতে লাগিলেন, "আমি খাইতে পারি নাই বধূ কিরূপে খাইবে।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "না, খাইতেই হইবে।" মা খাইলেন, কোন আপত্তি করিলেন না—যদিও তিনি দুধ খাইতে পারিতেন না।

একদিন নিকটস্থ এক ভদ্রলোক যাঁহার সঙ্গে দাদার খুব প্রণয় ছিল এবং ঠাকুরেরও খুব পরিচিত তাঁহার স্ত্রীর সপ্তামৃত উপলক্ষে পাক করিবার জন্য মা'কে নিতে আসেন। দাদা মা'কে যাইতে বলেন। এদিকে ঠাকুর চ'ক্ষে ইসারা করিয়া

মা'কে নিষেধ করেন; কারণ ঠাকুরদাদার অজ্ঞাতসারে মা'র গহনা বন্ধক রাখিয়াছিলেন, কাজেই মা গহনা ছাড়া গেলে দাদা ঠাকুরের কীর্ত্তি টের পাইবেন। মা নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইয়া আর গেলেন না। ঐ ভদ্রলোক অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন।

রাজকুমার বাবুর ছেলেকে তাঁহাদের বাধা ডাক্তার কালাচাঁদ বাবু চিকিৎসা করিতেন। ঠাকুরের পিতা তাঁহাদের চাকুরী করেন এই উপলক্ষে তথায় আপন বাড়ীর ন্যায় ঠাকুর সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং সে ছেলেকে ও দেখিতেন। একদিন ঔষধ আনান হইয়াছে, খাওয়ান হইবে,—দেখিয়া তিনি কিছুতেই খাওয়াইতে দিলেন না। বলিলেন, "এই ঔষধ খাওয়াইলে ছেলে এখনই মারা যাইবে।" ঐ ঔষধ খাইতে না দিয়া ডাক্তার চার্লস্ সাহেব ও ডাক্তার ভাদুড়ীকে নিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন, "এই ঔষধ খাইলে ছেলে এতক্ষণে মরিয়া যাইত।" তারপর চিকিৎসার ভার ঠাকুরের উপর রহিল। মধ্যে মধ্যে ভাদুড়ী ও চার্লস্ সাহেব দেখিয়া যাইতেন। ভার নেওয়া অবধি শ্রীশ্রীঠাকুর রোগীর শিয়রে বসিলেন। যে পর্য্যন্ত সম্যক্ আরোগ্য না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা ছাড়িয়া তাঁহাকে ঔষধ দিলেন এবং ভাল করিলেন। রাজকুমার বাবুর ছেলে আরোগ্য লাভ করিলে লোকে মনে করিয়াছিল, ঠাকুরকে তাহারা অনেক টাকা দিবেন। কিন্তু তিনি কিছুই নিতে রাজী হইলেন না। তাহারা

আসিয়া ৫০৲ টাকা ও একজোড়া কাপড় ও একটী সার্ট রাখিয়া যান।

ঐ বাড়ীতে আর একটী ছেলেরও কলেরা হয়। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আহুত হন। সিভিল সার্জ্জন চার্লস্‌ সাহেব ও ভাদুড়ী বলিলেন, "অনর্থক টাকা ব্যয় করিবেন না, আর আশা নাই, ছেলে কিছুতেই ভাল হইবে না।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর যাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। রাত দিন থাকিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। লোকে বলিত, "বাবা বিদায় করিবেন, মামা বিদায় করিবেন, মা বিদায় করিবেন, বহু টাকা লাভ হইবে।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর মাত্র বিশ টাকা পাইলেন। তাঁহার কোন দাবী নাই; কাহারও নিকট কোন সময় ভিজিট চাহিতেন না।

রাজকুমার বাবুর ছেলের চিকিৎসার পূর্ব্বে কাজিরপাগলার বিশ্বেশ্বর বসুর ছেলের বধূর ৯ মাস গর্ভাবস্থায় ব্যথারোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ঔষধ দেন। বধূ আরোগ্য লাভ করিলে কোন খ্যাতনামা কবিরাজকে দেখান হয়। তিনি বলেন, "গর্ভে সন্তান মারা গিয়াছে।" তাঁহারা মোকদ্দমা করিতে উদ্যত। ভারী হুলুস্থূল। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর রাগিয়া লেডি ডাক্তার আনেন, এবং প্রমাণ করেন, সন্তান নষ্ট হয় নাই। যথাসময়ে এক সুন্দর ছেলে প্রসব হইল।

ছাতুবাবু লৌহজঙ্গের পাল বংশোদ্ভব—বড় ধনী। তিনি অসুস্থ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য ডাকাইয়া

বলিলেন, "আপনার চিকিৎসায় আমি নিশ্চয় নীরোগ হইব, কিন্তু আপনি যদি টাকা না নেন, তবে আপনার ঔষধ খাইব না।" তিনি টাকা নিতে রাজী হন না দেখিয়া বলিলেন "আমি অপারগ নহি। আপনাকে সামান্য টাকা দিতে আমার কোন কষ্টই হইবে না, আপনি টাকা নিয়া আমার চিকিৎসা করুন।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর টাকা নিতে রাজী না হওয়ায় তিনিও তাঁহার ঔষধ খাইলেন না এবং ঐ ব্যাধিতেই মারা গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার পশার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু নিজে কাহারও নিকট হইতে ভিজিট চাহিয়া লইতেন না। তদ্দরুণ লোকেও এই সুযোগে উপযুক্ত ভিজিট দিত না। লোকে যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়া দিত, তাহাও আবার কেহ হাওলাত বরাত চাহিলে বা কাহারও কোন অভাব দেখিলে তাহাদিগকে দিয়া ফেলিতেন। তিনি এরূপ না করিলে মাসিক তিন চারি শত টাকা আয় করিতে পারিতেন। লোকে যে টাকা পয়সা দিত তাহা তিনি তাঁহার পিতাকে দিয়া দিতেন এবং নিজের কিছু ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতেন।

দীক্ষার পর অবধি দিনের বেলা যখন রোগী পান, তখন যান নতুবা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আত্মহারা হন। রাত্রে কোথায় যান, কোথায় থাকেন—কিছুরই স্থিরতা নাই। সর্ব্বদা ধ্যান, যপ ইত্যাদি নিয়া ব্যস্ত। মা বলেন, "বাড়ী না আসিলে

বিশ্বাস থাকিত না যে, আর ফিরিয়া আসিবেন।" কখনও গভীর রাত্রে কখনও বা ভোরে বাসায় ফিরিতেন।

ঠাকুরদাদা মা যাওয়ার দুই বৎসর পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে দৌহিত্রী সরলার বিবাহে বাড়ী আসেন। এই শেষ আসা; কলিকাতা আর যান নাই। দাদার আসার কিছুদিন পরে ঠা'ন্‌দিদিও বাড়ী চলিয়া আসেন। মা কলিকাতায় রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার কুমারটুলীর বাসার লাগ কুণ্ডদের গদীর দোতালা বাড়ীতে গেলেন। এই সময় ভোজেশ্বরের দেবেন্দ্রবাবুর পিতার অসুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ভোজেশ্বর আসেন। দেবেন্দ্রবাবুর পিতার যে অসুখ তাহা কোন ডাক্তার কবিরাজ ঠিক করিতে পারেন না। তাঁহাদের বাড়ীতে দুইটী মৃতপ্রায় রোগীকে আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত করায় তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর গেলেই ভাল হইবেন। মা'কে গদীতে একা রাখিয়া যাওয়ায় রাজকুমারবাবু এরূপভাবে সকল অপরিচিত লোকের মধ্যে গদীতে বধূকে রাখা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এজন্য তিন দিন পরেই চলিয়া আসেন। এই রোগী সাগু বার্লি খাইতে আপত্তি করায় তিনি বলেন, ইহা না খাইলে ঔষধ দিবেন না। পরে রোগী খাইতে সম্মত হন এবং দুই দিন ঔষধ খাইয়াই আরোগ্য লাভ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোজেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া দেখেন যে, পূর্ব্বের গদী বাড়ীতে—যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর

থাকিতেন, সেই বাসায় বিক্রমপুর পয়সাগাঁও নিবাসী কুণ্ডবাবুদের দ্বারস্থ পণ্ডিত এক পাগল চিকিৎসার জন্য আনিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক—পিসী-ভাইঝি, পুরুষ-খুড়া, ভাইপো। প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বাসায় যাইতে আপত্তি করেন, পরে নানারূপ অনুরোধে যান। শ্রীশ্রীমা'কে একা রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর রাত্রে এমন কি রাত্রি ৪।৫ ঘটিকার সময়ও আসিয়াছেন। মা খালি বাসায় রহিয়াছেন; শিকল নাড়া দেওয়া মাত্র কপাট খুলিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর না আসা পর্য্যন্ত মা বসিয়া রহিয়াছেন, খান নাই, ঘুমান নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঐ ব্রাহ্মণগণ পরীক্ষাচ্ছলে শিকল নাড়িলে, কখনও মা কপাট খোলেন নাই। ইহাতে তাঁহারা অবাক্ হইতেন এবং মেয়েছেলেদিগকে বলিতেন, "ইনি নিশ্চয়ই অসাধারণ।" ঐ ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক মা'কে এত ভালবাসিতেন যে কোন দিন মা'র নিকট বসিয়া ভোর করিয়াছেন। তাঁহারা যাওয়ার সময় মা'র জন্য কাঁদিয়া বলিয়াছেন, "কেমনে ছাড়িয়া যাইব? আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের তোমার সম্পর্ক ছিল।"

ভোজেশ্বরের পালবাবুদের বাড়ীতে ডিস্‌পেনসারী দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহারা আড়াই শত টাকা দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেশে পাঠান। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও এই কল্পনা ছিল। কিন্তু তিনি বাড়ী আসিয়া ভোজেশ্বর যাইতে অনিচ্ছুক হন। পাল বাবুরা তাহা জানিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা উপরন্তু ভিজিট ও ঔষধের লাভ সকলই দিতে প্রস্তুত হন। তাহাতেও

তিনি যাইতে অস্বীকৃত হন। তখন কুণ্ড বাবুরা বলিয়াছিলেন "আমরাও ৫০৲ টাকা মাহিনা দিব, আমাদের বাড়ী থেকে যান।" তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে যত রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইটী মারা গিয়াছে। একটী কলেরা রোগী—পুরুষ, অন্ন পথ্য করিয়া, হাটিয়া চলিয়া, সম্যক্ আরোগ্য হইয়া—পুনরায় আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। আর একটী, বালক—১০ বৎসর বয়স্ক ধনীর ছেলে। কলেরা হইয়াছিল, খুব খারাপ অবস্থা। পিতা বলিয়াছিলেন, "ভাল হইলে তাঁহার ওজনে টাকা দিবেন।" মারা গেলে শুনিলেন, ছেলের অহিফেন অভ্যাস ছিল। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে যদি জানাইত যে, অহিফেন খায়, তবে মারা যাইত না। এইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "আয়নার আলমারীর ভিতর জিনিষ পত্র রাখিলে যেরূপ দেখা যায়, এরূপ না দেখিলে চিকিৎসা করা উচিত নয়।"

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিয়া পুনরায় মাঘ মাসে কলিকাতা যান। যাওয়ার সময় মা ননদিনীর কন্যা সরলাকে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলেন যে ননদিনীর যন্ত্রণায় বাড়ীতে টিকা অসম্ভব, তিনি কলিকাতা যাইতে চান। শ্রীশ্রীঠাকুর মাত্র বলিলেন, পার্‌লে যায় যেন।

ঠা'ন্‌দিদি তাঁহার ছোট কন্যার গুল্মরোগ হওয়ায় নানারূপ স্থানীয় চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া তাঁহাকে নিয়া ফাল্গুন

মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যান। সে সঙ্গে মা, কৈলাস দাস মহাশয় ও পাচকড়ি ভৌমিক কলিকাতা যান। কলিকাতায় নিজেদের কুমারটুলীস্থ বাসায় উঠিলেন। তারপর শুড়িপাড়ায় দোতালা বাসা ভাড়া করিলেন। মেয়ের ব্যারাম সারিলে ঠা'ন্‌দিদি কৈলাস দাস ও পাঁচকড়ি ভৌমিকের সহিত তাহাকে নিয়া বাড়ী আসেন, ভগিনীর কন্যা বিনোদা তখন কোলের শিশু মা তাহার একখানা কাপড়ের জন্য অনেক বলিলেন কিন্তু ঠাকুর তাহা দিলেন না। তাঁহারা চলিয়া আসিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু চাউল আনিতেন, লবণটুক পর্য্যন্ত না। এইভাবে প্রায় সাত দিন চলিল। তারপর দুধভাত ৬।৭ দিন। তৎপর দধিভাত ও কলা ৫।৭ দিন। অতঃপর আলু, লবণ ও ভাত কয়েক দিন, তরকারী ভাত কয়েক দিন। এইভাবে দেখিতেন মা কিছুতে আপত্তি করেন কিনা; কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই আপত্তি নাই, তখন ক্রমে সব জিনিষ পত্রেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা'র মাথায় প্রচুর চুল ছিল, কিন্তু বহু দিন তৈল পর্য্যন্ত আনেন নাই। দুধ একেবারেই মা খাইতে পারেন নাই; তাহাতেও আপত্তি করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি ২'টার সময়ও আসিতেন, আসিয়া ছাদের উপর অনেক সময় ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। সম্মুখে যাহা পাইতেন তাহা খাইতেন—বাহ্য জ্ঞান রহিত, একেবারে তন্ময় হইয়া থাকিতেন; শূন্যেতেই আচমনের ভাব করিতেন, যেন

আচাইতেছেন। এই সময় এক দিন ঠাকুরদাদা চিঠি লিখেন। পত্রের প্রথমে লিখা ছিল, সারদাকে খরচ অভাবে জামাইবাড়ী দিলাম, সেই পত্রেই নীচে পুনশ্চ লিখা ছিল, সারদাকে আনিলাম। মা বলিয়াছিলেন, "খরচ অভাবে দিলেন কিরূপে? তাহা হইলে, পুনরায় আনেনই বা কিভাবে? আপনি ত এখনও খরচ পাঠান নাই। বোধ হয় কোন ব্যাপারে নিয়াছিল, পুনশ্চ আনিয়াছেন।" এই কথা শুনা মাত্রই ঠাকুর রাগিয়া শ্রীশ্রীমা'কে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত। এমন কি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড়ে ধরিয়া উপরতালা হইতে নীচে নিয়া গেলেন। ফটকের বাহির করিয়া দেন আর কি! মা হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন, এমন কি বেগতিক দেখিয়া কিরা পর্য্যন্ত দিলেন। বলিলেন, "কিরা লাগে, যদি আমাকে বাড়ীর বাহির করেন।" এইরূপ কান্নার পর ঠিক হইল যে, মা যদি চিঠি লিখিয়া দাদার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া আনিতে পারেন, তবে থাকিতে পারিবেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে দেওভোগের কাশীকান্ত গাঙ্গুলী, তাঁহার স্ত্রী ও মেয়ে গঙ্গা স্নান উপলক্ষে কলিকাতা তাঁহাদের বাসায় যান। তাঁহারা যাইয়া দেখেন, ঐ ঘটনার পর হইতে রান্না খাওয়া দাওয়া বন্ধ; কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র হাতে খাইবেন না। গাঙ্গুলী মহাশয় ঠাকুরের পিতার সমবয়সী ও পাশাপাশি বাড়ীর লোক। তাঁহাকে মা এই ঘটনা জানাইলে তিনি ঠাকুরকে অনেক মন্দ বলিয়া এই ব্যাপার মিটাইয়া দেন এবং বলেন,

"সামান্য কথার জন্য স্ত্রীকে এমন কষ্ট দেয় নাকি?" তাঁহারা প্রায় ১৫ দিন ছিলেন। তখন তাঁহারাই পাক করিতেন। পরে মা পাক করিতে আরম্ভ করেন।

দাদা বাড়ী আসার পর রোগী শত চেষ্টায়ও ভিজিট লওয়াইতে পারে নাই; তবে যদি একান্তই পকেটে পুরিয়া দিত, কিম্বা কাপড়ে বাঁধিয়া দিত, তবে আনিতেন। রোগীর অবস্থা ভাল না দেখিলে ভিজিটের টাকা ফেরৎ দিয়া আসিতেন। গরীব রোগী—যাহার পথ্য প্রভৃতি কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহাকে নিজের ব্যয়ে বাজার হইতে পথ্যাদি আনিয়া দিতেন। যাহার থাকার সুবন্দোবস্ত দেখিতেন না, তাহাকে নিজের বাসায় নিয়া আসিতেন এবং চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তারীর সময় নিকটস্থ ডাক্তারগণ সকলেই বলিতেন, "তুমি হয় চিকিৎসকের মত চিকিৎসা কর নতুবা চলিয়া যাও। এরূপ ভিজিট না নিয়া ও ঔষধের মূল্য না নিয়া আমাদের পসার নষ্ট করিতে পারিবে না।" তিনি কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রোগীদের পূর্ব্বরূপই চিকিৎসা করিতেন।

এই সময় ডাক্তার ডাকিতে বহু লোক আসিয়া দরজা ধাক্কাইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ধ্যানে মগ্ন, কোন উত্তর নাই। কোন সময় বা কপাট দিয়া বসিয়া থাকিতেন, মা ডাকিয়া পর্য্যন্ত কোন উত্তর পান নাই। গভীর সমাধি মগ্ন—দুই প্রহর আড়াই প্রহর, কোন দিন বা রাত্রি ভোর পর্য্যন্ত। কোন কোন দিন কালীঘাটে ৺কালীবাড়ী যাইয়া জবাফুলেরমালা

নিজের গলায় পড়িয়া আপন মনে নাচিতে নাচিতে বেঁহুস হইতেন। এই সময় একেবারে যেন উন্মাদ—কি করেন, কোথায় যান, কিছুরই স্থিরতা নাই। এই সময় কুদের কাজও দেখিতেন, ডাক্তারীও করিতেন।

মা পৌষ মাসে বাড়ী আসিলেন, ননদিনীর অশৌচ পড়িবে বলিয়া (উপেন্দ্রের জন্ম)। ঠাকুর সঙ্গে নিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া কিছু দিন থাকেন। তারপর কলিকাতা চলিয়া যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবার বাড়ী হইতে যাইয়া কলিকাতা দুই বৎসর ছিলেন। কুমারটুলীর বাসায় থাকিতেন, এই সময় নিজে পাক করিয়া খাইতেন। কোন সময় খাইতেন, কোন সময় না। ভাত বসাইয়াছেন, সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন ; আগুন নিবিয়া গিয়াছে, চাউল জ্বলিয়া গিয়াছে। হয়ত দুই এক দিন এই ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। সাধনের উগ্র অবস্থা—যেন উন্মাদ। চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা নিন্দা করিতেন। বলিতেন, এ কাজ করা ভাল না। আয়নার আলমারীতে জিনিষ থাকিলে যেমন দেখা যায়, এরূপ না দেখিলে ডাক্তারী করা উচিত নয়। তখন এরূপ অবস্থা যে, কুদের কাজ করা কিম্বা ডাক্তারী করা একেবারেই অসম্ভব। ইহা তিনি বুঝিয়া কুদের কাজ রনজিৎ হাজরাকে বুঝাইয়া দিলেন। সে লাভের অর্দ্ধাংশ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিবে ; এইরূপ স্থির হইলে হাজরা ঠাকুরের বাসা খরচের টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা দাদার নিকট দেওভোগ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ডাক্তারী ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর

গঙ্গার ধারে ধ্যান করিতে বসিয়াছেন, সমাধি মগ্ন; জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে। দেখিয়া সুরেশ বাবু ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সুরেশ বাবু সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে সাথে থাকিতেন ও ধ্যান করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য এক দিন পোস্তার নীচে গঙ্গার পারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এক খানা গরুর গাড়ী কিভাবে উপরে আসিয়া পড়িল, তাহার পর্য্যন্ত খেয়াল ছিলনা—সমাধির অতল দেশে নিমজ্জিত। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখেন ভয়ানক চোট লাগিয়াছে। সুরেশ বাবু ও শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন বারাঙ্গনা গৃহে যান। প্রতিজ্ঞা এই ছিল, একে অন্যকে তাহাতে মুগ্ধ করিবেন। উভয়েই তাহাদিগকে টাকা দিয়া, 'মা গো' 'মা গো' বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসেন। কাহারও মনে কোনরূপ ভাবান্তর হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন ভাবিলেন যে কুড়া খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন। ইহা মনে করিয়া কলিকাতা বাসার ভাড়াটিয়া কৃত্তিবাসের যে চাউলের কুড়া জমা থাকিত তাহা হইতে কুড়া নিয়া জল দিয়া গুলিয়া খাইতে লাগিলেন। পরে কৃত্তিবাস তাহা টের পাইয়া সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলিল এবং তদবধি আর তিনি উহা খাইতে পারেন নাই।

এই সময় এক সিদ্ধ ভাত নিজে পাক করিয়া দুই তিন দিন পরে খাইতেন। খাওয়া দাওয়ার কোনই খেয়াল ছিল না।

দুই বৎসর পরে কর্ম্মজীবন অবসান করিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন।

একবার কলিকাতা যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিলেন, গাড়ীতে একটী লোক বেশ্যার সহিত যাইতেছে। উহাদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইলেন, একটী পিশাচী ঐ লোকটীর ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খাইতেছে এবং এরূপ খাইতে খাইতে দেখেন, কয়েক খানা হাড় মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে।

প্লেগের সময় পাল বাবুরা শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাঁহাদের কলিকাতার বাসার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাখিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। সেখানে একজন পাচক, ব্রাহ্মণ মুহুরী ও একজন চাকর রাখিয়া যান। তিন দিন পরে ঐ ব্রাহ্মণ মুহুরীটীর প্লেগ হয়। প্লেগের রোগী বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর একাই তাহার সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ঐ দিনই সে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গায় লইয়া যাওয়ার জন্য জেদ করায় লোক অভাবে ঠাকুর একাই গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের কোলেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কেহ সৎকার করিতে না আসায় শ্রীশ্রীঠাকুর অতি কষ্টে চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ, প্রত্যেককে চারি টাকা দিবেন স্বীকার করিয়া আনিয়া সৎকার করাইলেন, ইহাতে প্রায় ২৫৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সুরেশ বাবু হাটুখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, নিরাকার ব্রহ্মবাদী। অপর দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর সাকার বাদী এবং দেব দ্বিজে অটল ভক্তি শ্রদ্ধাপরায়ণ। এই দুই ভিন্ন ভাবাপন্ন প্রাণে অতিশয় মাখামাখি ছিল। সুরেশ বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে মামা বলিয়া ডাকিতেন। সময় সময় উভয়ের মধ্যে মতামত নিয়া ঘোর বাক্‌যুদ্ধ হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "আছে বস্তু ল'য়ে আবার বিচার কেন? ভগবান সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ।"

সুরেশবাবু প্রথমে ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকুরীতে কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যান, ক্রমে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। রাগ করিয়া ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দেন। যখন কলিকাতা ছিলেন, কাঠের তহবিলে কাজ করিতেন। প্রতিদিন খাবার সময় ছাড়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকিতেন ও সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক করিতেন। এক বিছানায় শুইতেন। কোন সময় ধ্যান করিতেন। কোথাও যাইতে হইলে দু'জনে একত্র যাইতেন। এই রকম মিল কাহারও সঙ্গে ছিল না। এই সময় নির্জ্জনে দিনযাপন করিবেন বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কালনা যান। এক দিন নদীর পারে বসিয়াছেন, লোকে পয়সা দিতে চায়, এসব বিপদ দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্রমশঃ মহাভাব। আহার নিদ্রায় লক্ষ্য নাই, কখন রাস্তায় কখন ধূলায় পড়িয়া থাকেন, এবং মুখে শুধু হা ভগবান্, হা ভগবান্। আছাড়ে বিছাড়ে শরীর

ক্ষত বিক্ষত। সুরেশ বাবু কখনও খাইতে দিলে কিছু খান, নতুবা উপবাস। কাজ কর্ম্মে একেবারেই অক্ষম।

কর্ম্ম জীবন শেষ করিয়া বাড়ী আসার ছয় মাস পূর্ব্বে চৈত্র মাসে সুরেশ বাবু এক দিন আসিয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বর একজন কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সাধু আসিয়াছেন, দেখ্‌তে যাবে ?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আজ্‌ই যাব।" খাওয়া দাওয়া করিয়া উভয়ে তথায় গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেক লোক। দরজার নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধু কোথায় ?" একজন লোক বলিল, "তিনি এখানে নাই।" কিন্তু পরমহংসদেব সেখানেই বসা ছিলেন। তিনি হাত দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইসারা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও সুরেশ বাবু সেখানে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন, পরমহংসদেব প্রণাম করিতে দিলেন না, পা টানিয়া নিলেন। তিনিও আর প্রণাম করিলেন না। পরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনিও মনে মনে সংকল্প করিলেন, আমি আর প্রণাম করিব না। নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ ?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমি কোন রোগ শোক জন্য আসি নাই, সাধু ও আত্মজ্ঞানী দেখিতে আসিয়াছি।" নানারূপ কথাবার্ত্তার পর পরমহংসদেব ঠাকুরকে পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে বলিলেন। তিনি তথায় গেলে পরমহংসদেব সুরেশ বাবু ও অন্যান্য যাহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "দেখছিস্,

ঐ লোকটী যেন জ্বলন্ত আগুণ, জ্বলন্ত আগুণ!" শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা কামড়ানি ছিল, তাহা পঞ্চবটীতে গেলে সারিয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য যাত্রায় গেলেন পরই পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, "তুমি না ডাক্তার, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে? এই বলিতে বলিতে একেবারে ভাবগ্রস্ত, যেন সকল অঙ্গ বিকল হইয়া যাইতেছে। কেবল বলিতেছেন "শীঘ্র দেখ, শীঘ্র দেখ"। যেই শ্রীশ্রীঠাকুর পা দেখিলেন, অমনি প্রকৃতিস্থ হইয়া সমাধিমগ্ন হইলেন।

এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামী বিবেকানন্দ তথায় প্রবেশ করিলে পরমহংসদেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরই ঠিক ঠিক দীনতা, একটুকুও ভাণ নাই।" স্বামীজী বলিলেন, "তা আপনি যখন বল্‌ছেন, তা হবে!" তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "সকলি তাঁহার ইচ্ছা"। স্বামীজী বলিলেন "আমি ওসব বুঝিনা, আমিই প্রত্যক্ষ পরমাত্মা। আমার ভিতর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উঠ্‌ছে, ভাস্‌ছে ও ডুব্‌ছে।" ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কি শক্তি যে, এক গাছ চুল সিধা করেন। তাঁর ইচ্ছা না হইলে গাছের একটী পাতাও নড়ে না।"

শেষ সময় যখন রামকৃষ্ণদেব গলার ঘা'র যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির, যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, তখন সুরেশ বাবুকে দিয়া খবর দেওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিতে যাইয়া তাঁহার যাতনা

দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার গলার ঘা নিজে নিয়া আসিবেন। এই কথা ভাবা মাত্র, পরমহংসদেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমি না ডাক্তার? দেখ দেখি আমার এই যন্ত্রণার কিছু করিতে পার কি না।" অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর নিকটে যাইয়া গলায় হাত দিয়া মনে করিলেন যে, আমার গলা আসুক। ইহা ভাবিতে না ভাবিতেই পরমহংসদেব হাত ঠেলিয়া বলিলেন, "আমি জানি তুমি পার, তুমি সব রোগ সারাতে পার।"

অন্য এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের শেষ অবস্থায় তাঁহার দেহের যন্ত্রণা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "উঁহার কষ্ট আর সহ্য করা যায় না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চায়।" এই সময় পরমহংসদেবের দেহে যখন অহরহঃ অন্তর্দাহ হইতেছে তখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন, "ওগো, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেসে বস, তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।" এই বলিয়া পরমহংসদেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রহিলেন।

বরাবরই শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরমহংসদেব খাইতে বলেন কিন্তু তিনি কোন দিনই খান না। এক দিন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে, ঠাকুরকে খাওয়াইবেনই। তখন কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইত। তাই বালিশে লিখিয়া দিয়াছিলেন, কি কি খাবার দিতে হইবে। বহু পদ—যেখানকার যাহা ভাল। তাহাই যোগাড় করা হইল। গয়ার পেরা, বাগবাজারের

রসগোল্লা, অন্যান্য মিষ্টি, এমন কি আচার প্রভৃতিও একটী বড় থালা ভরিয়া সমস্ত সাজাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুতেই খাইবেন না। পরমহংসদেব কাঁদিয়া আকুল, না খাইলে ছাড়িবেন না। ঠাকুর পরমহংসদেবকে বলিলেন, "তবে আপনি খান, আমিও খাইব।" পরমহংসদেব বলিলেন, "আমি ত খাই সাগু বার্লি।" তিনি বলিলেন, "আমিও তাহাই খাইব।" পরমহংসদেব বলিলেন, "তোমাকে ঐ থালার সব খাইতে হইবে।" পরমহংসদেবের ব্যাকুলতা ও কান্না দেখিয়া অগত্যা শ্রীশ্রীঠাকুর খাইতে বসিলেন। পরমহংসদেবের স্ত্রী বাতাস করিতে লাগিলেন। বসিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে ভাবগ্রস্ত—সমাধিমগ্ন। কার খাওয়া কে খায়! বহুক্ষণ ঐ ভাবে থাকেন, পরে কিছু হয়ত মুখেও দিয়া থাকিবেন।

যখন পরমহংসদেবের দেহ ত্যাগ হয় তখন শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে, বাড়ী ছিলেন। যে দিন তিনি খবর পাইলেন সে দিন না খাইয়া রহিলেন।

পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর বাগবাজার, যেখানে পরমহংসদেবের স্ত্রী ছিলেন, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার যান। তাঁহাকে শালপাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়। তাহাতে আকও ছিল। তিনি আকের ছোবা সমেত শালপাতা, সব খাইয়া ফেলিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন কোন ভিক্ষুক ফকিরকেও পায় পড়িয়া প্রণাম করিতেন। কেহ প্রণাম নিত কেহ বা নিত না, পলাইত। এক ফকিরকে পায়ে পড়িয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ফকিরও গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিল। এইরূপ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ফকির ত মানবই ছিল। তিনি কীট পতঙ্গ হইতে দেবতা সবই সমভাবে দেখিতেন। এমন কি ধূলি কণায় পর্য্যন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ দর্শন করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কলিকাতা ছিলেন, এক দিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছেন; দেখেন, একটী বাবুও ছড়িহাতে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছেন। ঠাকুরের মনে হইল, ইনি পরমহংসদেবের নিকট যান। একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি পরমহংসদেবের নিকট যান?" তিনি বলিলেন "হাঁ।" তদবধি তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়। ইনিই বেলুড় মঠের তুড়ীয়ানন্দ স্বামী (হরি মহারাজ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কলিকাতায় কর্ম্ম জীবন যাপন করিবার সময়, একবার দাদা বাড়ী আছেন, ঠাকুরও কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছেন। ভাদ্রমাসে একদিন তুড়ীয়ানন্দ স্বামী দক্ষকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে নৌকা করিয়া আসিলেন। দক্ষিণ দিক হইতে নৌকা আসিতেছে দেখিয়া ঠাকুর যাইয়া দেখেন স্বামী তুড়ীয়ানন্দ। অমনি আনন্দে গদ গদ হইয়া তাঁহাকে আগু বাড়িয়া আনিতে হাটুজলে নামিয়া নৌকা ধরিয়া আনিলেন। পর দিন বৈকাল বেলা তাঁহারা পাক করিয়া খাইয়া গেলেন। সন্ন্যাসীরা যদিও সকলের হাতেই খান, তথাপি ঠাকুর তাঁহাকে পাক করিয়া লইতে বলিলেন। স্বামীজী ঢাকা গেলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও সঙ্গে গেলেন। ঢাকা পৌছিয়া সমস্ত

দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; রাত্রি হইয়াছে, থাকিবার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই। ঠাকুর মনে মনে ভাবিতেছেন, ঢাকা এত বড় নগরী, এমন জিনিষ চলিয়া যাইতেছে, একটী লোক ফিরিয়া চায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, "আমাদেরও কোন চিন্তা মনে উঠে নাই যে কোথায় থাকিব, কি খাইব।" একটী ভদ্রলোক সহসা আসিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। ফজলি আম, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়া অতি সমাদরে খাওয়াইলেন। তাঁহারা রাত্রিতেও তথায় রহিলেন। পর দিন বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজী চলিয়া গেলেন। যাবার সময় মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া আকুল। মা'কে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে চায় না। পরেও দক্ষ আসিয়া কয়েক দিন থাকে। এখানে কোনরূপ পাগলামী করে নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা থাকা কালীন,মা মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে পত্র দিতেন কিন্তু ঠাকুর মা'কে মাত্র একখানা পত্র দিয়াছিলেন, তাহাও ৪।৫ লাইন মাত্র। তাহাতে লিখা ছিল, "তুমি বাপ মশয়কে যত্ন কর, এই গুণে তোমাকে ভালবাসিতে মন যায়।" পত্রখানা এন্‌ভেলাপে দিয়াছিলেন। মা এই পত্রখানা অতি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

দেওভোগ লীলাপ্রসঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মগোপন সম্ভবপর নয়। পাছে লোকে চিনিয়া ত্যক্ত করে, এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা হইতে আসেন। এই বারই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ আসা। এবার বাড়ী আসিয়া বলেন যে দক্ষিণেশ্বর এক পরমহংস দেখিয়া আসিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে আর কখনও পরমহংসের নাম করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে আসিয়া কাহারও বাড়ী যাইতেন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। হাট বাজার মাত্র করিতেন। এই সময়ই 'বালকদের প্রতি উপদেশ' পুস্তকখানা লিখেন। বই লিখা হইলে তিনি একবার কলিকাতা যান। তখন বই ছাপাইয়া আনেন। কতক ছেলেপেলেদিগকে বিলাইয়া দেন, কতক উইপোকায় খাইয়া ফেলে। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বিক্রয় করার। পরে মন ঘুরিয়া যায়, আর বিক্রয় করেন নাই। সেই বইখানি অবিকল এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অঙ্গীভূত করা গেল। এই আসার পর তিনি বৎসরে দুই একবার কলিকাতা যাইয়া এক মাস, পনর দিন থাকিয়া চলিয়া আসিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও কোন পূজায় প্রণাম করিতেন না ও অঞ্জলি দিতেন না। পুরোহিত দুর্গাপূজা কিম্বা অন্য পূজার প্রসাদ দিলে তিনি খাইতেন। ৺দুর্গা পূজার পাঁচ দিন এক আধটুকু প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই খান নাই। মা'র অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। মা এক দিন ভাত লইয়া বসিয়াছিলেন, দেখিলেন, রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে, মুখ হইতে তাহাও ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মানসিক ভোগ বা মানসিক হরিলুটের প্রসাদের কথা বলিতেন, ইহা যাহারা খাইবে তাহাদের অসুখ হইবে। একবার গণেশ কাইয়া কতকগুলি মানসিক ভোগের বাতাসা নিয়া আসিয়াছিল, তিনি এখানকার কাহাকেও তাহা খাইতে দেন নাই।

পরমহংসদেব বলিতেন—উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ইহাদের ধর্ম্ম হয় না। একথা শুনার বহু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারী ছাড়িয়াছিলেন, কারণ তাঁহার এই ব্যবসায় ভাল লাগিত না। তিনি বহু ঔষধ সহ ঔষধের বাক্স এবং ডাক্তারী পুস্তক সকল দেশে নিয়া আসেন। যাহাকে না দিলে না হয় একেবারে ধরিয়া পড়িত, তাহাদিগকে ঔষধ দিতেন। পুস্তকগুলি অধিকাংশই উই পোকাতে নষ্ট করে। অবশিষ্ট পুস্তকের অধিকাংশ এবং ঔষধের বাক্স গ্রামের শ্রীনাথ গুঁহ মহাশয়কে দেন। দুই একখানা নটোবর বাবুও নেন, একখানা লেখকের নিকট আছে।

একবার ভোজেশ্বরে খুব কলেরা মহামারী আরম্ভ হয়। ভোজেশ্বরের বাবুরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতা না পাইয়া বাড়ীতে

লোক পাঠান। তিনি তথায় যান। বাবুদের বাড়ীর যার যার ব্যারাম হইয়াছিল, সকলেই ভাল হইল। আর যেখানে যাইতেন সেই রোগীই ভাল হইতে আরম্ভ করিল। কেহ দুই ফোটা, কেহবা এক ফোটা ঔষধেই আরোগ্য। লোকে বলিত, "এমন ডাক্তার আসিয়াছেন যে, ঝাড়িয়াই ভাল করেন। তিনি যাহাকে দেখেন সে মরে না।" দুই প্রহর আড়াই প্রহরের রাস্তা হইতে লোক আসিত। তাঁহার খাবার সময় নাই, দিন রাত্রি খাটুনি। তিনি গিয়াছেন পর একটী লোকও মারা যায় নাই। পাল বাবুদের পাকের ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের পাকে ঠাকুরকে একদিনও খাইতে বলেন নাই। তাঁহাকে তাঁহারা সবরী কলা, দুগ্ধ ও আতপ চাউল দিতেন। তিনি পাক বসাইলে লোক ডাকিতে আসিত, আর পাক হইত না। এভাবে দুই চারি দিন চলিয়া যাইত। কোন কোন দিন ঐ আতপ চাউল পাক করিয়া দুগ্ধ কলা যোগে খাইতেন। যাহাদের ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন মারা গিয়াছিল, তাহারা বলিত, ইঁনি পূর্ব্বে আসিলে আর আমাদের উহারা মরিত না, এই বলিয়া অনেক লোক আপশোষ করিত। সেখানে পনর কুড়ি দিন ছিলেন। একেবারে ব্যারাম শূন্য হইলে চলিয়া আসেন। সে সময় টাকা নিলে বহু টাকা আনিতে পারিতেন। অনেকে টাকা সাধিয়াছে, কিন্তু অন্য কাহারও নিকট হইতে এক পয়সাও নেন নাই, কেবল পালবাবুদের নিকট হইতে আসা যাওয়ার খরচ আনিয়াছিলেন মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় বলিয়াছেন যে, পালেরা যদি একদিনের খাটুনির টাকা দিত, তবে আর সারা জীবনে কিছু করিতে হইত না। অনেক সময় বলিয়াছেন, "আমি উহাদেরটা মাগনা খাইনা।" কুদের কাজের বন্দোবস্ত মাত্র পালেরা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই উঁহাদের কাজ মনে করিয়া বলিতেন, "আমি উঁহাদেরটা মাগনা খাইনা, কাজ করিয়াই খাই।"

ঠাকুরদাদার বাড়ী আসার পরের পৌষ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বাড়ী আসেন। ননদিনীর অশৌচ পড়িবে বলিয়া মা'কে বাড়ী আসিতে হইল। সেই গর্ভে ভাগ্নি লাবণ্য জন্মগ্রহণ করে। মাঘ মাসে মা'র সাংঘাতিক কলেরা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরই ঔষধ দিতেন। শ্বশুর ও ননদিনী কাঁদিয়া আকুল। দুইবার দাস্ত একবার বমি হওয়ায় মা রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যত্নে মা সুস্থ হইলেন।

ফাল্গুন মাসে পূর্ণচন্দ্র দাসের ৪ বৎসর বয়স্ক ছেলের কলেরা হয়। ভয়ানক বিকারের অবস্থা, লোককে কামড়াইত। স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছুই উপকার হয় না। সকলেরই ধারণা মারা যাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর চিকিৎসা করেন এবং তিন চারি দিন সেহাচর থাকিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া, ফিরিয়া আসেন। পূর্ণদাস সম্পর্কে ঠাকুরের ভায়রা কালীগঞ্জ উকিল ছিলেন। তিনি সেহাচর গিরীশদাসদের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলেন। পূর্ণদাসের ছেলের

ব্যারাম ভাল হইলে তিনি এক দিন তাহার শ্বশুরালয় ভূএগ্রা বাড়ীতে সামান্য আয়োজন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোজন করান। মা এবং দাদাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় সেহাচর কৈলাসদাস মহাশয়ের কন্যা বিনদার জ্বরাতিসার হয়। বয়স মাত্র পাঁচ মাস। বাঁচিবার আশা ছিল না, তাহাকে বাহির করাও হইয়াছিল। ঠাকুরের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। পরে অর্দ্ধাঙ্গ হয়, তাহাও তিনি আরোগ্য করেন।

দেওভোগের রামচরণ চক্রবর্ত্তীর ছয় বৎসর বয়স্ক ছেলে রতিকান্তের সুবাসপুরে কলেরা হয়। মুন্সীগঞ্জ হইতে ডাক্তার আনান হইয়াছিল। ছেলে সান্নিপাতাক্রান্ত ও আশা শূন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকেও ঔষধ দিয়া রোগ মুক্ত করেন।

কেদারেশ্বর মজুমদার মহাশয় যখন ঢাকা চাকুরী করিতেন, তাঁহার দুই বৎসর বয়সের একটী ছেলের কলেরা হয়। তাহাকে ঢাকা খবর দেওয়া হইলে তিনি লোক যাওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী কিনা ?" সে লোকটী বলিল, "তিনি কলিকাতা গিয়াছেন।" অমনি মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "তবে এ ছেলের আশা ছাড়িয়া দাও।" অন্যান্য চিকিৎসা হইল, কিন্তু ছেলেটী মারা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন একটী ছেলে দেখিনা, হয় না। আমি বাড়ী থাকিলে চিকিৎসা করিতাম, ছেলে মরিত না।"

একবার বাড়ৈভোগ খুব কলেরা লাগিয়াছিল। এক

মণ্ডল আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানায় যে, যার কলেরা হয় সেই মারা যায়। তিনি বলিলেন "তাঁর ইচ্ছা হইলে থাকিতেই বা কতক্ষণ? আমি কি জানি? আমি কিছুই জানি না। আমি হাড় মাংসের খাঁচা নিয়াই অস্থির!" মণ্ডল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে তিনি যাইয়া ঐ গ্রাম ঘুড়িয়া আসেন। সে অবধি যাহাদের ব্যারাম ছিল তাহারা সব ভাল হইল। আর নূতন ব্যারাম হয় নাই।

সনাতন মণ্ডলের বাড়ী দেওভোগ। বহুদিন সে কাশরোগে ভুগিতেছিল। যখন রোগ যন্ত্রণা অসহ্য হইল এবং কাশির সঙ্গে বহু রক্ত পড়িতে লাগিল, জীবনের আশা একেবারেই নাই, কোন ঔষধেই ধরে না, তখন সে এক দিন ঠাকুর বাড়ী যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যারামের বিষয় জানায় এবং সারাইয়া দিতে অনেক কাকুতি মিনতি করে। তিনি বলিলেন, "আমি কি জানি? আমি নিজের দেহ নিয়াই অস্থির।" সে কিছুতেই শুনেনা, তাহাকে অনেক বুঝাইলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না; কিন্তু সে একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়া রহিল। বেলা অধিক হইলে তাহাকে খাইতে বলিলেন। সে খাইবেও না, যাইবেও না, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি খাইয়া বাড়ী যান; এরূপ ভাবে থাকে না, হয়ত ব্যারাম বিনা ঔষধেও সারিতে পারে।" পরে সে খাইয়া বাড়ী চলিয়া যায়। ক্রমে সেই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়া গেল।

৫।৬ বৎসরের একটি ছেলে নিয়া তাহার পিতামাতা আসেন। ছেলেটী জ্বর প্লীহাতে মৃতকল্প, নৌকায় আনা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আমি কি জানি? আমি দেহ নিয়া কত ভুগিতেছি!" তিনি কোন দিন কাহাকেও কোন দৈবী ঔষধ পত্র দেন নাই। তাহারা ঠাকুর বাড়ীর মাটী ছেলের গায়ে মাখিয়া নিয়া গেল। পরে শুনা গেল ছেলেটী ভাল হইয়াছে।

শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার এক আত্মীয় অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী একবার দেওভোগ আসেন। তিনি রাত্রিতে ঠাকুর বাড়ী পেট ভরিয়া খাইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীর শূল বেদনা ছিল। পাচ মাস যাবৎ রাত্রে জলও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সন্ধ্যা হইলেই ব্যথায় মৃতবৎ পরিয়া থাকিতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে রাত্রে ঠাকুর বাড়ীতে কিম্বা রাস্তায় তাঁহার কোনই ব্যথা বা যন্ত্রণা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, এমন মহাপুরুষের হাওয়া লাগিয়া আমার জন্মান্তরীণ পাপের ফল স্বরূপ এই উৎকট ব্যাধি দূরীভূত হইয়াছে।

দেওভোগের শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন। নটবর বাবু, হরপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই লোকটী মরিত ঠিকই। এতগুলি লোকের ইচ্ছা, ভাল হউক, তাই ভাল হইল। লোকের ইচ্ছায় কেহ বাঁচে না বা মরে

না। তাঁর ইচ্ছায় ভাল হইল, কিন্তু তবুও তিনি বলিলেন “এতগুলি লোকের ইচ্ছা।” মা বলেন, “দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়।”

মার কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে বাহির বাড়ীর চৌচালা ঘরের কারে দুইটি ভূতুম পক্ষী বাসা করে এবং তথায় ডিম পারিয়া ছানা করিয়া নেয়। কেহ তাহাদিগকে তাড়ায় নাই। তখন তাহারা বেলা থাকিতেই দুইঘরের চালে দুইটি বসিয়া ভূত ভূতুম শব্দ করিত।

ঠাকুর কলিকাতা ছাড়িয়া আসিলেন পর দীঘলেজ নামক এক প্রকার পশু পূর্ব্বের ঘরের কারে বাসা করে, এবং তথায় বাঁচ্চা করিয়া নেয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের বাঁচ্চা আনিয়া দেখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পুনরায় কারে নিয়া রাখিয়া দিতেন।

পশ্চিমের ভিটার রান্না ঘরের পিছনে যে একটি প্রকাণ্ড আম গাছ ছিল, তাহাতে দীঘলেজ বাঁচ্চা করিয়াছিল বাঁচ্চা সময় সময় পড়িয়া যাইত, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা নিয়া গাছে উঠিয়া তাহার বাসায় রাখিয়া দিতেন।

একটা সুন্দর বিড়াল কোথা হইতে হাটিতে হাটিতে আসিয়া দক্ষিণের ঘরের সম্মুখে পড়িয়া মরিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিকটেই দাঁড়ান। তাঁহার ভগিনী উহাকে রাম নাম শুনাইলেন। অন্য সময় আর একটী বিড়াল রামলক্ষ্মীর বাড়ী হইতে হাটিয়া আসিয়া মণ্ডপে কাঠামের তলে গেল, কিছুক্ষণ পরে মরিয়া রহিল। আর এক দিন একটী বাজপক্ষী উড়িয়া আসিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমের ঘরের কোণে আসিয়া বসিল, বসিয়া মরিয়া গেল।

বর্ষাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন নৌকায় বাজারে গিয়াছেন, আসার সময় একটী বিড়াল-শিশু হাটিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল। কত দিন পরে একটা খাটাশ রাত্রিতে উহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি শব্দ পাইয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া তাহার পিছনে ছাড়া বাড়ীর দিকে দৌড়াইলেন। গায়ে আচরও লাগিল, কিন্তু সেই বিড়াল-শিশুকে খাটাশের মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। উহার নাড়ীভূড়ি সব বাহির হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ভাবিল, তখনই মরিবে। কিন্তু তিনি অঙ্গুলি দিয়া সব নাড়ীভূড়ি ভিতরে দিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া দুধ খাওয়াইয়া ভাল করিলেন।

এক দিন এক জেলে দক্ষিণের গড়ে জাল দিয়া কয়েকটী মাছ ধরে। শ্রীশ্রীঠাকুর টের পাইয়া তথায় দৌড়াইয়া যান। যাইয়া সেই সব মাছ ও তাহার খারিতে যে মাছ ছিল তাহা উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া ঐ জলে ছাড়িয়া দেন।

একবার দাদা বাজার হইতে কই মাছ আনিয়া শ্রীশ্রীমা'কে কুটিতে বলিলেন। মা কুটিলেন না, ঠাকুরের নিষেধ ছিল। তখন দাদা নিজেই কুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "যারা খাইবে তাহাদের পাপ হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "আপনিই খাইবেন, আর কেহ খাইবে না।" দাদাকে রাধিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা খাইলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শেষ অসুখে পরেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই দুইটী শালিক সর্ব্বদাই আসিত। প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে বেশী

আসিত। তিনি যখন যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরের ভিতর যাইত। তিনি খাইতে দিতেন, হাত হইতে নিয়া খাইত। কোন সময় সম্মুখে রাখিয়া দিতেন, তাহাও উহারা বসিয়া খাইত। তাঁহাকে শয়ান দেখিলে গায়ের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্ব্বে আর তাহাদিগকে দেখা যায় নাই। পাছে কেহ ধরিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় হয়ত তাহারা আর আসিত না।

একবার গ্রামে বারোয়ারি কালীপূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদা দিয়াছিলেন। শুনিতে পাইলেন, তাহারা পাঠা বলি দিবে, তিনি তাহা নিষেধ করিতে সকলের নিকট নানারূপ কাকুতি মিনতি করিলে, সকলেই বলি না দেওয়া স্বীকার করিল; কিন্তু রামচরণ চক্রবর্ত্তী পুরোহিত বলিলেন, "না, বলি দিবই।" এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নানারূপ অনুনয় বিনয় না শুনিয়া বলি দিল। তাহার কতিপয় দিবস পরে, তাহার বাড়ীতে অন্য হিস্যার হরিচরণ হালদার তাহার ছোট ভ্রাতৃবধূকে দা দিয়া কাটিয়া ফেলে। সে ধরিতে যাওয়ায় তাহার মাথায় কোপ পড়ে, তাহাতে মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "প্রতিজীবে এক ভগবানই বিরাজ করিতেছেন। প্রতি ভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।" এক দিন একটি লোক ঘরের পিছন হইতে আম গাছের একটী পাতা ছিড়িলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা এদেরও সুখ দুঃখ আছে। যাহা গড়িবার সাধ্য নাই, তাহা ভাঙ্গা উচিত কি?"

তিনি কখনও মশা মারিতেন না। বিছানার ছারপোকা গুলিকে যত্নে স্থান দিতেন। গায়ে পিপীলিকা উঠিলে তাহাদিগকে অতি সাবধানে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া দিতেন। কখন কখন এমন হইত যে, পোকা, মাকর প্রভৃতি মারা যাইবার ভয়ে পথ চলিতে পারিতেন না। শ্বাস প্রশ্বাসে বায়বীয় কীট সকল বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় কখন কখন নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। এক দিন একটি লোক মণ্ডপ ঘরের বেড়ায় উই পোকা দেখিয়া উহাদের বাসাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, "হায় হায়! কি করিলেন, ইহারা এত দিন এখানে বাস করিতেছিল। ইহাদের আশ্রয় নষ্ট করিয়া আপনি বড় অন্যায় করিয়াছেন।" এই বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। লোকটী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। ঠাকুর উই পোকাগুলিকে বলিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈয়ার করুন, আর ভয় নাই।" আবার বাসা তৈয়ার হইল। পরে আর কাহাকেও ঐ বেড়া ছুইতে দিতেন না।

এক দিন ইষ্টদেবতার ছোট ভাই নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়াছিলেন, তামাক খাইতে একটী পাতার দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুর কলা গাছের নিকট যাইয়া ঘুরিতেছেন, পাতা ছিড়িতে পারেন না। মা দেখিয়া যাইয়া পাতা ছিড়িয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি আনিয়া দিলেন। তিনি কখনও পাতা ছিঁড়িতে ও গাছের ডাল ভাঙ্গিতে পারেন নাই। জ্বালানি

কাঠের জন্য গাছ কাটিতে দিতেন না। ঘরের পিছনে বাঁশ ঝাড় ছিল, বাঁশের কঞ্চি সব ভাঙ্গা বেড়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করিত। ঠাকুর একটীও কাটিতেন না, বা তাঁহার সম্মুখে কেহ কাটিতে পারিত না। যাহা কিছু করা হইত, তাঁহার অনুপস্থিতিতে। তিনি আসিয়া দেখিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, "উহাদেরও প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ আছে। নিজের গায়ে কোপ দিলে কেমন লাগে?" গাছের ফল ছিঁড়িতেও তিনি আপত্তি করিতেন। বলিতেন, "পাকিয়া পড়িলে খাইতে হয়। ছিঁড়িলে গাছ কষ্ট পায়।"

যে রাস্তায় দুর্ব্বা বা ঘাস থাকিত সে রাস্তায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাটিতে পারিতেন না, পা বাঁকিয়া যাইত। বলিতেন, "উহাদেরও প্রাণ আছে।" যেখানে ঘাস নাই, লোকের হাটা চলায় পরিষ্কার হইয়াছে, সেই জায়গা দিয়া হাটিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাছের বাজারে যাইতেই শরীর কেমন হইয়া যাইত। মাছমারা, কাটা, ছিঁড়া দেখিতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিত, পা বাঁকিয়া যাইত। সব সহ্য করিয়া তিনি কোন মতে মাছ নিয়া আসিতেন।

বাড়ীর উত্তর দিকের পুকুরে দুইটী মাগুড় মাছ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাটে যাইয়া ডাক দিলেই উহারা নিকটে আসিত। হাতে ধরিয়া ভাত দিতেন। উহারা ভাত খাইয়া আবার মহানন্দে চলিয়া যাইত।

মা এক দিন রাত্রিতে পূর্ব্বের ঘর হইতে রান্নাঘরে আসিতে এক সাপের উপর পারা দিয়াছিলেন। সে সাপ পুনঃ পুনঃ ঘরের পিড়া বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। লোক সঙ্গে সঙ্গে ছিল, কিন্তু যখন সাপ ফণা বিস্তার করিয়া ছোঁ দিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলেই পলাইল। এই সাপ পাকের ঘরও দুই তিন বার ঘুরিয়া আসিয়াছে, বহু চেষ্টায়ও উঠিতে না পারিয়া নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেল। মা বলিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাই সে এইরূপ করিল।

এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর শুইয়াছিলেন,একটা বিড়াল লাফ দিয়া একেবারে মাথার উপর পড়িল। বিড়ালের একটী নখ তাঁহার বাম চক্ষের ডিমে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল। চক্ষু ফুলিয়া উঠে, তিনি অনেক যন্ত্রণা পান, কতজনে কত ঔষধ দিতে বলিল, তিনি কিছুই দিলেন না। ক্রমে আপনা হইতেই সারিয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার দক্ষিণের গর্ত্তে একটী বিষধর কেউটে সর্প দেখিয়া মা'কে সাবধান হইয়া ঘাটে যাইতে বলিয়াছিলেন। ইহার তিন চারি দিন পরে তিনি খুব ভোরে হাত মুখ ধুইতে যেই মাত্র জলে হাত দিয়াছেন, অমনি তাঁহার বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী ঐ সাপে একেবারে কামড়াইয়া ধরিয়া অনেক জায়গা কাটিয়া ফেলিল। তিনি জোর করিয়া টানিয়া ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনও মা শুইয়া আছেন, তিনি যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া সর্পদংশনের কথা বলিলেন। মা দৌড়িয়া বাহির হইয়া গলায় যে তাবিজের

তাগ ছিল তাহাই ছিঁড়িয়া বাঁধিলেন। ভাওয়ালের সমরসিংহ নিবাসী মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই দিন অতিথি ছিলেন। তিনি তাহার পৈতা ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। সকলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল, যে যাহা জানে, সে সেই ঔষধ দিতে লাগিল। তিনি নিশ্চিন্ত, বলিতে লাগিলেন, "ঔষধের প্রয়োজন নাই, সারিয়া যাইবে।" পরে একজনে বিষ নামাইল। তিনি আপত্তি করিলেন না।

এক দিন দুইটী ভদ্রলোক ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজের নিন্দাবাদ এবং তাঁহারা ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বলিতেছিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত রাগিয়া উঠায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইংরেজ এখন সকলের সেরা। তাঁহারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। সহজ তপস্যায় ভিক্টোরিয়া মহারাণী হন নাই। তাঁহাদের নিন্দা শোভা পায় না। জ্ঞানের চর্চ্চা তাঁহারাই করে।

কাহারও গরুর বাছুর হইয়াছে, দুধ খায় না, ইহা ঠাকুরকে আসিয়া বলিলে, তিনি বলিতেন, "আমি কি জানি?" তাহারা আপন মনে কেহবা একটুকু মাটী, কেহ বা একটুকু জল ঘটিতে করিয়া নিয়া যাইত। তাহাতেই তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইত।

ধর্ম্মগঞ্জের এক মণ্ডল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া জানায়, তাহার বাছুরে গাভীর দুগ্ধ খায় না। তিনি বলিলেন, "আমি তাহার কি করিব? আমি কি জানি?" সে বলিল, "আমার বাছুরে দুগ্ধ খাওয়া চাই, নতুবা আমি যাইব না।" এই বলিয়া

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। সে যায় না দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "যান, দেখুন গিয়া, হয় ত বাছুর দুগ্ধ খাইতেছে, বাছুর যখন হইয়াছে তখন দুগ্ধ খাইবেই। সম্মুখ দিয়া না খায় ত পিছন দিয়াও খাইতে পারে।" সে যাইয়া দেখে, পিছন দিয়া দুধ খাইতেছে। সেই বাছুর পিছন দিয়াই সেইবার দুধ খাইল।

সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একবার কলিকাতা হইতে পাঁচ টাকা ডাকযোগে পাঠান। তখন খুব অর্থাভাব। ঠাকুর-বাড়ীর অনতিদূরে দক্ষিণে একঘর সাহা আছে। সেই বাড়ীর কিশোরীমোহন সাহার মাতা নিতান্ত গরীব। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অভাব জানায় ও কিছু চায়। তিনি ঐ টাকা হইতে তাহাকে একটী টাকা ও তিন সের চাউল দিতে মা'কে বলিলেন। মা তখনই তাহা দিলেন। সেই অবধি তাহাদের ভাগ্য ফিরিল। এখন তাহাদের অবস্থা ভাল।

পারজোয়ার, কোণ্ডা নিবাসী কাশীরাম দাস সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইত। তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে পুনঃ বিবাহ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইল কিন্তু টাকার অভাব। টাকার জন্য প্রতিবেশী ও টাকা লগ্নি ব্যবসায়ীদের নিকট অনেক বার অনেক কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও কেহই তাহাকে টাকা ধার দিতে রাজী হইল না। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া অতি দুঃখের সহিত এসব কথা জানাইল। তখন তিনি তাহাকে আশ্বস্থ করিয়া বলিলেন, তাহারা টাকা দিতে রাজী হয় নাই সত্য কিন্তু আবার চাহিলে হয়ত দিতেও পারে।

সে বলিল যে, বহু বার চেষ্টা করিয়াছে, কেহই দিতে স্বীকার হয় নাই। তিনি বলিলেন, "যান, কোন চিন্তা করিবেন না, আবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।" সে বাড়ী চলিয়া গেল এবং পর দিন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে জনৈক পূর্ব্বকথিত মহাজনের নিকট টাকার বিষয় পুনঃ প্রস্তাব করিল। সে ব্যক্তি কোন দ্বিধা না করিয়া তাহাকে তমঃসুক কাগজ আনিতে বলিল। সে টাকা ধার নিয়া বিবাহ করিল এবং ক্রমে কয়েকটী ছেলে, মেয়ে জন্মিল। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া অতি কৃতজ্ঞতার সহিত বলিত যে আপনি বেশ ফুল বাগান সাজাইয়াছেন। আপনার কৃপায় এসব ফুল ফুটিয়াছে। এইরূপ অনেক কথা বলিত। সে যত দিন জীবিত ছিল মধ্যে মধ্যে আসিত। আসার সময় ভোগের জন্য বাতাসা নিয়া আসিত। কোন কোন সময় তাহার প্রতিবেশীদিগকে গান গাইতেও নিয়া আসিত। অপরাপর যাহাদিগকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতে যাইতে দেখিত, তাহাদিগকে বলিত, এখানে আসা যাওয়া কিন্তু ছাড়িও না।

দেওভোগের বিপিনচন্দ্র দের ভগিনী বসন্তকে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বসন্ত ও তাহার অন্যান্য ভগিনীগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে লাঙ্গলবন্দে যাওয়ার জন্য নৌকা আনাইতে পারিতেছিল না। পিতাম্বর দত্তের মেয়েও স্নানে যাইবার জন্য কান্নাকাটা করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর জল সাঁতরাইয়া যাইয়া নৌকা নিয়া আসিলেন।

তখন বেলা অনেক হইয়াছে। পরে যাত্রী অনেক হইল। এক নৌকাতে কুলায় না দেখিয়া তিনি পুনরায় অন্য নৌকা আনিতে চলিলেন। নৌকা না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন; দেখিলেন, একখানা নৌকা ফিরিয়া যাইতেছে। সেই নৌকাই আনিলেন। এক নৌকায় শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, দাদা, মা'র ভগ্নি, তাহার কন্যা ও নটবর বাবু,অন্য নৌকায় বসন্ত,তাহার ভগিনীগণ ও অন্যান্য লোক। যাইতে দেরী হইল দেখিয়া, দাদা নৌকায় উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "সকলে চলিয়া আসিবে, আর আমরা যাইব! যাইতে যাইতে আমাদের জন্য কি স্নান বসিয়া থাকিবে?" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "যার জন্য যায় তার জন্য বাড়ীতেই যায়। তার জন্য স্নান বসিয়াই থাকে। তার আর যাইতে হয় না, সে ঘরে বসিয়াই পায়।" লাঙ্গলবন্দ যাইতে যাইতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করিলেন না। অন্যান্য সকলেই স্নান করিলেন। রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পর দিন বেলা দুটা তিনটার সময় মা হাটিতে হাটিতে বাড়ীর অগ্নিকোণে গিয়া দেখেন, পুরান মণ্ডপের ভিটির উত্তর দিক হইতে উঠিয়া জল পশ্চিম দিকে আসিতেছে। মা যাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "জল এরূপ উঠিতেছে কেন? জলে নদীর ফেনার মত উঠিয়াছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া ঐ জল মাথায় দিলেন। মা'র ভগিনী তাঁহাকে মাথায় দিতে দেখিয়া নিজেও মাথায় দিলেন, কাদা সমেত জল গায়ে মাখিলেন ও পান করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে বলিলেন,

"মা-গঙ্গা আসিয়াছেন, একথা কাহাকেও বলিওনা"। জল পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভিটির কোণ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে নামিয়া গেল। মা'র ভগিনী সেই জলে ধূপ বাতি ও ফুল দিলেন। দাদা ঘরে ছিলেন ঘরেই রহিলেন। এ সব শুনিয়াও বাহিরে আসেন নাই। ঠা'নদিদি এখানে ছিলেন, তিনিও মাথায় ও মুখে দিলেন। মাও একটু মাথায় দিলেন ও পান করিলেন। মা'র ভগ্নি হরকামিনী দেবী একটী নূতন ঘটে করিয়া এক ঘট জল নিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিলেন। ঐ জল ও কাদা পান করার পরই বলিয়াছিলেন, "আমার পেটের চাকা যেন নাই।" সেই অবধি তাঁহার বহুদিনের গুল্মরোগ সারিয়া গিয়াছিল। তিনি জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; তাই আর কাহাকেও জানান হয় নাই, কেহ আসেও নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন মহাপুরুষের অমোঘ ইচ্ছায় কিছুই অসম্ভব নয়।"

একবার ৺দুর্গা পূজার সময় পুরোহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে প্রসাদ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভগিনী সারদাদেবীকে প্রসাদ লইতে ডাকিলেন, সারদা বলিলেন, "আমি কাজ করি, পরে আসিতেছি।" তিনি প্রসাদ রাখিয়া দিলেন। পরে সারদা আসিয়া প্রসাদ নিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এখন নিলে আর কি হবে?" পরে অন্যান্যের নিকট তিনি বলিয়াছেন, "তখন প্রসাদ নিলে কাবু করিত।" তাহারা বলিল, "কেন, প্রসাদ ত নিল।" তিনি বলিলেন, "মহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গেলে আর হয় না।"

ঠাকুরের ভাগিনেয়ী লাবণ্যদেবীকে তাহার বাপের মাসী-বাড়ী সুভাড্যা হইতে তাহার পিত্রালয় পঞ্চসার সম্বন্ধের জন্য দেখাইতে নিবে; এক দিন বৈকালে এখানে আসে। ঠাকুর খাইয়া গেলে সেই পাতে লাবণ্য খাইতে বসিল, মা ভাত দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাতে কে খাইয়াছে?" মা বলিলেন, "লাবণ্য খাইয়াছে।" তখন তিনি মা'কে বলিলেন, "উহার বুকের শ্বেতী সারিয়া গেল। আজ খাবার সময় আমার মুখের একটা ভাত থালে পরিয়াছিল।" ঠাকুরের পাতে অন্য কাহাকেও মা খাইতে দিতেন না, নিজেই খাইতেন। কোন কারণে মা এক আধ দিন না থাকিলে, ঠাকুরের পাতে তাঁহার ভগিনী খাইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদা সব সময়ই শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়া পরার খোটা দিতেন। এক দিন কথায় কথায় দাদার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঝগড়া লাগিল। এরূপ ঝগড়ার দিনক্ষণ ছিল না, রাত্রিতে, দ্বিপ্রহরে সব সময়ই হইত। দাদা বলিতেন, "পরের বোচ্‌কা খাও, রোজগার করিয়াত খাওনা, দিশা পাইবে কি?" এইরূপ সর্ব্বদাই বলিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঝগড়া করিতে করিতে বলিতেন, "আমি না খাইয়া থাক্‌তে পারি। আমি বাঁশ পাতা খাইয়া থাক্‌তে

পারি। আমি মাটি খাইয়া থাক্‌তে পারি। আমি কি খাবার জন্য থাকি ? আমি শুধু আপনার জন্য থাকি”। দাদা বলিতেন, “তুমি আমার জন্য থাকিও না।” দাদা এরূপ খাওয়ার কথা যখন বলিতেন, তখন তিনি কোন দিন বাঁশ পাতা খাইয়া বাবাকে দেখাইতেন, কোন দিন বা মাটী খাইয়া দেখাইতেন। আর বলিতেন, “দেখুন, আমি কি খাইয়া থাক্‌তে পারি। আমার খাওয়ার কোন অভাব নাই”।

এক দিন এরূপ ঝগড়া লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মনে ভাবিয়াছিলেন মাটীই খাইবেন, কিন্তু সম্মুখে দেখেন একটা মরা বেঙ। উহা ঠাকুরের ভগিনী ঘর হইতে ঝাট দিয়া উঠানে ফেলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বেঙটা হাতে লইয়া বাবাকে বলিলেন, “দেখুন, আমি কি খাইয়া থাক্‌তে পারি।” এই বলিয়া ঐ মরা বেঙটি কচ্‌কচ্‌ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। দাদা কিংবা ঠাকুরের ভগিনী তাহা খাইতে নিষেধ করা, বা টানিয়া ফেলা কিছুই করিলেন না; অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। মা উত্তর দিকের ঘাটে ছিলেন। দূর হইতে দেখিয়া অনুমান করিলেন বুঝি তর্ক বিতর্ক করিয়া আমের আঠিটা মুখে দিয়াছেন, পরে জানিলেন আঠি নয়, বেঙ্। তাহা খাইয়া তাঁহার কোন অসুখ হয় নাই, মা বলেন, একথা মনে করিয়া অনেক দিন তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে, বমির উদ্রেক হইয়াছে।

দাদা কাপড়ের খোঁটা দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “আমার কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই, পরি লোকসমাজের

জন্য”। দাদা বলিতেন, “তবু লাগেত।” শ্রীশ্রীঠাকুর উলঙ্গ হইয়া বলিতেন, “দেখুন, আমার কাপড়ের প্রয়োজন নাই।” আরও বলিতেন, “আমি মাতৃগর্ভ হইতে যেমন পরিয়াছি, তেমনই আছি। কোন দিন স্ত্রীসঙ্গম করি নাই, আমার কাপড়ের প্রয়োজন নাই।” এইরূপ উলঙ্গ অনেক দিন হইতেন। দাদা বলিতেন, “বাড়ী ঘরেরত প্রয়োজন আছে।” তিনি বলিতেন, “বাড়ী থাকি আপনার জন্য, আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমার বাড়ী, এই ব্রহ্মাণ্ডই আমার।” দাদা বলিতেন, “তোমাকে দিয়া আমার কি হইল? বাপ দাদার নামটা পর্য্যন্ত লোপ হইল।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “আপনার বাপদাদার নামত আপনি পর্য্যন্তই। মাছের লাখ্‌লাখ্‌ বংশ, শিয়াল কুকুরেরও কত বংশ, তাহার নাম কে লয়? আমার নাম থাকিবে অনন্ত কাল। আমার সুখ দুঃখ নাই। আমার কোন প্রয়োজন নাই, যেমন ইচ্ছা, পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কুঠার দিয়া কোপাইয়া দেখুন, বিকৃত হই কিনা। কাপড় পরি দেখিয়া, খাই দেখিয়া, আমার কোন প্রয়োজন নাই।”

দাদা দক্ষিণের গড়ে ঘরের সাজু ভিজাইয়াছিলেন। তাহা এক দিন উঠাইতে যান। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা উঠাইতে নিষেধ করেন। দাদা তুলিবেনই, দুই জনে তুমুল ঝগড়া। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “আপনি যদি এসব তোলেন, তবে আমি এই চল্লাম।” দাদা কিছুতেই শুনিলেন না, উঠাইলেনই। তিনি

অমনি বাড়ী হইতে রওনা হইলেন। মা পাক করিতেছিলেন, ফেলিয়া পিছনে পিছনে ছুটিলেন। দাদা আসিয়া ওটার উপর বসিলেন। ছেলে ও বধূকে এইরূপে যাইতে দেখিয়াও ভ্রূক্ষেপ নাই, একবার নিষেধও করিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরোহিত বাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত গেলেন, মা পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন, দেখিয়া কাশীকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী ডাকিতে, ডাকিতে পিছনে পিছনে গেলেন। অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী পুরোহিত যাইয়া ধরিলেন। "হায় রে! ন'দের চাঁদ, তুই ন'দে ছেড়ে কোথায় যাবিরে?" এই বলিয়া ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। দাদা নিশ্চিন্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, হুঁ, হাঁ কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর পরে মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে পিছনে পিছনে গেলে, শেষে কোথায় থাক্‌তে? কি করিতে?" মা বলিলেন, "আমি কি ভাবিয়া চিন্তিয়া গিয়াছিলাম শেষে কি হইবে। আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানে যাইব এই আমি জানি।"

এক দিন দাদা কাপড় কাপড় বলিয়া নানারূপ খোচা দিয়া কথা বলিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "দেখুন আমার কাপড়ের প্রয়োজন নাই।" ইহা বলিয়া অমনি কাপড় ফেলিয়া দিলেন, ভাবে উন্মাদ প্রায়। মা কাপড় পরাইতে পারিতেছেন না, এমন সময় কামিনী গাঙ্গুলী আসিয়া কাপড় পরাইয়া কতকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বলিতেন,বই, মই লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হয়। এই পড়ার বিশ্রাম, এক গ্রন্থ রাখিয়া অন্য গ্রন্থ পড়া। সর্ব্বদা বলিতেন, "ধ্যানাৎ মুক্তি, গানাৎ মুক্তি।" এই দুটিতে খুব জোর দিতেন। সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমি হাঁদা লোক, আমি কি জানি?"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাহারা আসিত তাহাদিগকে ঠাকুর ভাগবত, কাশীখণ্ড, গীতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ইত্যাদি পড়িতে দিতেন। কেবল ভাগবতের দশমস্কন্ধ (রাসলীলা) পড়িতে নিষেধ করিতেন।

দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। এক লাইন পড়া হইলেই তিনি তাহার নানা রূপ ব্যাখ্যা করিতেন। হয়ত আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। তখন দাদা বলিতেন, "তোমার কথা শুনিব, না, ভাগবতই শুনিব।" তিনি ভক্তি, মুক্তির ব্যাখ্যা করিতেন। দাদা বলিতেন, "খালি মুক্তি তোমার মুখেই শুনিলাম, আর কেহ তাহা বলেনা। আমি মুক্তি দিয়া কি করিব। আসিব, যাইব, খাইব, বেশ আনন্দ করিব। সময়ে দাদা রাগ করিয়া বলিতেন, "তোমার ভাগবত তুমিই শোন। তোমার শাস্ত্র তুমিই বুঝ। আমি শুনিতে চাইনা। তোমার ধর্ম্ম তুমিই কর।" বেশী রাগ হইলে বলিতেন "যাও, যাও, আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাইনা।" তাহাতেও তাঁহার রাগ নাই, বিরক্তি নাই। অমনি আবার দাদাকে বুঝাইতে যাইতেন, তামাক সাজিয়া দিতেন।

কোন সময় পিতার সঙ্গে বলিতে বলিতে বলিয়া ফেলিতেন, “হাড়মাংসের খাঁচায় আমি বদ্ধ নহি। আমি অনন্ত, পৃথিবী জোড়া।” কোন সময় বেশী উত্তেজিত হইলে, বলিতেন “অহং ব্রহ্ম।” পুরোহিত বাড়ীর অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী এক দিন ছিলেন, ভাগবত পড়া হইতেছিল। পিতা পুত্রে ঝগড়া। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন “অহং ব্রহ্ম, যার ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আগুনে জ্বালাইয়া দেখুন, জলে ডুবাইয়া দেখুন, কুঠার দিয়া কোপাইয়া দেখুন, আমি বিচলিত হই কি না।” কোন সময় বা বলিতেন, “আমি এই জগৎ জোড়া। আমি এই সামান্য দেহেতে আবদ্ধ নহি।” কোন সময় বা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিতেন “আমি সৃষ্টি করিতেছি; আমিই পালন করিতেছি।” দাদা কোন সময় বলিতেন, “বাপ বলিয়াও একটু মান না!” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “বাপ বলিয়া ছাপ দেওয়া কিছুই নাই। আমি জগতের বাপ ছিলাম, আবার আমিই সকলের ছেলেরূপে প্রকাশ পাইয়াছি। এই হাড় মাংসের খাঁচাই আমার সীমা নহে।”

ঠাকুর অনেক সময় পরমহংসদেবের নাম করিয়া বলিতেন, “শুনুন পরমহংস কি বলেন। কোন সময় বলিতেন, “শুনুন গীতায় কি বলেন।” কোন সময় বলিতেন, “শুনুন অবধূত কি বলেন।” কোন সময় বলিতেন, “শুনুন ভাগবত কি বলেন।” দাদার ভাগবত শুনিতে বসিয়া ছেলের নানারূপ কথা ভাল লাগিত না। তখন রাগিয়া বলিতেন, “যত শাস্ত্র

আর পরমহংস কেবল আমাদের জন্য ছিল।” যিনি বই পড়িতেন, তিনি পিতা পুত্রের ঝগড়ার সময় অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কোন সময় ঠাকুরের রাগ দেখিয়া দাদা বলিতেন, “মার্‌বে নাকি ?” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, “মারিলে কি করিবেন ?”

এক দিন দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “খাওয়া পরার যে চিন্তা কর না, খাইবে কি ?” এই বলিয়া ঠাকুরকে গালাগালি আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও পিতার উপর বিষম রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আমার আবার অভাব কি ? কত শত লোক আমাকে খাওয়াইতে মাথা কপাল কুটিতেছে, তাহা আপনি জানেন ?” দাদা বলিতেন, “আমি মরিয়া গেলে তোমাকে কে পুছিবে ?” শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আপনাকে কে চিনিবে ? আমার পূজা ঘরে ঘরে হইবে।” ঠাকুরদাদাকে বলিতেন, “চিন্তা ভাবনা ছাড়িয়া শিবস্বরূপ হইয়া যান।” দাদা বলিতেন, “চাইনা তোমার পাথর হইতে।” দাদার সঙ্গে ঝগড়ায় তিনি অনেক সময় বলিতেন, “আমাকে কলিকাতা বাগবাজারের বলরাম বসু কটকে যাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। ভোজেশ্বরের পালেরা বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ তাহাদের কুঞ্জে যাইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যেখানে ইচ্ছা যাইয়া থাকিতে বলেন। খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকিবে না, সব তাঁহারাই দিবেন।” কিন্তু তিনি তাহা থাকেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "আমার থাকার, খাবার অভাব কি? সাধ করিয়া মাথায় বোঝা নিয়াছি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে কাশীর বিশ্বেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। পাওহারীবাবার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ নানাকথা প্রসঙ্গে এক দিন ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "তোতাপুরী যে নির্ব্বিকল্প সমাধি চল্লিশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা পরমহংসদেব তিন দিনে উপলব্ধি করেন। আমার অনুভূতি তাঁহাদের চেয়েও শতগুণ বেশী।" এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে কোটীগুণ রমণসুখ প্রতিলোমের গোড়ায় গোড়ায়। কোটীগুণ বলিয়া তখনই বলিয়াছিলেন, তার চেয়েও বেশী। এইসব বলিতে বলিতে একেবারে ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন। এ ঘটনার সময় নটবর বাবু সম্মুখে ছিলেন।

ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হইলে দাদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক সাজিয়া নিয়া হুকা তাঁহার সম্মুখে ধরিতেন। দাদা রাগ করিয়া বলিতেন "আমি তামাক খাইবনা। তোমার তামাক তুমিই খাও।" তিনি অনেক সাধিতেন, পরে তামাক খাইতেন।

এক দিন পূর্ব্বঘরে ঠাকুর এক সাপ দেখেন। সাপ কোথায় গেল, ঠিক করা গেল না। বর্ষাকাল, বাড়ীতে জল। ঠাকুরদাদাকে ধরিয়া রান্নাঘরে শোবার জন্য নিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা রন্ধন ঘরে শুইতেন। তাঁহারা যাইয়া পূর্ব্বের ঘরে শুইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই বাড়ীর পূর্ব্বদিকের গড় হইতে ঘরের ভিটী বান্ধার জন্য কাশীকান্ত গাঙ্গুলী মাটী উঠান। দাদা মোকদ্দমা করিতে ও শালিশ আনিতে উদ্যত। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুই করিতে দিলেন না, বলিতে লাগিলেন, "মাটী, মাটীর জায়গায়ই থাকিবে, ইহা কেহ নিতে পারে না। আপনার বাপদাদা ছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? আপনিই বা কোথায় থাকিবেন? কিন্তু মাটীর জায়গায় মাটীই থাকিবে।" এই সব বলিয়া দাদাকে ক্ষান্ত করিলেন, কিন্তু তিনি মনে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। গাঙ্গুলীরা ফাল্গুন মাসে ঘরে যান, চৈত্র মাসে ঐ ঘর পোড়া যায়।

বাড়ীর উত্তর সীমানা নিয়া অভয় চাটুর্য্যের সঙ্গে দাদার বাদানুবাদ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাকে পুনঃ পুনঃ যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "নিতে দিন, এখন আর আপনি বিষয় দিয়া কি করিবেন?" দাদা শুনিলেন না, গেলেন। ঠাকুরও গেলেন। পদ্মযুগী চাটুর্য্যের বাড়ীতেই এক কোণে থাকিত। বোধ হয় সে দাদাকে কিছু বলিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বাড়ীতে যাইয়া, তাহার তাঁত ছিড়িয়া ফেলেন। লেংটা হইয়া রাগে অধীর হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া বলেন, "আগে আমার গলা কাট, পরে বাপমশয়র সঙ্গে ঝগড়া কর।" সে অপ্রস্তুত।

ঠাকুরের বিবাহের পূর্ব্বে এক দিন এক চোর নারিকেল গাছে উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর টের পাইয়া গাছের গোড়ায়

দাড়াইলেন। যখন দেখিলেন চেনা লোক, তখন পথ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।

একবার ৺দুর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সোনাকান্দার হাটে গিয়াছিলেন। পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া এক জায়গায় সব জমা করিতেছিলেন। তিনি অনতিদূর হইতে দেখিলেন একজন লোক ঐ সকল জিনিষ হইতে দুই ছড়া কলা নিয়া যাইতেছে। তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না। কতক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন, ঐ ছড়া দুইটী পুনরায় রাখিয়া গিয়াছে। তিনি বাড়ী আসিয়া এই বিষয়টী সকলের নিকট বলিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলা নিয়া যাইতেছে দেখিলেন তবুও কিছুই বলিলেন না কেন ?" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিলেন, "চোর চুরি করিয়া নিতেছিল ; কি বলিব।"

এক দিন এক মুসলমান বাড়ীর নিকট দিয়া দুধ নিয়া যাইতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর দুই আনা মূল্যে এক সের দুধ কিনিলেন। ভাঙ্গা পয়সা ছিলনা, তিনি টাকা দেন। সে বলিয়া গিয়াছিল, বাজার হইতে যাইবার সময় বাকি পয়সা দিয়া যাইবে। কিন্তু সে আর সে পয়সা ফিরাইয়া দেয় নাই। ইচ্ছা করিলে তাহার বাড়ী যাইয়া পয়সা আনিতে পারিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা আর মুখেও আনেন নাই।

একটা আমগাছের তক্তা পাশে প্রায় এক হাত, লম্বা পাঁচ হাত, পূর্ব্বের ঘরের পিছনে ছিল। তাহা চুরি যায়। মা অনুমান করিলেন, জগৎ দে নিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট

যেইমাত্র বলা, তিনি অমনি ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া জগৎ দেকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। অভিপ্রায়, বলিয়া দিবেন, মা তাকে চোর বলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "তুমি না দেখিয়া তার নাম কেন বলিলে?" মা ঠাকুরের পা ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন,— আর বলিবেন না। তিনি ক্ষান্ত হইলেন। কয়েক দিন পরে সেই জগৎ দে ঐ কাঠ দিয়া জলচৌকি তৈয়ার করে। মা দেখিয়া ঠাকুরকে বলেন, "যান দেখিয়া আসুন, কড়াতের তেরছাকাটা দাগও আছে।" শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়া আসিয়া একেবারে চুপ। আর একটি কথাও নাই।

শ্রীশ্রীমা'র বিবাহের পূর্ব্বে জগৎ দের ভাই নবীন দে অন্ধকার রাত্রিতে একবার ঘরের সিড়ির নিকট ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের বাহির হইতেই সে দৌড় দেয়, তিনিও পিছনে পিছনে দৌড়ান। সে বাড়ীর মধ্যে অনেক পাক দেয়, পরে উত্তর দিকে দৌড়াইয়া যাইতে হোচট খাইয়া পড়িয়া যায়, তিনি অমনি তাহার পিঠের উপর চড়িয়া 'চোর' বলিয়া খুব মারিতে আরম্ভ করেন। যখন মা'র আর সহ্য হয় না তখন সে বলিয়া উঠিল, "আমি নবীন।" অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়িয়া দিলেন।

জগবন্ধু কুরির মুদি দোকান দিগ্‌বাবুর বাজারে ছিল। তথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর বরাবর বাকীতে জিনিষপত্র আনিতেন, ৺দুর্গাপূজার সময় তাহা শোধ করিতেন, আবার ৺দুর্গাপূজার জিনিষপত্র বাকীতে আনিতেন। একবার অধিবাসের দিন সমস্ত জিনিষপত্র মাপাইয়া লইয়াছেন, ও সাবেক বাকী দিয়াছেন,

এমন সময় জগবন্ধু বলিল, "এসব জিনিষেরও মূল্য দিন, নতুবা দিব না।" তিনিত অপ্রস্তুত তখন টাকা কোথায় পান? পরদিনই পূজা। তিনি বাড়ী আসিয়া যোগাড় যন্ত্র করিয়া টাকা নিয়া কৈলাস দাস সহ পুনরায় গেলেন। কৈলাস দাস মহাশয় কিছুতেই ঐ দোকান হইতে জিনিষ আনিতে দিবেন না, শ্রীশ্রীঠাকুরও ঐ দোকান হইতেই জিনিষ আনিবেন। পরে ঐ দোকান হইতেই নগদ টাকা দিয়া জিনিষ আনিলেন। পূর্ব্বে একবার ঐ দোকানদার ৪০৲ টাকা পাইয়া ওয়াশীল না দিয়া, পুনরায় সেই টাকা দাবী করে, কিন্তু তাহার ভাই বেঙ্গা কুরী সাক্ষ্য দেয় যে, টাকা দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই টাকা লইতে পারে নাই।

আনন্দ গোপ বাড়ীর গোয়ালা। একবার ৺দুর্গাপূজার সময় সাবেক বাকী সমস্ত নিয়া প্রতিশ্রুত হয় যে, ৺দুর্গাপূজার সব মাল বাকী দিবে, কিন্তু পূজার সময় বলে যে, পূজার মালের টাকাও অগ্রিম না দিলে মাল দিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে অনেক তোষামোদ করিলেন, সে শুনিল না। তিনি আবার তাহাকেই যাইয়া টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে মাল লইলেন।

৺দুর্গাপূজার সময় এক নমঃশূদ্র বাজারে দুই সাজি জল পদ্ম আনিয়াছিল। ঠাকুর তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "দুই সাজির মূল্য এক টাকা।" শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি টাকাটি দিলেন। কোন আপত্তি না করিয়া টাকা দিতে দেখিয়া সে

বলিল, "আমি এক সাজির মূল্য এক টাকা চাহিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "আমি দুই সাজির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম," এই কথাতেই বাজারের অন্যান্য লোক তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "জানিস্ কার সঙ্গে এরূপ করিস্ ?" কেহবা তাহাকে মারিতে গেল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তবে ঐ সাজির মূল্যও নেন।" সে আর নিলনা। তিনিও ভিন্ন মূল্য না দিয়া ফুল আনিতে অনিচ্ছুক। পরে সকলের অনুরোধে আনিলেন।

যাহারা না চিনিত, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বাজারে বেশী মূল্য চাহিত। যে যাহা চাহিত, তাহাই দিয়া দিতেন। অন্য লোক যদি দেখিতে পাইয়া বলিত, "কেন বেশী মূল্য নিলি ?" সে ঠাকুরকে বেশী মূল্য ফিরাইতে চাহিলে তিনি তাহা নিতেন না। বলিতেন "আপনারাত মিথ্যা বলেন না। যে মূল্য বলিয়াছেন তাহাই ঠিক মূল্য।"

শ্রীশ্রীঠাকুর যতদূর সম্ভব বাজারের জিনিষপত্র নিজেই আনিতেন। কোন ব্যাপার উপলক্ষে যদি মুটিয়া দিয়া অন্য কেহ জিনিষ আনিত তাহাকে আসা মাত্রই তামাক সাজিয়া দিতেন। বলিতেন, "আপনার বড় পরিশ্রম হইয়াছে, বসুন, তামাক খান।" দুই তিন ছিলুম তামাক খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাকে ছাড়িতেন। যাওয়া কালীন মজুরী ডবল দিয়া দিতেন। নিজে কখনও মজুর দিয়া জিনিষপত্র আনান নাই। বর্ষাকালে যখন নৌকায় বাজারে যাইতেন, অধিকাংশ দিনই

তিনি চাকর থাকিলেও বসাইয়া রাখিয়া নিজেই নৌকা বাহিয়া গিয়াছেন ও আসিয়াছেন। নৌকায় উঠিলে কখনও বা কেহ তাঁহাকে কিছুতেই নৌকা বাহিতে দিত না। তখন তিনি নৌকা হইতে নামিয়া যাইতে চাহিতেন; যদি তাহাও না পারিতেন তবে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও নৌকার পাটাতন কিম্বা অন্য কিছু দ্বারা জল টানিয়া নৌকা বহিতে থাকিতেন। কাহারও কোন আপত্তি শুনিতেন না।

ঘরামি কামলা চালে কাজ করিতে উঠিয়াছে। একটুকু রৌদ্র হইলেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,"আসেন, আসেন বড় রৌদ্র, বিশ্রাম করিয়া যান।" তাহারা বলিত, "এই মাত্র উঠিলাম, একটু পরে নামিব।" তিনি তামাক নিজে সাজিয়া ডাকিয়া নামাইতেন। ঘাম দেখিলে বলিতেন, "আপনাদের বড় পরিশ্রম হইয়াছে। নিন, তামাক খান।" ঘরামিরা তামাক খাইয়া আবার কাজে চলিলে তিনি আর এক ছিলুম সাজিয়া বলিতেন, "আর একটুকু বসেন, আর এক ছিলুম তামাক খান।" ঘরামিরা এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। সকলেই দেশী লোক তাহারা যতটুক সময় কাজ করিত, ভাল করিয়াই করিত। দাদা টের না পান ও মা না জানেন এইভাবে এক দিন কাজ করিলে দুই দিনের পয়সা দিয়া দিতেন। কেহ নিতে চাহিত না কেহ বা চুপে চুপে লইয়া যাইত।

মা'র ভগ্নীর কন্যা যখন নাবালিকা, তখন মা তাহাকে তুই, মুই সম্বোধন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন রাগ করিয়া

বলিলেন, "তুমি উহাকে এইরূপ তুই মুই বল কেন ?" মা বলিলেন, "ছোট বোনের মেয়ে, শিশু তাহাকে কি বলিব ?" তিনি বলিলেন, "তুই, মুই দ্বারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বুঝায়, অহঙ্কার প্রকাশ পায়, এরূপ বলিতে নাই। তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবে।" সকলে শুনিয়া অবাক্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের মনের ভাব জানিতে পারিতেন, কাহারও কোন প্রশ্ন করিতে হইত না। কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি আপনা হইতেই কথোপকথন দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। কেহ দেওভোগ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেন আজ অমুক লোক আসিতেছে বাজারে যাইতে হইবে এবং যাহার নাম বলিতেন সেই আসিয়া উপস্থিত হইত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কলিকাতা যাইতে, ষ্টীমারে নাকে মুখে কাপড় দিয়া শুইয়াছেন। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন একটি লোক জুতা মোজা পায়ে আসিয়া তাঁহাকে পাড়া দিবে, দেখিতে না দেখিতেই একটি লোক আসিয়া ঠিক তাই করিল। একটুকু সরিলেই পাড়া লাগিত না, তখন ঠাকুর বলিয়াছেন "প্রাক্তনের ভোগ দেখিলেও ছাড়ান যায় না।"

নিজের জীবনের কথাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "জানে যে ষ্টেশনে গেলে গাড়ী পাইবে না, তথাপি প্রাক্তন কর্ম্মভোগের জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিতে হইবে। না যাইয়া থাকিতে পারিবে না।"

লাঙ্গলবন্ধের অষ্টমী স্নানে গ্রামের বারৈপাড়ার লোকেরা ঠাকুরের নিকট হইতে চাহিয়া খোল নেয়। কীর্ত্তনে সেই খোল ভাঙ্গিয়া যায়। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সকলেই ঠাকুরের নিকট আসিতে ভয় পায়। নূতন খোলও আনিতে পারে না, পাছে ঠাকুর কি বলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, দুইজনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবে, পরে যাহা হয় করিবে। তাহাদিগকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি, জিনিষ থাকিলেই ভাঙ্গা যায়, এটা আমার বাড়ীতেও ভাঙ্গা যাইতে পারিত। আপনারা এজন্য কোন চিন্তা করিবেন না; খোল আমাকে দিতে হইবে না, আপনারা স্বচ্ছন্দ মনে চলিয়া যান।" ঠাকুরের দেওয়া তামাক খাইয়া তাহারা বাড়ী চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ঠাকুর কিভাবে খোলের খবর জানিলেন।

শরৎ বাবু এক দিন বর্ষাকালের রাত্রে দেওভোগ আসিতেছিলেন। তখন খুব বৃষ্টি, রাত্রি অন্ধকার। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ী হইয়া ঠাকুর-বাড়ী আসিবার পথ। তখন কোন নৌকা না পাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিতে দিতে ঠাকুর বাড়ীর উত্তর দিকে চৌধুরীদের বাগানে পৌঁছিলেন এবং দেখিলেন

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার জন্য পথে অগ্রসর হইয়া আছেন, আর বলিতেছেন, "হায় হায় কি করেছেন! কি করেছেন!! কত দুরন্ত সাপ এসময় মাঠে ভেসে বেড়ায়। এমন বর্ষার দুর্য্যোগে এমন সময় কি আস্‌তে আছে?" শরৎবাবু নিরুত্তর, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৃহে পৌঁছছিতেই মা শুষ্ক কাপড় পরিতে দিলেন, আর তাঁহাকে সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পাক করার জন্য শুষ্ক কাঠ না থাকায় নিতান্ত নিষেধ সত্বেও, ঠাকুর ঘরের খুঁটী কাটিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "যাহারা আমার জন্য এরূপ বৃষ্টিতে ও সাপের মুখে সাঁতার কাটিয়া প্রাণ দিতে পারে, তাহাদের জন্য কি একটী ঘরের মায়াও পরিত্যাগ করিতে পারিব না? প্রাণ দিয়াও ইহাদের উপকার করিতে পারিলে আমার দেহ সার্থক হয়।"

শরৎ বাবু যখন কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়িতে ছিলেন, তখন এক দিন একথা ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, এমন মহাপুরুষের (শ্রীশ্রীঠাকুরের) দর্শন লাভ করিয়াও তাঁহাকে হারাইলাম, তাঁহার সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে না। এজীবনের আর প্রয়োজন কি? ইহা ভাবিতে ভাবিতে জীবন বিসর্জ্জন দিবার দুঃসঙ্কল্প করিয়া যেমন ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতে যাইতেছিলেন, অমনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "আগামী কল্য প্রাতে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইবে।" ইহা শুনিয়াই তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং বিছানায়

যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। পর দিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই শোনেন, "ঠাকুর তাঁহার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। সে নিকটে যাওয়া মাত্র বলিতে লাগিলেন "আপনি কি করিতেছিলেন ভাবিয়া ভাবিয়া, আমাকে কলিকাতা আসিতে হইল। ভয় কি, ভাবনাই বা কিসের? আত্মনাশ মহাপাপ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রজসুন্দর গোস্বামী যখন ঠাকুর বাড়ীর লাগ উত্তরে চৌধুরীবাড়ী দখল করিতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক বাড়ুয্যে ছিলেন। মহেন্দ্র চাটুর্য্যের স্ত্রী ও ভগিনী খালি বাড়ীতে ছিলেন। ব্রজসুন্দর এক দিন ঐ খালি বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করিয়া সর্দ্দার দিয়া দখল করিতে উদ্যত। শ্রীশ্রীঠাকুর যাইয়া বলিলেন, "আগে আমার গলায় কোপ দেন, পরে স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করুন।" এই বলিয়া ঘরের দরজায় দাড়াইলেন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। সেই দিন ঘর দখল করিতে পারিলে, তাঁহারাই বাড়ীর মালিক হইতেন। পরে মহেন্দ্ররাও সরদার রাখেন। মোকদ্দমা হয়। ব্রজসুন্দরের সঙ্গীয় বাড়ুয্যে এই ব্যাপার নিয়া তর্ক করে। তখন তিনি তাহাকে গালাগালি

করেন। ঐ ব্রাহ্মণ বলে, তুমি ব্রাহ্মণ মান না? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "যাহারা এইরূপ বলে, ও করে, তাহারা ব্রাহ্মণ নয়; চণ্ডাল। তাহাদিগকে কাটিলেও কিছু হয় না।"

মহেন্দ্র চাটুর্য্যের স্ত্রীর প্রথম সন্তান প্রসব সময় তাহাদের বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক কেহই ছিলনা। প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমা সংবাদ পাইয়া ঘরে গেলেন। ছেলে হইল। আতুর ঘরে যাওয়ার দরুণ শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র হাতে তিন দিন খাইলেন না।

পূর্ণ দাস ঠাকুরের ভায়রা—জ্যেষ্ঠতাত শ্বশুরের কন্যার জামাতা। তিনি নারায়ণগঞ্জে উকিল ছিলেন। তিনি কৈলাস দাস মহাশয়ের সঙ্গে এক মামলায় মা'র মা ও ঠাকুরের পিতাকে মিথ্যা আসামী করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বাসায় যাইয়া এই মিথ্যা ব্যাপারের জন্য এত রাগ করিয়াছিলেন যে, কাপড় ছাড়িয়া পূর্ণ দাসকে লেংটা হইয়া দেখাইলেন। মেয়েছেলেরা ঘরে দরজা দিয়াছিল।

এক দিন ভীষণ এক খোদাই ষাঁড় বাড়ীর উঠানে আসিয়াছিল। কালীকুমার ভৌমিক প্রভৃতি ভয়ে ঘরে ঢুকিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষাঁড়টা নিকটে আসিয়া শিং একটু নাড়িল, আর কিছুই করিল না। তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া হাসিতে লাগিলেন। এমন যে ভীষণ ষাঁড় সেও কিছুই করিল না।

নীলকমল মণ্ডলের খুব বড় একটি ষাঁড়, লোক দেখিলেই মারিতে আসিত, সেই ষাঁড় বাড়ীর দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মারিতে আসে। তখন তিনি উহার শিং ধরিয়া উহাকে মাটীর সঙ্গে চাপিয়া অনেকক্ষণ রাখেন। পরে উহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে দূর করিয়া ধাক্কা দিয়া চলিয়া আসেন। সেই ষাঁড় এমন দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সকলেই তাহাকে ভয় করিত। এই ঘটনাটি তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে ঘটে।

নটবর বাবুদের নূতন বাড়ীর উত্তরদিক দিয়া একটি গোহালট ছিল। সেই হালট দিয়া নানাজাতীয় লোকজনও চলিত। ঐ হালট বাড়ীর পিছন হইবে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থাকিয়া তথায় বেড়া দেওয়াইয়াছিলেন। যখন সকল মুসলমান জোর করিয়া বেড়া ভাঙ্গিতে একত্র হইল, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আগে আমার গলায় কোপ দেও, পরে বেড়া কাট।" সকলে অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

এক দিন প্রাতে তিন চারি জন পাটের আফিসের সাহেব কয়েকজন কুলি সঙ্গে নিয়া শিকার করিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বন্দুকের শব্দ হইল; শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী ছিলেন। অমনি তিনি একাকী দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া জগবন্ধু ভৌমিক মহাশয়ও পিছনে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে এক ছাড়াবাড়ীতে শিকার অনুসন্ধান করিতে দেখেন। তিনি তাহাদিগকে ওখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন; এবং আর একটীও বন্দুক ছুড়িতে নিষেধ করিলেন।

তাহারা বলিল, "এ তোমার জায়গা নয়।"* ঠাকুর বলিলেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। সব জায়গাই আমার।" ইহা বলিয়াই হাত হইতে বন্দুক টানিয়া লইলেন। এবং বলিলেন "বন্দুক তোমাদের মার্গে ভরিয়া দিব।" এই বলিয়া বন্দুক লইয়া চলিলেন। হাত অবশ হইয়া গেল, বাঁকিয়া উঠিল। বন্দুক ফেলিয়া দিলেন। যেন সেই কৃশ ক্ষীণ শরীরে অযুত হস্তীর বল হইল। তাহারা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। পরে একটী শব্দও না করিয়া বন্দুক লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। এদিকে বন্দুক ধরায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত কেমন অবশ বাঁকা হইয়া যাইতে লাগিল। জীবহত্যার অস্ত্র ধরিয়াছেন, তাই হাত ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। জগবন্ধু ভৌমিক ইহা দেখিয়া গগন দত্তের পুকুর হইতে গণ্ডুষে জল আনিতে গেলেন। তিনি ইতিমধ্যে হাত ধুইয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। সে অবধি আর তাহারা এদিকে কখনও শিকার করিতে আসে নাই।

তিনি কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিন্দা শুনিলে একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেন, সিংহ মূর্ত্তিতে তাহাকে আক্রমণ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ কোন মহাপুরুষের নিন্দা করিতে পারিত না।

শরৎবাবু বলেন, তিনি এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নৌকায় বেলুর মঠে যাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া একজন আরোহী মঠের নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতে আমোদ বোধ করিয়া আরও দুই তিনজন

উৎসাহে তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রথম নিন্দুকের মুখের সম্মুখে আনিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা জান কেবল যোগাযোগ আর রূপার চাকৃতি! তোমরা মঠের কি জান? ধিক্ ঐ জিহ্বাতে যাতে সাধু নিন্দা কর্লেন!" নিন্দুক তাঁহার উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া মাঝিকে বলিতে লাগিলেন, "শীঘ্র নৌকা ভিড়ো, নৌকা ভিড়ো, আমি এখানেই নেবে যাবো।" ইহা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, "স্থান বিশেষে তাঁহার ন্যায় সিংহ হওয়াই দরকার।" পরে বলিলেন, "একি নকলরে, এযে আসল সোণা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র নিকট শুনিতে পাইলেন, কালীকুমার ভৌমিকের গুরু আসিয়াছেন। কালীকুমার ঠাকুরের শ্বশুর বংশীয় এবং সেই শ্বশুর বাড়ীতেই তখন থাকিতেন। গুরু সাধক ছিলেন ইহা শুনিয়া তিনি দেখিতে গেলেন। এক গুহ মহাশয় ঐ বাড়ীতে তাস খেলিতেছিল। কথায় কথায় সে পরমহংসদেবকে মন্দ বলে। ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর রাগান্বিত হইয়া তাহাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন,সেও নিন্দার মাত্রা বাড়াইল। অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর তার পায়ের জুতা দিয়া তাহাকে কয়েক ঘা বাড়ি দিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "সেও একটা কিঁছু করিতে পারিত, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না!" সে বাড়ী যাইয়া তাহার প্রজা, লোকজন, লাঠি ছোড়া ইত্যাদি লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মারিতে আসিল। ইহা শুনিয়াই তিনি

তাঁহার শ্যালীকে বলিলেন, "একটা দা দেও, উহাদের সমস্ত মুণ্ডপাত করিব।" শ্যালী পায়ে ধরিয়া পড়িল, শাশুড়ী পিছনে ধরিয়া টানিলেন। তিনি বলিলেন, "স্ত্রীলোক ভগবতী, যখন পায়ে ধরিয়া পড়িলেন, তখন থাক, দরকার নাই।" এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং বলিলেন, "দা দিলে দেখিতে কত মুণ্ড নিয়া আসিতাম।" তাহারা আর বাড়ীতে প্রবেশ করিল না, ফিরিয়া আসিল। তিনি এত লোক দেখিয়া বিন্দুমাত্রও ভয় না পাইয়া বাড়ীর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাহার খুড়তুত ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসা যাওয়া করিত। সে বলিল, "তাহার ছোট ভাই আপনাকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আপনি কলিকাতা চলিয়া যান।" তিনি বলিলেন, "আমি কেন যাইব? আমি কি উহাদের ভয়ে কলিকাতা যাইব?"

সেই গুহের চক্রান্তে এক দিন শিবু শীল, গৌরনিতাই বৈরাগী, ও একজন বৃদ্ধ মুসলমান—যে মুসলমান তাহার বাড়ী পারাইতে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে লইয়া যাইত—আসিয়া শ্রীশ্রী-ঠাকুরকে বলিল, "আমাদের বাড়ী চলুন।" এই কথা বলা মাত্রই মা বলিলেন, "যাইয়া দরকার নাই।" তিনিও যাইতে স্বীকার করিলেন না। তখন তাহারা বলিল, "চলুন মাঠ থেকে বেড়াইয়া আসি।" তিনি সাথেই চলিলেন। চাঠাতিদের বাড়ীর নিকট গেলে মা দৌড়িয়া যাইয়া চাঠাতির মা'কে বলিলেন, "আমার কথাত শুনিলেন না, দেখুন, গেলে উহারা মারিবে।" তখন

চাঠাতির মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এসময় কিসের যাওয়া, এখন যাইওনা, ফিরিয়া যাও।" মা যখন নিষেধ করিতেছিলেন, তখন শিবু শীল বলিয়াছিল, "ওর কথা শুন কেন? ও ছেলে মানুষ।" তিনি চলিয়া আসিলেন। উহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। পরে দেখা গেল চাঠাতিদের বাড়ীর নামায় আরও লোক ছিল। দুরভিসন্ধি লইয়াই উহারা আসিয়াছিল। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আমিত জানিই, দেখি ওরা কি করে।"

কৈলাস দাস মহাশয়ের চাকর জগার স্ত্রীকে তাঁহার নৌকায় কোথাও ভাগাইয়া নিয়া চারি পাঁচ দিন রাখে। দাস মহাশয় অত্যন্ত রাগারাগী করিবেন, এই ভয়ে ঐ চাকর শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসে, যেন তাহাকে কৈলাস দাস কিছু না বলেন। কৈলাস দাস ঠাকুর বাড়ীতেই ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে দেখিয়াই রাগিয়া বলিলেন, "বামনকে বলি দাও। বদমাইসের সহায়তা করিতে বদমাইস আসিয়াছে।" নৌকা ধোয়াইয়া লইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ একেবারে অপদস্ত, চুপ। সে নৌকা ধুইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিক্রমপুর রাজানগরে এক সাধু প্রকাশ হয়। দেশশুদ্ধ লোক তাহার ওখানে যাইতে থাকে। সে একজন বড় রকমের ভণ্ড, বহু স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। সে ঠাকুরবাড়ী আসিয়াছিল। চলিয়া গেলে, ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, উহাকে কাটিয়া ফেলিলেও কোন অপরাধ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েলোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন; তাহাদের বাহিরে কোন ধর্ম্ম নাই। বাহিরে গেলেই ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মে পড়ে। স্বামী ভক্তিই একমাত্র ধর্ম্ম। স্বামী স্ত্রী একত্র দেখিলেই তিনি বলিতেন, "আপনারা লক্ষ্মী গোবিন্দের মত থাকিবেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে আসিলে তাঁহাকে দেখিতে বহু লোক দলে দলে আসিত। তাহাদের সকলকেই খাইতে ও থাকিতে জায়গা দিতেন, এবং অতি আদর যত্ন করিতেন। এখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একবিন্দু নড়চড় হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণকে পাক করিয়া খাইতে হইত। অন্যান্য সব সরকারী পাকে খাইত। বৈরাগী বৈষ্ণব যত নিজেই পাক করিয়া খাইত। দিনরাত্রি ভেদাভেদ ছিল না, যখনই আসিতেন, অতি আদরে অতিথি সৎকার করাইতেন।

অতিথি আসিলে জ্বালানি কাঠের অভাব থাকিলে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন সময় অন্যান্য জায়গা হইতে সংগ্রহ করিতেন, কখনও বা চালের রুয়া অথবা ঘড়ের খুটি খুলিয়া দিতেন। এইরূপ নিজেদের পাকের জন্যও করিতেন। দাদা বলিতেন, "ঘর ত আর তুলিতে পারিবে না, ভাঙ্গিয়া খাইতেছ।" তিনি বলিতেন, "পাঁচিশ হাজার টাকা হইলেই দালান হয়।"

একবার বাড়ীতে চারি পাঁচ জন অতিথি আসিয়াছেন। ঘরে চাউল নাই। অতিথিদিগকে যথারীতি সম্মান করিয়া বসিতে দিয়া ঠাকুর বাজারে গেলেন। চাউলের দোকানে বাকী আনার সম্ভবপর ছিল না। অতিথি খাওয়াইতেই হইবে। কাপড়ের দোকান হইতে বাকী আনিতে পারিতেন। তিনি কাপড়ের দোকানে যাইয়া এক জোড়া কাপড় বাকী লইলেন। তাহা অন্য লোকের নিকট বিক্রি করিয়া চাউল ডা'ল আনিয়া অতিথি সৎকার করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন কোন ভিক্ষুক ফকিরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেন। এক দিন এক মুসলমান অতিথি ঘরের পাকেই খাইল, কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুতেই শকরা নিতে দিলেন না, মা শকরা নিলেন। গণক, সাহা ও অন্যান্য জাত অতিথি থাকিলেও মাই শকরা নিতেন। তিনি কাহাকেও খাওয়াইয়া শকরা নিতে দিতেন না।

হয়ত একদিনই একজন ব্রাহ্মণ, একজন গণক, একজন কায়স্থ ও একজন বৈরাগী আসিয়াছেন। ঘরের অভাব থাকায় এক এক বাড়ী এক এক জনকে পাক করিতে দিতে হইয়াছে, নিজেদের পাকত আছেই। মা একাই সব করিয়াছেন, কাহারও কোন সময় কোন ত্রুটী হয় নাই।

অতিথিদের আহারের সময় ঠাকুর দাঁড়াইয়া থাকিতেন। মা নিকটে থাকিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। এখানে আসিয়া কেহ কখনও মনে করিতে পারিত না যে পরের বাড়ী

আসিয়াছে। সকলেরই মনে হইত যেন আপন পিতা মাতার নিকট আসিয়াছে।

একবার একজন বৈরাগী ও বৈষ্ণবী রাত্রিতে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে প্রথমে ভিন্ন ঘরে শুইতে দিলেন। বৈরাগী বৈষ্ণবীকে শিষ্যা বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে পরে একত্রই থাকে। পর দিন আলাপে জানা যায় সে শিষ্যা নহে। তখন নানা কথায় সকলে তাহার উপর উৎপাত করিতে থাকিলে সে চলিয়া যায়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন যে আর বৈরাগী বৈষ্ণবী আসিলে জায়গা দিবেন না।

একবার তুইজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অতিথি আসেন। তাঁহারা খাবার বড় ফৰ্দ্দ দেন; আটা, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তাহা নয়; আমার যাহা আছে তাহাই দিব।" তিনি বলিতেন "গৃহস্থের যাহা আছে, তাহা দিলেই হইল। যদি চাউলও না থাকে তবে এক গণ্ডূষ জল দিলেই অতিথি সৎকার হয়। অতিথির ইচ্ছামত না দিলে দোষ নাই।"

একবার শীতকালে রাত্রিতে প্রায় দশটার সময় আট দশজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। মা খবর রাখেন না। তিনি পেটের বেদনায় পশ্চিমের ঘরে শুইয়া কোকাইতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিলেন, "কয়েকজন অতিথি আসিয়াছে।" মা বলিলেন, "পেটের ব্যথায় উঠিতে পারি না, এখন কি করি?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "আমি অতিথিদিগকে যাইয়া বলি যে, সে পেটের ব্যথা বলিয়া উঠিবে না।" মা

বলিলেন, “একটু দেরী করিয়া উঠি।” তিনি যখন ঐ কথা বলিতেই যান, মা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেক তোষামোদ করিয়া বলিলেন, “এরূপ বলিবেন না, আমি উঠি।” মা উঠিলেন, উঠিয়া পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। শীতকাল, এত লোকজনের বিছানার অভাব; কাজেই শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলেন। গায়ের কাপড়, লেপ, বিছানা ইত্যাদি যাহা ছিল, সব অতিথিদিগকে দেওয়া হইল। বেশী লোক হইলে অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা'কে এরূপ করিতে হইত। দাদার কোন অসুবিধা করা হইত না।

এক দিন অতিথি খাওয়াইতে রাত্রি প্রায় ভোর। তখন মা খাইতে বসিয়াছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “খাওয়া দাওয়া রাখিয়া যাইয়া একটু শোও।”

একবার বরিশাল হইতে পাঁচ ছয়জন লোক আসে। রাত্রিতে দক্ষিণের ঘরে দাদা ও তাঁহার মেয়ে, ছেলেপেলে থাকিতেন। পূর্ব্বের ভিটী খালি। সবে পশ্চিমের ঘর উঠিয়াছে। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা থাকিতেন। সেদিন বৃষ্টি ছিল। তিনি অতিথিদিগকে পশ্চিমের ঘরে জায়গা দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা পূর্ব্বের খালি ভিটীতে হোগলা মাথায় দিয়া সারা রাত্রি কাটাইলেন।

চৈত্রমাসে এক দিন বিনোদ গোস্বামী আসিয়াছিলেন। তিনি সকালেই পাক করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবেন, পরে ঐ চুলায় আবার অন্য অতিথির পাক হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এক

বোঝা বাজারের জিনিষপত্র নিয়া আসিয়াছেন, ঘামাইয়া অস্থির। তখন মা সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "ব্যথা বেদনা কিছুই নাই। যদি সন্ন্যাসী হইয়া খাইতেন, তবুও ভাল ছিল। এই অবস্থা আর দেখা যায় না।" মা'র কান্না দেখিয়া বিনোদও কাঁদিলেন। সেঅবধি আসিয়া তিনি আর খাইতেন না। পরে এক দিন আসিয়া দুধ, মুড়ি খাইয়া যাওয়ার সময় ভয়ানক আছাড় খা'ন। তিনি যাওয়ার সময় ঠাকুরবাড়ী পিছন করিয়া যাইতেন না, পিছনের দিকে হাটিতেন।

একবার অগ্রহায়ণ মাসে সতর আঠারজন অতিথি আসিয়াছিলেন। সে সময় দাদা পরলোক গমন করিয়াছেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ রোগ শয্যায়, উঠিতে পারেন না। মা কি করিয়া ইহাদের নিকট যান? শ্রীশ্রীঠাকুর অতি কষ্টে নিজেই বিছানা পাটি দিলেন। তাঁহারা পাক করিয়া খাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন ঠাকুরকে পাকের ঘরে মনসা পূজার দুগ্ধ কলা খাইতে মা সাধেন, ঠাকুর খাইবেন না। খাওয়াদাওয়া নিয়া নানারূপ কথা হইতেছিল। মা বলিলেন, "খাইতে দোষ কি? বিবেকানন্দ স্বামী যে সন্ন্যাসী তিনিও ত খান।" ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "খাওয়া

থাকিলেই আর কাঞ্চন ছাড়া হয় না”, এবং অত্যন্ত রাগিয়া মা'কে ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া নিয়া চলিলেন, মা'কে জলে ডুবাইয়া মারিবেন। জিয়ার জাঙ্গালে দিয়া খাওয়াইবেন। বাড়ীতে তখন কেহ ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ অতিথি ছিলেন, তাঁহাকে মা ডাকিলেন। তিনিও আসিলেন না। মা কাঁদিতে লাগিলেন। যখন মা দেখেন, আর অব্যাহতি নাই, তখন চীৎকার দিলেন। চীৎকার শুনিয়া পুরোহিত পুত্র অশ্বিনী তাঁহার বাড়ী হইতে আসিলেন। আসিয়া আর কিছুই দেখেন না। দেখেন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দিতেছেন। এসব ব্যাপার কিছুই টের পাইলেন না। ঠাকুরের যখন রাগ উঠিত, তখন কি করিতেন, কিছুই ঠিক থাকিত না। দাদার মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা।

মা ও ননদিনী সারদাদেবী চৌধুরীবাড়ীর রামলক্ষ্মী দেব্যাকে পলসাই বাড়ী নামাইয়া দিয়া মা'র বাপের বাড়ী নৌকাযোগে গেলেন। আসিতে রাত্রি হওয়ায় মা ভাবিলেন, এতক্ষণ হয়ত রামলক্ষ্মী চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার খোঁজ না করিয়া মা বরাবর বাড়ী চলিয়া আসিলেন। আসিয়া ননদিনীকে বলিলেন, “শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, রামলক্ষ্মী দেব্যা আসিয়াছেন কিনা?” রামলক্ষ্মী দেব্যা তখনও আসেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর যেইমাত্র জানিতে পারিলেন, রামলক্ষ্মী দেব্যাকে না নিয়া মা আসিয়াছেন, অমনি রাগিয়া একেবারে মা'কে ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, তখনই

জলে ভাসাইয়া দিবেন। মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় কে যেন আসিল, তিনি থামিলেন। তাঁহার রাগ দেখিয়া কৈলাস দাস মহাশয় তখনই বলিয়াছিলেন, "আমি যাইয়া আনিতেছি।" চাকরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই নৌকা বাহিয়া চলিয়া গেলেন, তবুও তিনি মা'র উপর এরূপ রাগ করিলেন। দাদা কিম্বা ননদিনী কিছুই বলিলেন না।

অভাব অনেক সময় থাকিত। পাকের ঘর দিয়া বৃষ্টির জল পড়িত। মা থালা ঢাকা দিয়া পাক করিতেন। জ্বালানি কাঠের অভাব। নানা গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া পাক করিতেন। কোন সময় এমন হইয়াছে যে, মাত্র ঠাকুরের আন্দাজ চাল আছে। মা তাহাই পাক করিয়াছেন। যখন এরূপ কম জিনিষপত্র থাকিত, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর পাকের ঘরে যাইয়াই, বলিতেন, "আমাকে দেখাও, দেখি ভাত কি আছে।" ভাত কম, শুধু এক জনের আন্দাজ, তাহা দেখিলে তিনি হয়ত নামমাত্র খাইবেন, এজন্য মা পূর্ব্বেই একখানা জায়গা লেপিয়া রাখিতেন, যেন খাইলে, শকরা লেপা হয়। ভাত দেখাইয়া মা বলিতেন, "এই ভাত কেবল আপনার জন্য, আমি খাইয়াছি। এই দেখুন শকরা যে নিয়াছি তাহার চিহ্নও আছে।" মা কখনও ঠাকুর না খাইলে খাইতেন না। ঠাকুর যে জিনিষ না খাইতেন মাও তাহা খাইতেন না।

পিসী শাশুড়ী ও ননদিনী দুই জনে সর্ব্বদা মা'কে যন্ত্রণা দিতেন ও গঞ্জনা করিতেন। যখন ননদিনী না থাকিতেন,

তখন পিসী শাশুড়ী খড়গহস্ত হইতেন, আবার ননদিনী আসিলে, তিনি একটুকু ভাল হইতেন, অযথা গালাগালি করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিম্বা দাদা এক দিনও কিছু বলেন নাই। ননদিনী ও পিসী শাশুড়ী ঘরে মিষ্টান্ন হইলে মা'কে কখনও শুধু মিষ্টান্ন দেন নাই, ভাত মাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আমলে মা দুই চারি দিন ব্যতীত কখনও তরকারী দিয়া ভাত খাইতে পারেন নাই, শুধু লবণ ভাত। এক দিন ঠাকুর পাতে কিছু মাছ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি খাইও।" তিনি উঠিয়া গেলে ননদিনী আসিয়া বলিলেন, "ওখানে ঢাকা কি ?" মা বলিলেন, "পাতে মাছ রহিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "রাখিয়া দিন, ছেলেপেলেরা পর দিন প্রাতে খাইবে।" মা খাইতে বসিলে দৈবক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর পাকের ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, তরকারী কোথায় ?" মা বলিলেন, "ননদিনী প্রাতের জন্য রাখিতে বলিয়াছেন, ছেলেপেলেরা খাইবে।" তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া চলিয়া আসিলেন, একটী কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না, বা কিছুই বলিলেন না। মা বরাবর যেমন খান, আজও তেমনি শুধু ভাত খাইয়া উঠিলেন। এরূপ শুধু ভাত এক দিন নয়, প্রায় প্রতিদিনই খাইতেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও কাহাকে কিছু বলেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর এসব জানিয়াও কিছু বলিতেন না।

ঠা'ন্‌দিদি বাড়ী হইতে আসিয়া বরাবরই মা'কে দেখিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিন মা'র ইচ্ছা হইল, ঠা'ন্‌দিদিকে

খাওয়ান। মা ঘরের ধান হইতে কিছু আতব চাউল প্রস্তুত করিলেন। ঠা'ন্‌দিদি আসিলে, মা তাঁহাকে খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও রাজী হইলেন। মা রাঁধিতে যাইবার পূর্ব্বে ননদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চাউল কোথায়? মা যেখানে রাখিয়াছিলেন, তথায় নাই। ননদিনী দুই হাত দিয়া দুই চক্ষের পাতা টানিয়া চক্ষু দেখাইয়া বলিল, "এই চক্ষের ভিতর।" হাত নাড়া দিয়া বলিল, "কপালের তলে, পেটের ভিতরে।" আরও কত কি বকিতে আরম্ভ করিল। এসব দেখিয়া ঠা'ন্‌দিদি চলিয়া গেলেন, আর খাওয়ান হইলনা।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা যাইতে মা হারাণ ভৌমিকের মা'কে দিয়া গহনা বন্ধক রাখিয়া পাথেয় আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, "টাকা আসিলে, বাপ মশয়র নিকট চাহিয়া লইও।" টাকা আসিলে, মা লোক দিয়া টাকা চাওয়াইলেন। দাদা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, মা মিথ্যা কথা বলিয়া টাকা নিতে চায়। মা'কে প্রায় মারিতে উদ্যত; এবং এরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন যে, জীবনে এরূপ করেন নাই। ননদিনীও যথেচ্ছা গালাগালি করিলেন। মা তিন দিন উপবাস করিলেন, ঠা'নদিদি নিতে চাহিলেও মা কিছুতেই গেলেন না; কারণ ঠাকুর জানিলে যদি মা'কে আর না আনেন। ইহার মধ্যে এক দিন প্রসন্ন মুখার্জ্জির স্ত্রী মা'কে খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি চৌধুরীবাড়ী থাকিতেন। শেষে মা নিজেই খাইলেন, কেহ একবারও বলিলেন না।

দাদার খাওয়া দাওয়ার জন্য সর্ব্বদা মা যত্ন করিতেন। রাত্রে বাহ্যের বেগ হইলে দাদা পায়খানায় যাইতেন। পাছে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় মা পিছনে যাইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আবার আগে আগে চলিয়া আসিতেন; যেন দাদা টের না পান, দাদার সঙ্গে মা কথা বলিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী থাকা কালীন এক দিন মা'র সহিত ননদিনীর তুমুল ঝগড়া। ননদিনী পারেনত মা'কে ধরিয়া মারেন। ঠাকুর মা'কে বলিলেন, "এখন যাইয়া উহার চুল বাছিয়া দেও।" মা গেলেন, কিন্তু ননদিনী দিলেন না। তখন দাদা জীবিত আছেন।

এক দিন ননদিনী মা'কে অজস্র গালাগালি করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বাড়ীতেই। নটবরবাবু এরূপ গালাগালি শুনিয়া অসহ্য হওয়ায় তাহাকে মারিতে দৌড়িয়া পূবের ঘরের বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বলিলেন "কি, আপনি আমাদের সম্মুখে মা'কে এরূপ গালিগালাজ করিবেন!" সেই অবধি ননদিনী গালি বন্ধ করিলেন। আর এরূপ করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজ কর্ম্ম করেন না, বাড়ী আসিয়া বসিলেন। দাদার ভয়, পাছে তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, বা নষ্ট করেন। সেজন্য তিনি রাজকুমার নাগের দ্বারা মুসাবিদা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন যে, সম্পত্তি মা ও তাঁহার মেয়ের নামে লেখা পড়া করিয়া দিবেন। মা'কে এক দিন দাদা একথা বলেন, শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আমাকে দিলে আমি কাগজ ছিড়িয়া

ফেলিব! যে প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেই পাইবে না, আমাকে দিবেন!" পরে আর তাহা করা হয় নাই। দাদা কথায় কথায় বলিতেন, "তুমি কি আমার পিণ্ড দিবে, না শ্রাদ্ধ করিবে? যদি শ্রাদ্ধ করে ত মেয়েই করিবে; পিণ্ড দিলে মেয়েই দিবে।" আবার বলিতেন, "আর করিবে কি? বাড়ী বেচিয়া খাইবে?" মা বলিয়াছিলেন, "বেচিয়া খাইবেনা, ভয় নাই। এক বাড়ী আপনি নিজেই বেচিয়াছেন। অন্য বাড়ী শ্রাদ্ধে লাগিবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "আপনার ঐ ঘোড়ার ডিম আমি চাই না, উহা দিয়া কি করে?"

সারদার সন্তান হইয়া বাঁচিতনা, এক ব্রাহ্মণ তাহাকে মৃতবৎসার কবচ দেয়। তারপর তাহার সন্তান বাঁচে। মা'র সন্তান হয় না, দাদা সাব্যস্ত করিলেন কালের দৃষ্টি। মা'র পেটেও বেদনা ছিল। সেই ব্রাহ্মণকে আনাইলেন। সে ব্রাহ্মণ মা'কে উপবাসী রাখিয়া হাতে জবাফুল দিয়া বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই আসে, এখনই আসিবে।" মা ইচ্ছা করিয়া হাত একটুকু কাঁপাইতেন। আবার সে বলিত, "এই আসিয়াছে," তখন মা হাত স্থির করিয়া রাখিতেন। এইরূপে মা'কে সারা দিন রাখে, কিন্তু কিছুই হইল না। পরে একটী কবজ দিয়া যায়, মা তাহা ধারণ করেন নাই। মা'র বয়স তখন ২০।২১ বৎসর। মা মনে মনে হাসেন। দাদার আজ্ঞা পালন না করিয়া পারেন না, তাই যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে গালাগালি করিতেন, মারিতে যাইতেন, জলে ডুবাইতে যাইতেন, কত সময় কত রাগ করিতেন, মা'র মনে ভয় হইত, পাছে ঠাকুর কথা না কন, রাগ করেন; তাই ঠাকুরের রাগ হওয়ার পরই তামাক নিয়া হাজির বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করা। শ্রীশ্রীঠাকুর হয়ত কোন দিন দুই একবার উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আর রাগ নাই। তিনি বলিতেন, "এই যে রাগ করি, ইহা মহৌষধি। যখন বুঝিবা, তখন মজিবা। আমি ভালর জন্যই বলি। পরকেত গালি দিতে যাইনা বা দেই না।"

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য নানারূপ পাক করিতেন, খাবার নানারূপ বন্দোবস্ত করিতেন। পিঠার সময় পিঠা, লাড়ুর সময় লাড়ু, আম কাঁঠালের সময় আম কাঁঠাল,—যখনকার যা, এসবের কিছুমাত্র আয়োজন দেখিলেই তিনি বলিতেন, "আমার জন্য ফাঁদ পাতে।" তিনি কোন সময় বা কিছু খাইতেন কোন সময় একেবারেই না। তিনি না খাইলে মাও খাইতেন না।

মা বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে মিষ্টান্ন সাত দিন রাখিয়া খাওয়াইয়াছেন। তিনি কিছুতেই খাইবেন না, মা না খাইলে ছাড়েন না। প্রতি দিন নূতন দুধ দিয়া জ্বাল দিয়া রাখিয়াছেন, পরে তিনি খাইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর না খাইলে মা কাঁদিয়া আকুল হইতেন। মা বলেন, "ঠাকুরকে না খাওয়াইতে পারিলে যত কষ্ট হইত, এত কষ্ট আর কিছুতেই হইত না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার জন্য মা নানারূপ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। একটুকু খাইলে মা আহ্লাদে পূর্ণ হইতেন, যেন

হাতে আকাশ পাইতেন। জোর করিয়া বলার যো ছিল না। এই খাওয়া খাওয়া করিয়া মা অনেক গালি শুনিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় লেংটা হইতেন। মাও এক দিন বলিয়াছিলেন, "লেংটা, লেংটা, কি বলেন? সকলেই হইতে পারে। আপনি যেমন লেংটা হইতে পারেন, আমিও সেরূপ লেংটা হইতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রাগিলে অনেক সময় সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন, এইরূপ বলিতেন। মা বলিতেন, "সন্ন্যাসী হইবেন কেন? আমি যদি কিছু চাই তবে ত যাইবেন; আমি শুধু আপনাকে দেখিলেই সুখী। আমি কোন দিন কিছুর জন্য বিরক্ত করি নাই, কখন করিবও না। আর আপনি যদি যান, তবে আমিও পিছন পিছন যাইব।" স্বাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তিনি গৃহেই রহিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শন মা'র একেবারে অসহ্য বোধ হইত, চক্ষের সম্মুখে থাকিলেই সুখী। শত গালি, পুষ্পবৃষ্টি মনে করিতেন। মা সব সময় ভয় করিতেন, কখন কোথায় চলিয়া যান। ঠাকুর বাজারে গেলেও ভয় হইত, পাছে তিনি আর ফিরিয়া না আসেন। মা সদা সর্ব্বদা তাঁহার জন্য শঙ্কিত হইয়া চাতকীর ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলে মা'র প্রাণে জল আসিত।

অভাব অভিযোগ চিরদিনই ছিল। সময়ে চাউল আধ মণ পর্য্যন্ত হাওলাত হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা জানান নাই। মোটকথা

যত দিন না জানাইয়া চালাইতে পারিয়াছেন, তত দিন আর জানান নাই। জানাইলেই তাঁহার কষ্ট হইবে। এদিক ওদিক যাইবেন, হয়ত বাজারে যাইবেন, সেই সময়টুকু মা কি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে না দেখিয়া থাকিবেন? দৈনিক বাজারে যাওয়া সম্বন্ধেও সেইরূপ, পারত পক্ষে তাঁহাকে মাছ তরকারীর জন্যও বাজারে যাইতে দেন নাই। মা বলেন, যে দিন ঠাকুর গালাগালি করেন নাই, সেদিন মনে করিয়াছেন, মা'র সঙ্গে তিনি রাগ করিয়াছেন। তিনি কোন কোন দিন রাগিলে গালাগালি করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর কত দিন কত কি বলিয়াছেন, মারিতে উদ্যত হইয়াছেন, টানিয়া নিয়াছেন, কিন্তু মা একদিনও শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটী কটু কথাও বলেন নাই।

দাদার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার ফাল্গুন মাসে কলিকাতা যান। বলিয়া গিয়াছিলেন, সত্বরই ফিরিবেন; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিল, কোন খোঁজ নাই। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র দেন, কোন উত্তর নাই। পালদের নিকট পত্র দেন, উত্তর নাই। মা একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং নটবরবাবু ও ভগিনীকে সঙ্গে নিয়া কলিকাতা গেলেন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য গাছের কিছু আম নিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন মা রওয়ানা হইয়াছেন, সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরও বাড়ী রওয়ানা হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে কলিকাতায় পান নাই। এবার মা বাগবাজার পরমহংসদেবের স্ত্রীকে দেখিতে গেলেন, পূর্ব্বে আর দেখেন নাই। তিনি মা'কে

যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। পাঁচ ছয় দিন পরে মা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

যখন শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বাড়ী রাখিয়া কলিকাতা যাইতেন, তখন মা ঠাকুরের যাওয়ার দিন ঠিক হইলেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতেন। বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে পনর দিন পর্য্যন্ত ভাত তুলিয়া মুখে দিতে পারেন নাই; কেবলই রাতদিন কাঁদিয়া বেড়াইতেন। ঠাকুরকে সর্ব্বদা মনে পড়িবে সেই উদ্দেশ্যে যে বিছানায় তিনি শয়ন করিতেন, সেই বিছানা যে ভাবে পাতা হইত, সেই ভাবেই পাঁচ সাত দিন রাখিতেন, উঠাইতেন না; যে হুঁকা-কল্কিতে তামাক খাইতেন তাহা যেখানে রাখিতেন, সেই খানে সেই ভাবেই অনেক দিন রাখিতেন।

দেওভোগ যে কোন লোকই আসিয়া ঠাকুরবাড়ী রাত্রি যাপন করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন শ্রীশ্রীমা অতি প্রত্যুষে সকলের পূর্ব্বে উঠিয়া গৃহকার্য্য করিতেছেন, এবং স্নানান্তে পাক করিয়া অতিথিসেবার পর ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছেন, তৎপর নিজে ঠাকুরের পাতে প্রসাদ পাইয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ হওয়া অবধি যখন কাছে থাকিতেন, তখন ঠেকা ছাড়া শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর দুই জনে একত্র এক বিছানায় শুইতেন। মা বলিয়াছেন, "আমি ঠাকুরকে বিরক্ত করিব কেন? আমি তাঁহাকে ছয় মাসের শিশুর ন্যায় বুকে করিয়া ঘুমাইয়াছি। আমার এক দিনের তরেও অন্য ভাব মনে আসে নাই। আমি তাঁহাকে ভালবাসি, শুধু চক্ষের দেখার জন্য। তাঁহার নিকট আমি কোন দিনও কিছুই চাই নাই।" কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'রমা, রম্ভা, তিলোত্তমা যদি মন ছলে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় মম মন নাহি টলে', * আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, কোন রমণীই আমাকে কোনভাবে শত চেষ্টা করিয়াও বিচলিত করিতে পারিবে না।" তিনি বলিতেন, "অবতারগণও স্ত্রী নিয়া থাকিতে ভয় পাইয়াছেন এবং ভয়ে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়া সংসারে রহিয়াছি, জোর করিয়া রহিয়াছি, সাধ করিয়া সংসারের বোঝা মাথায় নিয়াছি। সদাই মন বাহির হইয়া যাইতে চায়, আমি ইচ্ছা করিয়া থাকি।"

চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য রাজকুমার নাগের ইষ্টদেবতা, ঠাকুরের গুরুর খুড়াত ভাই। তিনি এক দিন আসিয়া ঠাকুরকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীসহবাস করা ও ছেলে উৎপাদন করা ইত্যাদি বিষয়

* সুরেশচন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ৭০৫ পৃঃ ১৭৮।

বুঝাইতে ছিলেন এবং বংশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; যেন প্রলয় কাণ্ড! এ ব্যাপার দেখিয়া তিনি ক্রোধে চলিয়া গেলেন। ইষ্টদেবতা কুলোদ্ভব ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত রাগিয়া উঠায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনার মত গুরুতে কিছু করিতে পারেনা।"

অন্য এক দিন নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, গুরুর ছোট ভাই, আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য কালীচরণ ভৌমিক মহাশয় ছিলেন। ঠাকুরবাড়ী হইতে যাইতেছেন, পুরোহিত বাড়ীর নামার চকের মধ্যে যাইতে যাইতে তিনি সংসার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানারূপ বুঝাইতে ছিলেন। পরে বলিয়াছিলেন; "তোমার বংশ রক্ষাকরা উচিত।" যেইমাত্র এই কথা বলা, অমনি তিনি একেবারে বিকলাঙ্গ। লেংটা হইয়া চষা জমীর চাকার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আপনি গুরু, আপনি যাহাতে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়, যাহাতে কামকাঞ্চনে আসক্তি না যায় তাহা বলিবেন। আর আপনি কিনা বংশরক্ষা ও কামিনীতে আসক্তির কথা বলিতেছেন! হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ!" শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। চারিদিকের সব লোক একেবারে অপ্রস্তুত। গুরু হতবুদ্ধি; অমনি তাড়াতাড়ি যাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ফেরত নিলাম। তুমি এরূপ করিওনা।" অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রাস্তায়, ঘাটে, বাজারে বেশ্যা দেখিলে ঠাকুরের মন অস্থির হইয়া যাইত, অতিকষ্টে ভাব সম্বরণ করিয়া তিনি 'মা' বলিয়া মাতৃভাব আনিয়া মা—ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ দর্শন করিতেন।

সারদা গগন দত্তের কন্যা, বাপের বাড়ী থাকিত, ঠাকুরবাড়ী আসা যাওয়া করিত। ঠাকুরের উপর তাহার ভালবাসা পড়িল। সে ঠাকুরকে মনে প্রাণে স্বামীরূপে বরণ করিল। একবার চৈত্র মাসে সংক্রান্তির দিন শ্রীশ্রীঠাকুর মণ্ডপে শুইয়াছিলেন, অতিভোরে হাত পা ধুইয়া আসিয়া বসিয়াছেন, মা তখনও শোয়া, সারদা আসিয়া ঠাকুরের দুই হাতের দুই বৃদ্ধ অঙ্গুলী ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি 'মা, মা' বলিয়া মাথা কুটীতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ছার, ছার!" কিন্তু কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছেন না, ঠাকুর মা'কে ডাকিয়া বলিলেন, "উহাকে ছাড়াইয়া দেও।" মা ছাড়াইয়া দিলেন। সে বলিতে লাগিল, "আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে!" তিনি উহাকে দধি চিড়া খাইতে বলিলেন, মা তাহাই দিলেন। সে বলিল, "আমি হাত দিয়া খাইতে পারি না।" ঠাকুর বলিলেন, "তুমি খাওয়াইয়া দেও।" মা তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। খাইয়া উঠিয়া হরপ্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তাহাকে (মা'কে) কি বলিয়া ডাকেন?" হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "আমি মা বলিয়া ডাকি।" সে বলিল, "আমাকেও মা বলিয়া ডাকুন।" হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "আপনাকে আমি মা বলিয়া ডাকিব কেন? আপনার তিন

মেয়ে, এক ছেলে তাহারাইত মা বলিয়া ডাকে।" হরপ্রসন্ন বাবুকে বলিতে লাগিল, "যাহা কিছু আছে সব আমার। তাকে মা বলিয়া ডাকিলে আমাকেও ডাকিতে হইবে।" তাহার মাতাকে খবর দেওয়া হইলে সে আসিয়া তাহাকে গালাগালি করিয়া লইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হরপ্রসন্ন বাবু মা'কে বলিয়াছিলেন, সে যদি মা'র সঙ্গে হিংসা না করিত, তবে কাবু করিতে পারিত। সারদা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় চৌধুরী বাড়ী পার হইয়া থাকিত, রাত্রিতে আসিয়া ঠাকুরকে ত্যক্ত করিত। এক দিন বার বার আসিয়া ত্যক্ত করিতে থাকে। তিনি একাকী মণ্ডপে, মা পাকের ঘরে। তিনি যখন দেখিলেন কিছুতেই অব্যাহতি নাই, তখন ঘরে না থাকিয়া বারান্দায় যাইয়া বসিলেন। রাত্রি ভোর হইলে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। মা পাক করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। সে দিনের বেলায় আসিয়াও ঠাকুরকে ত্যক্ত করিত। ঠাকুরদাদার কাছে অনেক সময় বসিয়া থাকিত, প্রণাম করিত। সকলের কাছে বলিত, "আমার গলায় একটা কাক ঠেকিয়াছে।" নটবর বাবু তাহাকে অনেক দিন মারিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন। সে কিছুতেই রাগ করে নাই বা আসিয়া ঠাকুরকে ত্যক্ত করিতে ছাড়ে নাই। সে যখন চলিয়া যাইত, দেখিতে বড়ই সুন্দর—এক পা যাইত আর পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিত; আবার হয়ত ফিরিয়া আসিত। যাবার সময় পা ছেঁচ্‌রাইয়া হাটিত, যেন যাইতে ইচ্ছা করে না। যতদূর

পর্য্যন্ত ঠাকুরকে দেখা যাইত এইরূপ করিত। সে আসিলে ঠাকুর মা'কে নিকটে থাকিতে বলিতেন, মাও তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন।

একবার তাহার জ্বর হইল। ঠাকুরকে যাইয়া দেখিতে খবর দিল। তিনি মা'কে বলিলেন, "তুমি যাইয়া দেখিয়া আস।" মা বলিলেন, "আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছে, আপনি যান।" তিনি বলিলেন, "না, তুমিই যাও।" বর্ষাকাল। মা হরপ্রসন্ন বাবুকে সঙ্গে নিয়া নৌকায় তাহাকে দেখিতে গেলেন। মা'কে যেই মাত্র দেখা, অমনি সে আপনার মাথার চুল আপনি ছিঁড়িতে লাগিল। মুখের কিচকিচিতে বুঝা গেল, তাহার খুব রাগ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া মা আর কাছে গেলেন না। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "ঐ দেখ সে কি করিতেছে। তোমাকে নিকটে পাইলে তোমার চুল এখনই ছিঁড়িয়া ফেলিত।" মা চলিয়া আসিলেন। সে ভাল হইলে পর অনেক সময় আসিয়া বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কাহারও কথায় সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ক্রমে সে বদ্ধ পাগল হয়। এখনও সে জীবিত আছে। এখন আর পাগলামী নাই। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর সে মা'কে বলিত, "তোমার জন্য কতকগুলি টাকা রাখিয়াছি, তুমি খুব খাইও; খাওয়ায় দোষ নাই।" তখন সে পাগল ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

একবার ৺দুর্গাপূজার সময় বেলবরণের দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম হইতে উঠিয়াই মা'র সঙ্গে কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজেৎ।" এবং বিষয়ের নানারূপ দোষ বুঝাইতেছিলেন। সারদা আচার্য্য তখন প্রতিমার কাজ করিতেছিল। এইরূপে বিষয় নিন্দা করিয়া তিনি পরমুহূর্ত্তে আর মা'র নিকট টাকা চাহিতে পারিতেছেন না। মা ও ঘর লেপিতেছেন, কিছুই বলেন না। বাজারে না গেলেও নয়, পূজা পর দিনই। ঠাকুর এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন, মা দেখিয়াও যেন দেখেন না। মা'র ইচ্ছা তিনি টাকা চান, কিন্তু তিনি কিছুতেই চাহিতেছেন না। যখন বেলা খুব বেশী হইল, তখন মা টাকা আনিয়া দিলেন, ঠাকুর বাজার করিতে চলিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় সব সময়ই বলিতেন, 'মাগো ভবাটবী, ঘোড়ার ডিম' 'সংসারকে চিনিলে সংসার পালায়।' ইহাতে তিনি গুরু ও চামারের গল্পটী বলিতেন,—এক চামার ভৃত্যরূপে গুরুর সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যায়। গুরু তাহাকে গোপনে থাকিতে বলেন। কোন দরকারে শিষ্য ঐ ছদ্মবেশী চামার ভৃত্যকে গুরুর জুতা আনিতে বলে, সে ইতস্তত করে। তখন শিষ্য রাগ করিয়া বলে, এ বেটা চামার না কি? কথা শুনে না। যেই এই কথা বলা অমনি ঐ চামার চাকর, "আমাকে চিনেছে গো, আমাকে চিনেছে গো" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা বলিতেন, "গুরু কৃপাহি কেবলম্, গুরু হি কেবলম্। নিজগুণে কৃপাহি কেবলম্। কৃপা ভিন্ন জীবের গতি নাই। তাঁহার কৃপা হ'লে অন্তঃচক্ষু আপনাআপনিই খুলিয়া যায়। তখন যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে। ভগবানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে কখনও পা বেতালে পড়ে না এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। আমিত্ব না গেলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কোন্ পুরাণ হইতে জ্ঞান আসে, বলা যায় না। এক গাছ দুর্ব্বা হইতেও জ্ঞান আসিতে পারে। সচ্চিদানন্দের মূল বিশ্বাস। ভগবান্ দয়াবান্। লোকে তিন দিন পূজা করে কেন? সারা জীবন করা উচিত। তিন দিন পূজা করিয়াই কি শেষ হয়? হাঁস জল ফেলিয়া দুধ খায়। বাপের হাত ধরা ছেলে কখনও বিপথে পড়ে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করিতেন না। তিনি বলিতেন, যত মত তত পথ। মুসলমানদের মজিদ বা খৃষ্টানের গীর্জ্জা দেখিলে সেলাম করিতেন। যে যেই প্রশ্ন করিত তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন। নিজের কোন মত কখনও প্রকাশ করেন নাই। আত্মগোপন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বাহিরের যাহারা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে বলিতেন, "এ রক্তমাংসের খাঁচা, এটা কি দেখিবেন?" কাছে গেলে বলিতেন, "আমি স্নান করি না, অশুচি। আমি শূদ্র, ক্ষুদ্র। আমি কি জানি?" কিন্তু কোন উত্তর দিতেই বলিতেন,

"শাস্ত্রে বলেন, মহাপুরুষেরা বলেন।" কখনও বা বলিয়াছেন; "পরমহংসদেব বলেন বা অবধূত বলেন।" এইভাবে যে প্রশ্নে যেইটীর দরকার হইত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া উত্তর দিতেন। আমি বলি, বা আমার এই মত, তিনি কখনও বলেন নাই। যাহা কিছু আত্মপ্রকাশ তাঁহার পিতার সঙ্গে ঝগড়ায়, ঝগড়ায় হইয়াছে, নতুবা একটী কথাও কেহ জানিতে পারিত না। অধিকাংশ সময়ই লোকজন থাকিলে, কোনরূপ আত্মপ্রকাশক কথা বলিতেন না। তবে যাঁহারা বরাবর আসিতেন তাঁহাদের কথার পৃষ্ঠে কথা পড়িয়া ঠাকুরকে আত্মহারা করিয়া তুলিত, তখন ঐরূপ কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন হইতেন। তারাকান্ত গাঙ্গুলী যখন আসিতেন তখন অনেক সময়ই সমাধিস্থ হইতেন। ঠাকুর মা'কে কোন মন্ত্র বলিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার খারাপ অবস্থা দেখিলে, ঐ মন্ত্র কর্ণমূলে বলিও।" যখন মা দেখিতেন, অনেক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে; কিছুতেই তাঁহার সমাধি ভাঙ্গিতেছে না, তখন কাণে ঐ মন্ত্র জপ করিতেন; হঠাৎ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তিনি সংজ্ঞা লাভ করিতেন; ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতেন। অনেক সময় গান শুনিতে শুনিতে, সমাধি আসিয়া পড়িতেছে, তখন "তামাক খাব, তামাক খাব" এইরূপ বাসনা করিয়া জ্বলন্ত আগুনে হাত দিতেন। ভাবে কেমন করিতেন, চক্ষে না দেখিলে ভাষায়

সে ভাবভঙ্গী ঠিক প্রকাশ করা যায় না। কোন লোক জন আসিলেই ঠাকুর হুঁকা কল্কি, তামাকের খাদা ও আগুনের পাতিল নিয়া বাহির হইতেন। কোন সময় বা মণ্ডপের বারান্দার পূর্ব্ব কোণে, কোন সময় বা পশ্চিম কোণে আসিয়া বসিতেন। তিনি ভিন্ন একখানা চাটাইতে বসিতেন, আর মুহুর্মুহুঃ তামাক দিতেন। কোন সময় তিনি উঠানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের আমগাছের তলায়ও তামাকের সরঞ্জাম নিয়া বসিতেন এবং এই আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়া পূজার সময় কাঁসি বাজাইতেন। শীতকালেও রাত্রি ১টা, ২টা পর্য্যন্ত লোক জন রহিয়াছে। তুমুল কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের কোণে একখানা চাটাইএর উপর পাতলা ভাগলপুরী গায়ে বসিয়া মুহুর্মুহুঃ তামাক দিয়াছেন, কোন বিরক্তি নাই। হয়ত ইহার মধ্যে পিত্তের ব্যথাও উঠিয়াছে, কিন্তু সাধ্য ছিলনা, তাহা লোকে টের পায়; যদিও এত ব্যথা ছিল যে লোকজন চলিয়া যাওয়া মাত্রই আর উঠিয়া যাইতে পারেন না। তিনি ঘরেই তামাক তৈয়ার করিতেন। হয়ত তামাক শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘরে রাবও নাই; তখন গুড় থাকিলে গুড় অথবা কলা দ্বারা তামাক মাখিয়া লইতেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ভিন্ন হুঁকা। তাহার জল দৈনিক পাঁচ সাত বার পরিবর্ত্তন করিতেন। ঠাকুরের হুঁকা ভিন্ন; তাহার জল শুকাইয়া লাল হইত। শব্দ হইত 'ফট্টর ফট্টর।' সে হুঁকাটি এমনি সুন্দর যে, মাটিতে বসাইলে বৈঠক ছাড়াই বসিত।

কোন দিন বা বাজারে যাইতে যাইতে আপন দেহ ভুলিয়া গিয়াছেন। পথে বসিয়া "আমার দেহ কোথায় গেল?" বলিয়া কাঁদিয়াছেন। তখন সাধনার অতি প্রখর অবস্থা। কোন কোন দিন রাত্রে সমস্ত মাঠ গড়াগড়ি দিয়াছেন। একেবারে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব মা'র নিকট বলিয়াছেন, সাধনার সময় কতই না বিভীষিকা দেখিয়াছেন,—সাপে কাটিতেছে, বাঘে খাইতেছে, বিকট দর্শন ভূতপ্রেত সব আক্রমণ করিতেছে, আগুনে পুড়িয়া মারিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। যখন তারাকান্ত গাঙ্গুলী খুব আসা যাওয়া করিতেন, তখন এক দিন মা ও প্রসন্ন মুখার্জির স্ত্রী দেখেন শ্রীশ্রীঠাকুর চৌধুরীদের উত্তরের ঘরে একেবারে আত্মহারা, চুল ছিঁড়িতেছেন, গড়াইতেছেন, আতাম মাতাম করিতেছেন; কি যে করিতেছেন, কিছুই স্থির নাই। জগবন্ধু ভৌমিক ও তারাকান্ত গাঙ্গুলী বারণ করিয়া ধরিয়া রাখিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোথাও যাইতে হইলে দুই একটী পয়সা সঙ্গে নিয়া যাইতেন। মা বলিতেন পয়সা কেন? তিনি বলিতেন, "থাক, সঙ্গে থাকা ভাল।" এমন কি গ্রামের কোন বাড়ী গেলেও মা'র নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া নিতেন, এবং যেখানেই যাইতেন, মা'র নিকট বলিয়া যাইতেন। মাও বলিতেন, "আসুন গিয়ে," যেখানে যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন, আসিয়াই মা'র নিকট বলিতেন।

ভাগিনেয় উপেন্দ্র ছোটকালে কেবল পয়সা চাহিত।

ঠাকুর বলিতেন, "পুছা পছা কর্‌তে পারবি না। যা চাবি, খাওয়াইব। পয়সা চাহিতে পারবি না"।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করিতেন, কেহ বা প্রণাম করিতে দিত, কেহবা সরিয়া যাইত। তখন বলিতেন, "ব্রাহ্মণের পদধূলি ঔষধি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও গঙ্গায় স্নান করেন নাই। একবার অর্দ্ধোদয় স্নানের সময় যখন পয়সাগাওয়ের ব্রাহ্মণগণ বাসায় ছিলেন, তখন বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে স্নান করান। তিনি লাঙ্গলবন্দের ব্রহ্মপুত্র স্নানেও অনেক বার গিয়াছেন, কিন্তু স্নান করেন নাই।

একবার হরপ্রসন্নবাবু, তাঁহার স্ত্রী সহ ঠাকুরবাড়ী হইতে লাঙ্গলবন্দের স্নানে রওনা হন, অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে ফিরাইয়া আনেন।

অন্য একবার হরপ্রসন্নবাবু ও তাঁহার স্ত্রী শিবচতুর্দ্দশীর উপবাসকরিয়া ঢাকা হইতে এখানে আসেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে ভাত খাওয়াইলেন।

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর যখন কলিকাতা ছিলেন, তখন একবার শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস করেন। রাত্রিতে ডাবের জল ও চনা ভিজান খান। মা পূর্ব্বেও আর একবার উপবাস করিয়াছিলেন। পরে আর কখনও উপবাস করেন নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ কর্ম্ম সংসারী লোকের ন্যায় দেখিয়া কেহই তাঁহাকে প্রথমতঃ চিনিতে পারিত না। কিন্তু কিছুক্ষণ

আলাপ পরিচয় হইলেই বুঝিতে পারিত যে, এই দীন হীন গৃহস্থ মনুষ্য নয়, দেবতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন সর্ব্বদা ধর্ম্মালাপ নিয়াই থাকিতেন, তেমনি আবার রসেরসাগরও ছিলেন। সময় সময় এমন সব গল্প বলিতেন যে, সকলে হাসিয়া কুটপাট হইতেন। এমন হইত যে, আর হাসিতে পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর খোল বাজাইতে পারিতেন না, কিন্তু সময় সময় নিজে নিজেই খোল লইয়া তাহাতে দুই হাতে থাপড় দিয়া মুখে এমন ভাব ভঙ্গি করিতেন, যেন বড় তালমান দিতেছেন। যে দেখিত সেই তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া কুটপাট হইত। ঐভাবে খোল থাপড়াইতেন, মুখে বলিতেন, "বম্ বম্ ভোলানাথ, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। বম্ বম্ ভোলানাথ, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।" তিনি গান গাইতে পারিতেন না কিন্তু গান খুব ভাল বাসিতেন, জোর করিয়া বলিতেন, গানাৎ পরতরং নাস্তি। ঠাকুর কোন সংকীর্ত্তনে নিজে যোগ দিতেন না। তিনি কোন সময় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাতে তুড়ি দিতেন, অথবা হাতে হাত মিলাইয়া আস্তে আস্তে হাততালি দিতেন, তাহাতে কীর্ত্তনে মহাশক্তির আবির্ভাব হইত। বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণেও ভক্তির পূর্ণ উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইত। তিনি শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিতেন, "তাও বটে, তাও বটে," যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য সেই রকম ব্যাখ্যা করিতেন। ঈশ্বরের অনন্ত রূপ। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিতেন, এসবই সত্য। এই দেবদেবীর সাধনা করিয়া কত লোক মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। এবং দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিতেন, মা যে সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিণী। এঁর কৃপা না হইলে কি কেহ অবিদ্যার পারে যাইতে পারে ?

এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণ ভাবাবেশ হয়। সেই দিন সরস্বতী পূজা ছিল। শরৎ বাবু দেখিলেন, তিনি রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "মা কি আমার এই ঘরে মাটীতে আবদ্ধ ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিদ্যারূপিণী।" বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। মাতাঠাকুরাণীকে একথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "ইহা তাঁহার নূতন কিছু নয়। এক এক দিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না, এক এক দিন মনে হয়,তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝি চলিয়া গেলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বাড়ী হইতে কলিকাতা গিয়াছেন। এক দিন গড়ের মাঠ দিয়া যাইতে কোন একটী পরিচিত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে নিয়া ইডেন গার্ডেনে গেলেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাসায় ফিরিবার সময় বলিতে লাগিলেন, "মানুষ কেবল ভোগের জন্যই ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে। হুঁস নাই যে, এখান হইতে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। কেবল ছুটাছুটি, কেবল কামিনীকাঞ্চনের রাজত্ব। হা ভগবান্, তোমার বিচিত্র লীলা !"

বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা গিয়াছেন। তখন এক দিন বলরাম বসুর বাড়ী গেলেন। বেলুরমঠের সন্ন্যাসীরা নানাবিধ বাজে গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি উপস্থিত। তখনই তাঁহাদের বাজে আলাপ বন্ধ হইল। কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল! ইহাতে বেলুর মঠের ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, "উঁনি আসিবা মাত্রই আমাদের কেমন ভগবৎ কথা স্মরণ হইল! অন্য সব কথা কোথায় চলিয়া গেল? এমন মহাপুরুষের পাদক্ষেপেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কর্ম্ম জাগ্রত রহিয়াছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন কলিকাতা গিরীশ ঘোষের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে বেলুর মঠের নিরঞ্জনানন্দ স্বামী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি নিজকে এত দীন হীন ভাবে ব্যক্ত করেন কেন? পরমহংসদেব বলিতেন, যে নিজকে দীন হীন ভাবে, সে দীন হীনই হইয়া যায়।" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "নিজের চক্ষে দেখ্‌তে পাইতেছি আমি অতি হীন, অতি অধম, কি ক'রে আমি নিজকে শিব মনে করব? আপনারা রামকৃষ্ণ ভক্ত আপনাদের মুখে ওসব শোভা পায়। আমার ঐরূপ ভক্তি হ'ল কই?" তিনি একথাগুলি এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে, উনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, একেবারে চুপ। গিরীশ বাবু বলিলেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হ'লে ঠিক ঠিক অহং বুদ্ধির উচ্ছেদ হয় ও ইঁহার মত অবস্থা হয়। এই সকল মহাপুরুষের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্রা হন।"

ঠাকুর কলিকাতা গিরীশ ঘোষের বাড়ী একবার নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। গিরীশবাবু ঠাকুর সম্বন্ধে বলিতেন, "উঁহাকে মহামায়া যতই বাঁধিতেছিলেন, উঁনি ততই সরু হ'য়ে উহার মধ্য দিয়া গলিয়ে চলে গেলেন।" ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত কঠোর সাধনায় ও স্নানাদি নাকরায় কর্কশ দেখাইত। গিরীশবাবু বলিতেন, "অহং শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তিনি উহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, আর কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই।" তাঁহার মধ্যে দীনতার পূর্ণভাব পরিস্ফুট ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বিষয়-সম্বন্ধীয় আলাপ কখনই ভালবাসিতেন না, কিন্তু অন্যে করিলেও তাহা কৌশলে বন্ধ করিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন,মানব জীবনে জিহ্বা ও উপস্থ এ দুইটী জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। একমাত্র ভগবানের কৃপা হইলে, বশে আনা যায়। তিনি বলিতেন, সাধনা দ্বারা নিজকে জাগরিত রাখিতে হয়, কিন্তু ফুট তাঁহার হাতে। ভগবান দয়া করিয়া ফল দিলে, তবে পাওয়া যায়, নতুবা নহে। কাহাকেও বা ঘুমন্ত অবস্থায় ফল দিয়া থাকেন, তাঁহারাই কৃপাসিদ্ধ হন। কৃপা না হইলে কেহই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। তিনি কল্পতরু, যে যাহা চায়, সে তাহাই পাইয়া থাকে। ভগবানের পাদপদ্মে শুধু শুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি প্রার্থনা করিবে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা করিলে তাহা কেবল জ্বালা যন্ত্রণা আনিবে। প্রকৃত সাধককে শক্তি-সিদ্ধি প্রলোভিত করে ; কিন্তু এই সকলে লক্ষ্য পড়িলেই বিপথগামী হইতে হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "অন্তর শাক্ত, বাহির শিব, বদনে শ্রীহরি ; কিন্তু নিজের উপাস্য গোপন রাখিতে হইবে। অতি গোপনে, যেন বিন্দু বিসর্গও কেহ না জানে।" তিনি সিদ্ধাই সম্বন্ধে বলিতেন যে, ওত পাঁচ মিনিটের কাজ। পাঁচ মিনিট বসিলেই যে কোন সিদ্ধিলাভ করা যায়।

একবার ঠাকুরবাড়ীর নিকট চৌধুরীবাড়ীতে আগুন লাগে। মা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরের জিনিষপত্র বাহির করিতে ছিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এখনও এমন অবিশ্বাস ? কি হবে এই সব ছাই কাঁথা কাপড় দিয়া ? ব্রহ্মা আজ বাড়ীর নিকট উপস্থিত, কোথায় এখন তাঁর পূজা কর্‌বে, তা না, সামান্য কাঁথা কাপড় নিয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে !" এই বলিয়া উঠানে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?" আগুনে ঐ বাড়ীর আর কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। বিবেকানন্দ স্বামী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন মহাপুরুষের অমোঘ ইচ্ছায় সবই হইতে পারে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন কাপড় কখনও নিজে কিনিয়া আনেন নাই, কিংবা ধোপাবাড়ীর কাপড় কখনও পরিতেন না। মা নূতন কাপড় আনাইয়া ধোপাবাড়ী দিয়া, তাহাতে কিছু মাটী মাখিয়া বিছানার তলে রাখিতেন, যাহাতে সাবেক কাপড়ের মত দেখায়। এইরূপ করিয়া মা পুরাতন কাপড় সরাইয়া

সেই জায়গায় উহা রাখিয়া দিতেন। গায়ের কাপড়ও তদ্রূপ। যখন তারাকান্ত গাঙ্গুলীর সঙ্গে উন্মাদের মত ঘুড়িতেন, তখন জুতা হারাইয়া যায়, পিরাণ ছিড়িয়া যায়। তারপর আর জুতা, পিরাণ ব্যবহার করেন নাই। গায়ে ভাগলপুরী বরাবরই দিতেন। সাদা ধুতি কুচাদিয়া পরিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন খাদ্যেই রুচি বা অরুচি ছিল না। তিনি থানকনি পাতাও যেমন খাইতেন, পিঠা পরমান্নও তেমনই খাইতেন। কিসে রুচি, কিসে অরুচি তাহা বুঝা যাইত না। যেটা কেহ খায়না, বাসী বা পচিয়া রহিয়াছে, তাহাও খাইতেন। একবার বাসী ফলিমাছের সুক্তা রান্না হইয়াছিল। জগবন্ধু ভৌমিক আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আজ কি দিয়া খাইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "সুধাখণ্ড দিয়া খাইয়াছি।" জ্বরের পর কোন সময় বা খালি নিমপাতা ভাজা বাটী ভরা খাইয়াছেন। মা খাওয়াইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, খাবার বেশী কিছু দেখিলেই ঠাকুর গালাগালি করিতেন। খাবার জন্য মা'কে যত গালি দিয়াছেন, এত আর কিছুর জন্য দেন নাই। কোন দিন মা ভাত বসাইয়াছেন, মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া বলিলেন, "দুটী খেতে দেও," মা বলিতেন, "হয়ত নাই।" "আচ্ছা ওর থেকেই দেও।" তিনি বসিলেন। মা হাতা কাটিয়া দুটী, দুটী করিয়া দিতেছেন, তিনি খাইতেছেন। এইভাবে ভাত পাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খাইতেন। তিনি দুবেলাই খাইতেন, খোরাক অত্যন্ত কম ছিল। বৎসরে

দুইটী বা একটী আম খাইতেন, খাইয়া আঠিটী লাগাইয়া রাখিতেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে তান্ত্রিক সাধক কুলগুরু বাড়ীতে আসিলে তিনি মানুষের মাথার খুলে শোধন করিয়া সুরাপান করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিকটে থাকিলে গুরুদেব প্রসাদ দিতেন এবং তিনি তাহা খাইতেন। কলিকাতার কালীঘাটের কালী বাড়ীর মাংস প্রসাদ কেহ দিলে তিনি তাহা খাইতেন। অন্য কোন প্রসাদি মাংসও তিনি খাইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীক্ষা লওয়ার পর হইতে মাছ খাইতেন না। ঠাকুরের ভগিনী পিতাকে বলিয়াছিলেন, "দাদা আপনার প্রসাদ না নিয়া খান না, আপনি সঙ্গে মাছ দেন, তবেই মাছ খাইবেন।" কিন্তু পিতা তাহা কোন দিন দেন নাই। মাও যখন কলিকাতা ঠাকুরের নিকট ছিলেন, তখন মাছ খাইতেন না। ঠাকুর হাঁ, না কিছুই বলেন নাই। বাড়ী অসিলে দাদা মন্দ বলায় মা মাছ খাইতেন। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবে আত্মহারা হইয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাক হইয়াছে?" মা বলিলেন, "মাছ, আরও কি।" সে দিন মা'কে মাছ দিতে বলিলেন এবং খাইলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন, "মাছ মাংস খাওয়া না খাওয়ায় কিছুই আসে যায় না। এসবে কিছুই কমে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন মন্ত্র-শিষ্য ছিল কিনা জানা নাই। কেহ এরূপ বলিলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। এমন কি বিরক্তও হইতেন। তাঁহার কৃপায় অনেকের হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার

হইয়াছে, এবং অনেক উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু গুরুশিষ্য ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কেহ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে মাথাকপাল কুটিতেন, এবং বলিতেন, "আমি শুদ্দুর ক্ষুদ্দুর। আমি কি জানি?" শরৎ বাবু একবার দীক্ষার জন্য ঠাকুরকে বিশেষরূপে ধরিয়া পড়েন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ। এ সঙ্কল্প আপনি কখনই করিবেন না। শাস্ত্রানুশাসন ও সমাজ মর্য্যাদা না মানিয়াই লোকের এরূপ দুর্গতি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারও অগ্রে চলিতেন না ও কাহারও ছায়া পাড়াইতে পারেন নাই এবং কাহারও বিছানায় বসিতে পারিতেন না। তিনি অপরের তামাক সাজান খাইতেন না কিন্তু তিনি সকলকেই তামাক সাজাইয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাকে কেহ কোন সময় প্রণাম করিতে পারে নাই। প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িতেন, কার সাধ্য প্রণাম করে। ছোট ছোট মুসলমান শিশু ঠাকুরকে দেখিতে আসিত। রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিলে সকলেই সেলাম দিত। তিনি দুই হাত তুলিয়া বহু বার 'সেলাম সেলাম' বলিতেন। ঠাকুরকে হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। হিন্দু হইলে প্রণাম, মুসলমান হইলে সেলাম দিত। তিনি তাহা শতবার ফিরাইয়া লইতেন। আজ পর্য্যন্তও সকলে ঠাকুরবাড়ীকেও সেলাম করে। এমন কি পরিচিত মুসলমান পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে জুতা পায়ে যায়না।

একটী লোক এমন দেখা যায়না যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শত্রু ছিল বা বিরুদ্ধবাদী ছিল, অথবা নিন্দা করিত, কিংবা এখনও নিন্দা করে। সকলেরই তাঁহার উপর একটা অতি বড় ভাব।

লেখকের বাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুর মধ্যে মধ্যে আসিতেন। কোন দিন আমরা ছেলেরা হয়ত বড়শী দ্বারা মাছ ধরিতেছি ; যেই মাত্র তাঁহাকে দেখা, অমনি ছিপ ফেলিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন। তিনি কাহাকেও কিছুই বলিতেন না, তথাপি মনে কি এক ভয় আসিত। হাত পা ধুইয়া আসিয়া আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তিনি এমনভাবে উপুর হইয়া পড়িয়াছেন যে, কিছুতেই প্রণাম করিতে পারি নাই। আসিয়া যখন বসিতেন তখন মাটীতে বিছানা থাকিলে এক কোণে—অর্দ্ধেক মাটীতে অর্দ্ধেক বিছানায়, চৌকিতে বসিলে—এক কোণে। তাঁহার চলন ফিরন বা কথা বলন সবটার ভিতরই একটা মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব ছিল। সে ভাবভঙ্গি না দেখিলে ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে।

স্কুলে যাওয়ার সময় ঠাকুরকে বাজার হইতে আসিতে অথবা বাজারে যাইতে দেখিলে, সকলেরই মনে হইত, আজ আর কোন ভয় নাই। সাপ্তাহিক কিংবা বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে যাইতে তাঁহাকে দেখিলে সকলের ভিতর এরূপ আলোচনা হইত যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন হইয়াছে পরীক্ষায় নিশ্চয় পাশ হইব। বাস্তবিক পক্ষে তাহা হইতও।

*দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের এবং অন্যান্য বহু লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসা যাওয়া করিত, যাহারা বেশী আসা যাওয়া করিত, তাহাদের কাহারও কাহারও কথা দেওয়া হইল।

৺জগবন্ধু ভৌমিক :—

জগবন্ধু ভৌমিক মহাশয়ের জন্ম মা'র পিতৃকুলে, ছোট কালে তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতেন না; বলিতেন "মাথা কার পায়ে লাগাইব?" ছোটকালে তাঁহার পিতা মারা যান। খুড়া কালীচরণ ভৌমিক মহাশয় তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতেন। ঢাকা গণিজ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া তিনি শ্রীহট্ট পড়িতে যান, তাঁহার খুড়া টাকা পাঠাইতেন। তিনি স্কুলে ভর্ত্তি না হইয়া প্রাইভেট্ পড়েন, ও এক বৈরাগীর নিকট বৈরাগ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। সেখান হইতে আসিয়া তিনি গজারিয়া মামাবাড়ী থাকিয়া পণ্ডিতি করেন, আর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন। এক দিন মাংস পাক হইয়াছে, উহাতে তাহার লোভ হইয়াছে বলিয়া আর মাংস খাইলেন না, শুধু ভাত খাইলেন। শেষ জীবনেও হয়ত বাজার হইতে নিজেই মৎস্য আনিয়াছেন, খাইতে বসিয়া ভাবিলেন,—তাহাতে মন গিয়াছে, আর খাইলেন না। শুধু জল ঢালিয়া ভাত খাইলেন। তাঁহার মনে ছিল, ছোট চাকুরী করিবেন না। মধ্যে মধ্যে পাটের অফিসে কাজ করিতেন। তিনি ঘুসের টাকা নিতেন না

বলিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইত। তাহারা নানারূপ মিথ্যা বলিয়া যাহাতে তাঁহার কাজ না থাকে, তাহার চেষ্টা করিত। শেষে আর কাজ করিতেন না। কতক সময় পাঠশালা দিয়াছিলেন। তিনি এক কায়স্থের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি আসিলে তাঁহাকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে আসার পর হইতে তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিয়া শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন ও ধর্ম্ম আলাপ করিতেন। ঠাকুর যখন তারাকান্ত গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনেক সময় বন-জঙ্গলে যাইতেন, তিনিও সঙ্গে থাকিতেন। অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে কুতর্ক করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, তার মনে একটা কিন্তু তর্ক করে উল্টা। তিনি অনেক সময় বলাকি দাসের বাগে জঙ্গলে, জঙ্গলে তারাকান্ত বাবুর সঙ্গে নৃত্য করিতেন, জগবন্ধু বাবুও সঙ্গে থাকিতেন। সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সহিত মাঠে মাঠে ঘুরিতেন। এমন কি বলাকি দাসের বাগে সরিষা গাছও তাঁহার সঙ্গে তুলিয়াছেন। জগবন্ধু বাবু বর্ষার সময় জলে সাঁতার কাটিয়া ঠাকুরবাড়ীতে আসিতেন। একবার তথা হইতে যাইতে একটী জোনাকী পোকা দেখিয়া ভয় পান। রাত্রিতে তাঁহার মা তাঁহাকে কিছুই খাইতে দেন না। শত ঝড় বৃষ্টিতেও তাঁহার ঠাকুরবাড়ী আসা বাঁধা পড়িত না। চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। আর তিনি বিবাহ করেন নাই। বলিতেন, "ঠাকুর বলিলে দশটা বিবাহ করিতে পারি।" কিন্তু

ঠাকুর কিম্বা মা কোনে দিনই বিবাহের কথা বলেন নাই। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। সেই ভাত, জল দিত। তাহাকে বিবাহ দিয়া বাড়ীতেই রাখিয়াছেন। তিনি রাত্রি দুটা, তিনটার সময় যাইয়া নিজহাতে ভাত নিয়া খাইতেন। একদিনের জন্যও মেয়েকে ত্যক্ত করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি এক দিন দিনের বেলায় ঠাকুর-বাড়ী হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন; সড়ক হইতে নামিয়া চক্ দিয়া যাইতে সম্মুখে দেখিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যাইতেছেন। তিনি তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল। তিনি স্বপ্নে মন্ত্র পান। তাহা জপ করেন নাই, কাহাকে বলেনও নাই। বহু বৎসর পরে তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত নটবর বাবুর নিকট বলেন। তিনি ইহার কিছু করেন নাই বলিয়া নটবর বাবু তাঁহাকে মন্দ বলিলেন। এবং তাঁহাকে ঐ মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন; পরে তিনি তাহা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে দিন কল্পতরু হন, সেদিন তিনি ঘরের ভিতর ছিলেন। নটবর বাবু তাহাকে ডাকিলেন। যাওয়া মাত্র নটবর বাবু তাঁহার হাত টানিয়া নিয়া ঠাকুরের বুকে রাখিলেন। জগবন্ধু বাবু নিজে বলিয়াছেন, "তখন যেন তাঁহার শরীর দিয়া এক বিদ্যুৎ চলিয়া গেল, সমস্ত যেন কিরূপ বোধ হইতে লাগিল!" ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় তিনি ফুল বেলপাতা পায়ে দিয়া পা ধরিয়া সারা রাত্রি বসিয়াছিলেন। যখন দেহত্যাগ হয় তখনও পা ধরা ছিল। তিনি রাত্রিতে মসারির ভিতর বসিয়া অনেক রাত্রি

পর্য্যন্ত কোন দিন বা ভোর পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়াছেন; ধ্যানের সময় নানারূপ বিভীষিকা দেখিয়াছেন। তিনি দিনে কতক সময় ঘুমাইতেন। ঠাকুরবাড়ী আসিয়া সকলের সঙ্গে গান ও স্তব করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহাই পড়িতেন। শেষ দিন শরীর বেশী ভাল ছিল না, ঠাকুর-বাড়ী যাইবেন না বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু যাদব পাল যাইয়া বলিল, "ভূঞা মহাশয়, যাইবেন না?" তিনি বলিলেন "শরীরটা ভাল না," যাদব পাল বলিল, "আমিই ত নৌকা বাহিয়া নিব, চলুন না?" জগবন্ধু বাবু পরে চাদর নিয়া রওনা হইলেন। ঠাকুরবাড়ী মণ্ডপে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, প্রসাদির মুড়ি খাইয়া উঠিয়া আসিবার জন্য দাঁড়ান মাত্রই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। 'জয় মা, জয় মা' বলিয়া মাথা হাতাইতে হাতাইতে বসিয়া পড়িলেন। দুইবার বমি হইল, তখন মা সন্ধ্যা করিতেছিলেন। শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতি ধরিয়া শোয়াইলেন। বাড়ীতে খবর দেওয়া মাত্রই লোক আসিল। এই ভাবে সাত দিন কাটিল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমেই অবস্থা খারাপ হইয়া চলিল। সকলেই প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তব পড়িত। মা নিজ হাতে মুখে প্রসাদ দিতেন। মার পদধূলি অন্যে তাঁহার মাথায় দিত। সাত দিন পরে এই পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল। শবদেহ তাহার বাড়ীতে নিয়া দাহ করা হইল।

জগবন্ধু ভৌমিক মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র বহু গান লিখিয়াছেন। তিনটি গান নিম্নে দেওয়া হইল।

দীনদয়াল নন্দনে ভজ ঐরূপে মজ মজরে।
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু গতিহীনের গতিরে ॥
মোহন তনু লাবণ্য ছাকা, হিরণ্ময় কিরণ মাখা
মুখে মৃদু হাসি কিবা চারু শশী বচনে উদাসী করেরে ॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি প্রেম তরঙ্গে, ভঙ্গি বাঁকা নয়ন অপাঙ্গে,
কিবা চারু শোভা মুনি-মনোলোভা,
(রূপে) প্রভাকরের প্রভা হরেরে ॥
তরুণ ভানু পদকমলে, বিধুখণ্ড নখমণ্ডলে,
বিধি হরি হর যোগী যোগেশ্বর, (সদা) মগন যাঁর ধ্যানেরে ॥
ভকত হৃদি কমল মাঝে, নিত্যরূপে নিত্য বিরাজে,
বিশ্বজনতারণ শ্রীদুর্গাচরণ ভুবনমোহন বেশেরে ॥

(২)

বল কে জানে তাঁহারে বিশ্ব চরাচরে,
যোগি জন যাঁরে যোগে নাহি পায়,
যত সিদ্ধ বিদ্যাধর দেবতা কিন্নর,
উদ্দেশে যাঁহার নাম গুণ গায় ॥
আদ্যন্ত রহিত, নিত্য নিরাময়,
সচ্চিদাত্মা এক অখণ্ড অব্যয়,
অস্তি নাস্তি হীন, নির্বিকল্প ঘন,
নির্বিকার, নিরুপাধি, নিরাশ্রয় ॥
যেমন স্বতঃসিদ্ধ বহ্নিকাষ্ঠে আবির্ভূত,
তেমনি গুণাতীত ব্রহ্ম হয়ে গুণাশ্রিত,

সেত বহুরূপ ধরি লীলা সহচরি,
প্রকৃতির সনে কভু বা খেলায় ॥
কোটী কমনীয় মোহন মূরতি,
কভু বিভীষিকারূপে ভয়ের জন্মায় ভীতি,
(সেত) কভু শিবরাম, কভু বাঁকা শ্যাম,
(সেত) শ্যামারূপে বামা রণ রঙ্গে ধায় ॥
শ্রীদুর্গাচরণরূপে বা কখন,
ব্রহ্মানন্দ সুধা জীবে করে দান,
পুণ্যলীলাধাম, দেবভোগ গ্রাম,
(হল) তীর্থ চূড়ামণি যাঁর চরণ ধূলায় ॥

(৩)

কে তুমি মা বল বল নির্ম্মলাহেমবরণী।
বিশ্বধামে নিরুপমা সুষমা কান্তি ধারিণী ॥
(মা তোর) মুখপদ্মে হাসিভরা বচনে অমৃত ধারা।
(মা তোর) অপাঙ্গে মধুর দৃষ্টি, অভীষ্ট সিদ্ধিদায়িনী ॥
অঙ্গে চারু চন্দ্র প্রভা, দিব্য গন্ধে মনোলোভা।
মা তোর রাঙ্গা চরণারবৃন্দ হৃদয় আনন্দদায়িনী ॥
জীবসেবা মঙ্গল ব্রতে দেহ প্রাণ উৎসর্গ তাতে।
বিশ্বমাতা বিনে এত ভালবাসে কার জননী ॥
জীবের মর্ম্মভেদী কান্নারোলে মা তোর স্বর্গের আসন টলে।
বুঝেছি তাই জীব তরাতে ভবে এলেন মা ভবানী ॥

৺গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—

তিনি অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২২।২৩ বৎসর বয়সে বিবাহিত। নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলজীবন। যে বৎসর দৌলতখাঁয় ঝড় হয় সেই বৎসর প্রথম ঠাকুর বাড়ী আসেন। মা পাঁচকরি ভৌমিকের বধূর সপ্তামৃত হইতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি গান করিতেছেন। তিনি আবার বামাচার-কাহিনীও কহিলেন যে নবীগঞ্জ কোন গৃহস্থের অতি সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে কিভাবে যে তাঁর মালা বদল হইল তিনি টেরও পাইলেন না, আরও বলিলেন যে, সে স্ত্রীলোকটী একটী বড় সাধিকা। তাহার গুণেরও অনেক ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া নানারূপ মন্দ বলিতে লাগিলেন, এরূপ কাজ আর না করেন ইত্যাদি। তারপর হইতে কোন দিন এক বার কোন দিন দুই বার এবং কোন দিন তিন বারও আসিতেন। আসিয়া ভাল ভাল গান করিতেন। তাঁহার ভাই এবং রাধাচরণ হালদারও ঐ সঙ্গে আসিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও গোপালের বাড়ী যাইতেন। এইভাবে বহুদিন চলিল। বাড়ী থাকিলে আর আসা বাদ পড়িত না। গোপাল অনেক শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। গোপাল তাহাদিগকে ঠাকুর-বাড়ী নিয়া আসিতেন। প্রথম অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর যখন গোপালের বাড়ী রাত্রে ও দিনে যাতায়াত করিতেন, তখন এক-দিন রাত্রে তিনি ঠাকুরকে সারারাত্র ঘরে আট্‌কাইয়া রাখেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুষ্প বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করেন। এবং সেই দিনই তাঁহার কৃপা লাভ করেন। তিনি সাংসারিক কোন দীক্ষা দেন নাই। যে সব লোক গোপালের নিকট আসিত, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "আমাকে কি দেখিতে আসিস? যা তাঁহাকে যাইয়া দেখিয়া আয়। ইঁনি স্বয়ং ভগবান পূর্ব্ববঙ্গে মানব দেহে লীলা করিতে আসিয়াছেন।" শেষ সময় বলিতেন, "বুড়াকে যাইয়া দেখিয়া আয়।" ঠাকুর বলিতেন, "গোপালের বিশ্বাস এত গভীর ও বুকের পাটা এত বড় ছিল যে, তাহা আকরাইয়া ধরা যায় না। শুধু বাসনাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।" তাঁহার বাসনা ছিল যে, বার বার সংসারে আসিবে, ও ঠাকুরের নাম করিবে, এবং লোকে তাঁহাকেও ঠাকুর বলিয়া জানিবে ও বলিবে।

অতঃপর গোপাল চক্রবর্ত্তীকে সকলেই সত্যগোপাল বলিয়া ডাকিত। তিনিই প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভগবান বলিয়া জানিয়াছিলেন। ফতুল্লার নিকট ধর্ম্মগঞ্জ গ্রামে তিনি এক মধ্য বয়স্কা গোয়ালিনী বিধবাকে মা ডাকেন এবং সেই গোয়ালিনীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তিনি সর্ব্বদা সেখানে যাতায়াত করিতেন। গোয়ালিনী তাহার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিয়াছিল; এমন কি বাড়ী ঘর লেখা পড়া করিয়া দিয়াছিল। প্রতিবেশী ও স্বজাতিরা ইহা কুভাবে দেখিত। এক দিন সকলে চক্রান্ত করিল যে, সত্যগোপালের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিবে এবং সম্ভব হইলে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর

পূর্ব্ববৎ সন্ধ্যার সময় গোপালের বাড়ী যাইয়া দেখেন গোপাল বাড়ী নাই। অন্তর্য্যামী সবই জানিতে পারিলেন, এবং বাড়ীতে না বলিয়াই ধর্ম্মগঞ্জে চলিয়া গেলেন। যাইয়া দেখেন বিষম ব্যাপার! সকলে গোপালকে ঘেরাও করিয়া রহিয়াছে, অত্যাচার আরম্ভ করিবে। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কাপড় চোপড় ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা স্ত্রী-পুরুষ সবাই দিব্য করিয়া বল, তোমরা কে ভাল, কে কি না কর এবং কার মনে কি না উঠে?" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথার কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না। সকলেই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। গোপাল প্রাণে বাঁচিয়া গেল। এদিকে বাড়ীর সকলেই চিন্তান্বিত, ঠাকুর কেন বাড়ী ফিরিতেছেন না। মা দাদাকে বলিলেন, "তিনি ত আসিলেন না!" কি করিবে সে? বর্ষাকাল, কিছুই করার যো ছিল না। পর দিন বেলা ৮টা ৯টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিয়া মা'কে ঘটনাটী বলেন।

এক দিন সত্যগোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাগলপুরী চাদর গায়ে দিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার এসবের প্রয়োজন নাই, এ হাড় মাংসের খাঁচার জন্য আবার কি?" এই সব বলিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় সোনাচরার মাঠ-ভরিয়া দৌড়াইলেন। সত্যগোপাল পিছনে পিছনে যাইয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। বহুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। পরে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়।

সত্যগোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেদের ন্যায় সত্য ও আকাশের ন্যায় অসীম মনে স্থির করিয়া, ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া "শ্রীগুরু-বেদাকাশ" বলিয়া ধ্বনি দিতেন। ঠাকুর অনেক সময় বলিতেন, "আর গোপন থাকা চলিল না, গোপালই সব প্রকাশ করিবে।" মা বলেন, "গোপালের গীত গাহিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সে যে বাড়ী হইতে 'মা, মা' বলিয়া গীতে টান দিত, তাহাতে শরীর ঝঙ্কার দিয়া উঠিত।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার খোল বাজনারও খুব প্রশংসা করিতেন, বাজনা খুব মধুর ছিল। সত্যগোপাল সব রকমের বাদ্যই জানিতেন। তাঁহার এমনি গুণ ছিল যে, কি পুরুষ কি মেয়ে যে দেখিত, সেই ভুলিত। তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা গোপাল সাজাইয়া ক্ষীর ননী খাওয়াইত। সত্যগোপাল মাঘীপূর্ণিমার দিন এক উৎসব করিতেন। পূর্ব্বদিন দেব-দেবীর পূজা করিতেন। বহু লোক নিয়া নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতেন। প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিয়া পরে নারায়ণগঞ্জের দিকে যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারও প্রণাম নিতেন না। এজন্য তিনি যখন আসিতেন, ঠাকুরকে অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতেন। একবার পূজার সময় সত্যগোপাল কতগুলি কুমড়া, কলা, কচু ইত্যাদি ঠাকুর বাড়ী পাঠান। যে এই সব নিয়া আসে, তাহাকে ফেরৎ নিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ বলাতেও যখন সে ফেরত নেয় না, তখন তিনি ঐ সব পুরোহিতদিগকে দিয়া ফেলেন। একটী জিনিষও নিজের বাড়ীর জন্য ব্যয় করেন নাই। পরে সত্যগোপাল বেশী সময়ই ধর্ম্মগঞ্জ থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মগঞ্জে

পৃষ্ঠাঘাত ব্যারাম হয় তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় আরোগ্যোন্মুখ হইয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আর বাঁচিবেন না তখনই তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমাকে দেওভোগ নিয়ে যা, আজই আমার শেষ। আমি জন্মভূমি পুণ্যক্ষেত্র দেওভোগ যাইয়া শ্রীশ্রীমা'কে দেখিয়া মরিব।" শিষ্যেরা তাঁহাকে নৌকাযোগে দেওভোগ নিয়া আসে। তখন বর্ষাকাল, দ্বিপ্রহরে বাড়ী পৌঁছিয়াই মা'কে নিতে নৌকা পাঠান। এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের প্রায় দশ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা তখন এই সংবাদ পাইয়া তথায় গেলেন। মা'কে দেখিয়াই গোপাল উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রণাম করিয়া এই ভাবে সব বলিতে লাগিলেন, যেন কোন ব্যারামই তাঁহার নাই। সত্যগোপাল বলিতে লাগিলেন, "মা আপনাকে দেখিয়াই আমার সব জ্বালা জুড়াইয়া গিয়াছে। আমি এখন খুব শান্তিতে আছি।" গোপালের এই ভাব দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। বধূ অনাহারে ছিলেন। মা তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তবুও খায় না দেখিয়া গোপাল বলিলেন, "কে খাইতে বলিতেছেন, শোন না !" এই কথা বলা মাত্রই তিনি খাইতে গেলেন। মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া আসার সময় তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।" মা'কে হেমেন্দ্র ও বৈকুণ্ঠ মজুমদার আনিতে গিয়াছিলেন, কাজেই তখন চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পরে আবার উহাদিগকে নিয়া মা তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, কিন্তু আর সম্মুখে যাইতে পারিলেন না, লোকে লোকারণ্য। রাত্রি ৮টা ৯টার সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তৎপূর্ব্বেই মা চলিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা হাতে ধরিয়া সত্যগোপালকে যাহা কিছু খাবার দিয়াছেন, তাহাই তিনি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে শত শত বার প্রণাম করিয়া খাইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার সত্যগোপালের বাড়ী গিয়াছেন, তাঁহার হাতে কেহ হরিলুটের বাতাসা প্রসাদ আনিয়া দিল। গোপাল দেখিয়াই তাঁহার হাত হইতে আনিয়া নিজেই খাইয়া ফেলিলেন।

সত্যগোপালের সঙ্গীরা তাঁহার নিন্দাবাদ করিত, তিনি তাহা-দিগকেও আদরে কোল দিতেন। তাঁহার ধৈর্য্য ও ক্ষমার তুলনা হয় না। লোকে ত্যক্ত করিবে, এই আশঙ্কায় সত্যগোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রকাশ করেন নাই, তিনি নিজের ভাব চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকদিগকে বলিয়াছেন, "বুড়া ঠাকুরকে যাইয়া দেখিয়া আয়।" ঠাকুরকে একবার দেখিলেই সব হয়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। যত ঝুকি নিজের ঘাড়ে নিয়াছেন, যত বিরক্তি নিজে সহ্য করিয়াছেন।

৺কালীকুমার ভৌমিক ঃ—

তিনি রতন ভৌমিকের পোষ্যপুত্র, গ্রামের মধ্যে তাঁহার অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল ছিল। তাঁহার বাড়ীতে দালান কোঠা ছিল। বর্ত্তমান শ্রীনাথ গুহের বাড়ীই তাঁহার বাড়ী

ছিল। তাঁহার চরিত্র দোষ যথেষ্ট ছিল। সর্ব্বপ্রকার মকার সাধন করিত। তাহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়া লোকের এক পয়সা পর্য্যন্তও ঋণ শোধ দেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। এবং তাঁহার নিকট নিজের সব অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি সর্ব্বদা জোড়-হাত হইয়া থাকিতেন। তাঁর কৃত কর্ম্মের অপরাধের জন্য জামার নীচে গলায় শিকল পড়িতেন।

এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর পিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া উলঙ্গ হইয়া বলিতেছিলেন, "অহং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম, যার ইচ্ছা পরীক্ষা কর। আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমার আজ্ঞায় স্বীয় কর্ম্ম করিতেছে।" কালীকুমার ভৌমিক ইহা শুনিয়া গলবস্ত্র হইয়া জোড় হাতে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাহারও সঙ্গে এক ঘরে বসিয়া কখনও খান নাই, কিন্তু কালীকুমার ভৌমিকের সঙ্গে এক ঘরে বসিয়া খাইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'কে প্রণাম করিতেন। ব্রহ্মময়ী ও ব্রহ্মরূপে স্তব করিতেন। জ্ঞাতি সম্পর্কে কালীকুমার মা'র ভাই ছিলেন, বয়সেও বড় ছিলেন। মা'র পিতা কালীকুমারকে পোষ্য আনিয়া দেন। হরপ্রসন্ন বাবু আসিবার পূর্ব্বে কালীকুমার ভৌমিক এখানে আসেন। যে দিন হরপ্রসন্নবাবু না খাইয়া গড়াগড়ি করেন, সে দিন কালীকুমার ভৌমিকের স্ত্রী এখানে ছিলেন। সত্যগোপালের পর তিনি ঠাকুরবাড়ী আসিতে থাকেন। মা সম্পর্কে ছোট বোন, কিন্তু 'মা, মা' বলিয়া স্তব করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া অধীর হইতেন।

৺তারাকান্ত গাঙ্গুলী ঃ—

তিনি নারায়ণগঞ্জে উকিল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বড় উকিল তখন নারায়ণগঞ্জে কেহ ছিলেন না। তারাকান্ত গাঙ্গুলী রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পিস্তুত ভগ্নীর ছেলে। তিনি চৌধুরী বাড়ী ছিলেন। এই বাড়ী ঠাকুর বাড়ীর উত্তরের পুকুরের পশ্চিম পার-সংলগ্ন। রামলক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর কেহ ছিল না। তারাকান্তকে অর্দ্ধ সম্পত্তি ও অন্য পিসতুত ভগ্নীর মেয়ের ছেলে প্রতাপ চাটুর্য্যে প্রভৃতিকে অর্দ্ধ দিবেন বলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন, কারণ তাহারা উহার ভরণপোষণ ও বৃদ্ধ বয়সে সেবা-যত্ন করিবে। তারাকান্তের নারায়ণগঞ্জেও বাসা ছিল। চৌধুরী বাড়ী থাকার সময় ঠাকুরের অনেক কথাবার্ত্তা তিনি শুনিয়াছিলেন। যখন সম্পত্তির লোভ ছাড়িয়া বাসায় চলিয়া যান, তখনও মাঝে মাঝে এখানে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সম্পত্তির লোভ ছাড়িয়া যাওয়ার কারণ এই যে, যদি ভরণপোষণের ভার নিয়া তাহার কোন ক্রুটী হয় তবে অন্যায় হইবে। এই পরের সম্পত্তি নেওয়াও দোষজনক মনে করিলেন। বাসায় যাওয়ার পরে ক্রমে ভোরে ও বৈকালে, দুই বেলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতেন। এরূপ আসা যাওয়াতেই তাঁহার ব্যবসায় নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ওকালতি ছাড়িয়াই দিলেন। এখানে ঘরে আসিয়া অতি অল্প সময়ই থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে মাঠে জঙ্গলে নৃত্য করিতেন। পরে সময় সময় তাঁহার বাসায়ও রাত্রিতে তিনি যাইতেন। তাঁহার

বাসায় যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবে আত্মহারা হইয়া সময় সময় কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিতেন। মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতেন। তখন আগুন জল কিছুই জ্ঞান থাকিত না। তাঁহাকে দেখিলে ঠাকুরের এমন ভাব হইত যে, বাহ্যজ্ঞান একেবারেই থাকিত না। কাপড় ফেলিয়া দিয়া আপন গায়ে আপনি আগুন লাগাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "তারাকান্ত আসিলে কাছে কাছে থাকিও, নতুবা প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে পারে।" তাঁহার বাসা হইতে আসিতে ঠাকুর কখনও জলে পড়িয়াছেন কখনও বা রক্তাক্ত কলেবরে কাপড় চোপড় ছিড়া অবস্থায় হাজির হইয়াছেন। এমন কি পৌষ মাসের শীতেও জল-জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিতেন না। তারাকান্ত বাবু যখন লক্ষ্মীনারায়ণজীউর আখরার নিকট আসিয়া গানে টান দিতেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে অস্থির হইতেন— পাগল-প্রায় হইতেন, আগুন ধরিতে যাইতেন, এটা করিতেন ওটা করিতেন, যাহাতে সমাধি না আসিতে পারে। ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কান্না; মাটীতে গড়াগড়ি, আরও কত কি করিতেন। মা'ও কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া নিকটে বসিতেন। ঠাকুরের আর কাহারও গানে বা কাহারও সহিত আলাপে এরূপ হইতে দেখা যায় নাই। যখন মাঠে, জঙ্গলে যাইতেন, তখন কোন কোন দিন জগবন্ধু ভৌমিক মহাশয় সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারা জঙ্গলে যাইয়া কি করেন তাহা জানিবার জন্য মা এক দিন ঠাকুরের ভাগিনেয় লেছড়াকে পাঠান,সে দেখিয়া আসিয়া

বলিল যে, সেকলালের বাগের জঙ্গলে তারাকান্ত গাঙ্গুলী শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজা করিতেছেন, তিনি বঙ্কিমঠামে দাঁড়ান। এই দুই জনকে অনেক সময় ভূঞাদের বলাকিদাসের বাগে নৃত্য করিতে দেখা গিয়াছে। কোন জঙ্গলে বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। গরীব মেয়ে-ছেলে কোন সময় লাক্ড়ী কুড়াইতে গিয়া ভয়ে পলাইতে উদ্যত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর 'মা, মা', বলিয়া ডাকিয়া বলিয়াছেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আপনার কাজ করুন, আমি আপনাদের পাহাড়ায় আছি।" কোন সময় বা জ্ঞানশূন্য হইয়া জল-জঙ্গল ভেদ না করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতে শরীর ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়িয়া কাপড় ভিজিয়া যাইত, ভ্রূক্ষেপ কিছুই নাই, স্থাবর জঙ্গম কিছুই বোধ থাকিত না। কোন মেয়ে-ছেলে জল আনিতে যাইয়া এরূপ ভাব দেখিয়া ভীত হইলে অম্‌নি 'মা, মা', বলিয়া অভয় দিয়া বলিতেন, "কোন ভয় নাই, আপনারা আপনাদের কাজ করুন।" জগবন্ধু দাস বলেন সে "এক দিন ঠাকুর ও তারাকান্ত গাঙ্গুলীকে মাসডাইর গ্রামের জঙ্গল হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। রাজকিশোর দত্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিল, "আপনি কি হরিসভায় গিয়াছিলেন ? না যাইবেন ?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "হরিসভা! কোথায় ? কি হরিসভা ?" এই বলিতে বলিতে ভাবগ্রস্ত হইয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া গেলেন। রাজকিশোর দত্ত ত একেবারে অপ্রস্তুত। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর চলিয়া গেলেন,তাহারাও চলিয়া গেল।

এক দিন রাত্রিতে শয়নের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিলেন, "ভোরে কিন্তু তামাক খাইতে ডাকিও না। আমি তামাক টামাক খাইব না।" তিনি ভোরে তিন বার তিন ছিলিম তামাক খাইয়া বিছানা হইতে উঠিতেন। পরের দিন মা আর তামাক সাজিয়া দিলেন না। তিনি কোন শব্দ না করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রাতে বেলা ৮টার সময় তারাকান্ত বাবু আসিয়া বাহিরে সিড়ির নিকট দাঁড়াইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, বলিয়া আমাকে চুলে ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ফেলে দে।" এইরূপ তিন বার বলিলেন। কিন্তু তারাকান্ত বাবু কিছুই না করিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐরূপ করিতে না পারায়, শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় বলি-লেন, "পার্লিনারে, পার্লিনারে, পার্লিনারে।" তারাকান্ত বাবু বলিলেন, "এখন ফেলি ?" তিনি বলিলেন, "এখন ফেলিলে আর কিছু হইবে না।" তারাকান্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপে বাহিরে ফেলিলে কি হইত ?" তিনি বলিলেন, "তাহাতে আমার দেহত্যাগ হইত, আর তুমিও আমাকে মারিবার দরুণ পাগল হইতে, কিন্তু পরে মুক্ত হইয়া যাইতে।" এই ঘটনার সময় মা ঐ ঘরেই ঝাপের আড়ালে দাঁড়ান ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কতক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলেন, তখনও প্রায় আত্মহারা। তারপরে প্রায় দুপুর বেলায় দুইজনেই বাহির হইলেন। কিছুদিন এইরূপ চলিলে তারাকান্ত বাবু এক দিন বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট যান। সেই অবধি এখানকার সব

ভাব একেবারে কমিয়া গেল এবং বারদীর ব্রহ্মচারীর খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এই বলিয়া যে, তিনি অনেক আজগবী কাজ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মনে করিলেন, এক দিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন। তারাকান্ত বাবুর এখানকার ভাব একবারে চলিয়া গেলে আসা যাওয়াও বন্ধ হইল। সব কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি মনে করিলেন, সংসারে থাকিবেন না। কিছুদিন পরে সস্ত্রীক কাশী চলিয়া গেলেন। সেখানেও তাঁহাদের কয়েকটী ছেলে পেলে হয়। তাঁহার ছেলেপেলেরা উপযুক্ত। তিনি কাশীতে বাড়ী ঘর করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার ছেলেপেলে হয় তখন তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী বেশে থাকিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল কাশীবাসের পর একবার তিনি দেওভোগ আসেন। এক দিন রাত্রিতে ঠাকুরের নিকট আসিলে কথায় কথায় নটবর বাবুর সঙ্গে তাহার তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে ঠাকুরকে ইঙ্গিতে কিছু বলিলে নটবর বাবু তাঁহাকে কিছু প্রহার করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা নটবরকে ধরিয়া থামাইতে পারেন না। ঐ সময় মা'র শাখাতে আঘাত লাগিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। তারাকান্ত বাবু বাড়ীতে যাইয়া মাসীমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাসীমা, আজ একটা উল্কাপাত হইয়া গেল। এসব কাণ্ড দেখিয়া স্বর্গের ঋষিরা সব নামিয়া পড়িতেছেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তারাকান্ত বাবু একবার এখানে আসিয়া মা'কে বলেন, "এখানে কেন রহিলে? কাশীতে

কেন গেলে না ? তুমি সংসারেই পড়িয়া রহিলে। আমার স্ত্রী খুব উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন।" যখন তারাকান্ত এখানে সর্ব্বদা আসিতেন, তখন তাঁহার স্ত্রীকে ভালবাসিতেন না, কথাবার্ত্তা শুনিতেন না, তাঁহার মত মত চলিতেন না। তখন তিনি মা'কে ব্রহ্মময়ী বলিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতেন।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার ঃ—

দেওভোগ নিবাসী কেদারেশ্বর মজুমদার মহাশয় ঠাকুরের বাল্য খেলার সাথী। তিনি ঢাকা বাবুরবাজার চৌধুরীদের বেনে দোকানে কাজ করিতেন। হরপ্রসন্ন বাবুর বাসা নিকটেই ছিল। হরপ্রসন্ন বাবু তখন ঢাকা কালেক্টরীতে পেশকার ছিলেন ও বলদার জমিদারের ছেলেকে পড়াইতেন। তাঁহাকে সকলেই মাষ্টার মাষ্টার বলিত। হরপ্রসন্ন বাবু মজুমদার মহাশয়ের নিকট ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেক সময় দেখিতে আসিতে ইচ্ছা করিতেন। মজুমদার মহাশয়ও বাড়ী আসিলেই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতেন এবং বলিতেন, "মাষ্টার মহাশয় আপনাকে দেখিতে আসিবেন।" হরপ্রসন্ন বাবু দোলের সময় এক দিন কয়েকজন লোক সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী আসিলেন। কিছু-দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই সেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকেই জলযোগ করাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই খাইলেন না। কেবল ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি হাতে দেন।" এইরূপ অনেক

পীড়াপীড়ির পর শ্রীশ্রীঠাকুর সামান্য কিছু হাতে তুলিয়া দিলেন। শুধু ঐটুকুই খাইয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় হরপ্রসন্ন বাবু মাতাঠাকুরাণীকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, সাধু পুরুষের আবার স্ত্রী কেন? শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার মনের ভাব জানিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, কেন, দোষ কি? মা অন্নপূর্ণা খাবার যোগার করিয়া দিতেছেন।" এই হরপ্রসন্ন-বাবুর প্রথম সাক্ষাতকার। শেষে বলিয়াছেন, "কিরূপই দেখিলাম। কেন আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিলাম?"

ইহার পরে জ্যৈষ্ঠমাসে পুনরায় আসিয়া মণ্ডপে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিমের ঘরে ও শ্রীশ্রীমা পূর্ব্বের ঘরে। মা ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, কিন্তু হরপ্রসন্ন বাবুকে দেখিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু ঘরে ঢুকিয়া মা'কে প্রণাম করিতে গেলে মা ঝাপ দিলেন। ইহাতে হরপ্রসন্ন বাবুর হাতে একটু লাগিল। মা অমনি জিহ্বায় কামড় দিয়া লজ্জায় বসিয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুর আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় হরপ্রসন্ন বাবু ঢাকা চলিয়া গেলেন।

হরপ্রসন্ন বাবু পুনরায় আশ্বিন মাসে বধূ ও পুত্র সহ এখানে আসেন। ছেলের বয়স ২।৩ বৎসর। পরের দিন ভোরে চলিয়া যান। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে খাওয়াইয়া নিজে না খাইয়া পূজার চাউল তৈয়ার করিতে চৌধুরী বাড়ী গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে ডাকিয়া আনিলেন যে তাঁহারা আসিয়াছেন,

এবং মাছ, দুধ ইত্যাদি আনিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বাজারে গেলেন। তাঁহারা জল খাইয়া মজুমদার বাড়ী দেখা করিতে গেলেন। মা'র জন্য এক জোড়া শাঁখা ও এক থান সিন্দুর আনিয়াছিলেন। মা রাখিতে চান নাই, ঠাকুরও রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন। অবশেষে যখন মা কিছুতেই রাখিতে রাজী হইলেন না, তখন তাঁহারা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ৺দুর্গাপূজার সময় ভোরে আসিয়া বৈকালেই চলিয়া যান। তার পর কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতা কালীপূজা উপলক্ষে মজুমদার বাড়ী পূজা দেখিতে আসেন। রাত্রিতে মা, দিদি, মা'র ভাগিনী, ননদিনী, মা'র জ্যেঠতুত ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সত্যগোপালের বাড়ী কালীপূজা দেখিতে গমন করেন। তখন কেদারেশ্বর মজুমদার ও হরপ্রসন্ন বাবু সত্যগোপালের বাড়ীতে ছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে মা সকলকে নিয়া তাহাদের বাড়ীও পূজা দেখিতে গেলেন। যাওয়ার সময় হরপ্রসন্ন বাবুর হাতে লণ্ঠন ছিল। মা যে যে দিক দিয়া যান সেই দিক দিয়াই বাতি রাখিতে লাগিলেন। মজুমদার বাড়ীর প্রতিমা দেখার সময় বাড়ী হইতে মা সংবাদ পাইলেন যে, কৈলাস দাস বেদনায় অস্থির। এই সংবাদে সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিতে লাগিলেন। মা আস্তে আস্তে আসিতে ছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু পিছনে পিছনে বাতি নিয়া গেলেন এবং তিনি কৈলাস দাস মহাশয়কে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় সত্যগোপাল সংকীর্ত্তন নিয়া আসিলেন। রাত্রেই হরপ্রসন্ন বাবু মজুমদার-বাড়ী চলিয়া

গেলেন। হরপ্রসন্ন বাবু পর দিন বৈকালে এখানে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বাজারে যাইয়া মৎস্য, দুগ্ধ ও ক্ষীর নিয়া আসিলেন। রান্না হইলে ঠাঁই করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীমা ভাতের থালা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু হরপ্রসন্ন বাবু কিছুতেই বসিলেন না। মা ঠাকুরকে একথা বলিলেন এবং থালা আনিয়া রাখিয়া দিলেন। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন সেখানেই খাবার জায়গা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মণ্ডপে যাইয়া তাঁহাকে খাইতে বলিতেই ঠাকুরকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাটীতে গড়াগড়ি। তিনি অপ্রস্তুত হইয়া মা'কে ডাকিলেন। মা আসিবা মাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া গড়াগড়ি, আর কান্না। ইহা দেখিয়া মা'র ভগিনী ও ননদিনী যাইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া আনিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে হরপ্রসন্ন বাবু শান্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে খাবার থালা দেওয়া হইল। তাহাতে কিছুতেই হাত দিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। মা তাহাই করিলেন; কিছু ভাত, দুগ্ধ ও ক্ষীর মাখিয়া মুখে দিলেন। কিন্তু দুই একবারের বেশী মুখে লইলেন না। রাত্রিতে শুইয়া রহিলেন। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে তামাক দিতে বলিলে, শ্রীশ্রীমা তামাক নিয়া গেলেন। তিনি হুঁকা না ধরিয়া একখানা ভাগলপুরী ও একখানা গামছা মা'র পায়ে দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মা পা টানিয়া নিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনিও চলিয়া গেলেন।

কার্ত্তিক মাসে হরপ্রসন্ন বাবু বধূ নিয়া আসেন। তৎপর

ঢাকা হইতে প্রত্যেক্ শনিবারই আসিতে লাগিলেন। রবিবার থাকিয়া সোমবার চলিয়া যাইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোজেশ্বর হইয়া কলিকাতা যাইবেন। মা হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিয়া যাইতে বলিলেন। তখন তিনি বাড়ী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হরপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী গেলেন। সেখানে এক দিন ছিলেন। তাঁহার বধূর ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া বাজার হইতে দুই জোড়া কাপড় কিনিয়া দিয়া আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় শরৎ বাবুর বাড়ীও যান। তখন শরৎ বাবু বাড়ী ছিলেন। সেখানেও ঠাকুর একটু খরচপত্র করেন। দুই বাড়ীতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের স্ত্রীদের হাতে খান। সেখান হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। হাতে অল্প কয়েকটী পয়সা ছিল। নদীর পার আসিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আকাশে খুব মেঘ সাজিয়াছে, ঘাটে একখানা নৌকা পাড়া দিয়া মাঝি বাড়ী রওনা হইয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু পয়সা দিয়া রাত্রিখানা ঐ নৌকায় থাকিতে চাহিলেন। প্রথমে মাঝি অস্বীকার করিলে তিনি মনে করিলেন, গাছ তলায়ই থাকিতে হইবে। এমন সময় মাঝি ফিরিয়া আসিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নিয়া তাঁহাকে নৌকায় স্থান দিল। শ্রীশ্রীঠাকুর পয়সা অভাবে এ যাত্রায় হাটিয়াই কলিকাতা গেলেন।

• হরপ্রসন্ন বাবু এখানে আসিয়া উঠিতে, বসিতে ও খাইতে সব সময়ই গান করিতেন এবং ভাগবৎ পাঠ করিতেন। সব গানই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'কে লক্ষ্য করিয়া হইত। প্রত্যেক

কার্য্য নিয়াই গান, কোন বাঁধা গদ নাই। প্রত্যেক অনুভূতি হইতেই গান। সময়ে এমন হইত যে গানের এক পদ নিয়াই রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। এমন ভাব হইত যে, বাজাইতে বাজাইতে হাত ও হাঁটু দিয়া রক্ত পড়িত, ভ্রূক্ষেপ নাই। এক পদ সারা রাত্রি ধরিয়া গাইতে দেখিয়া বাহিরের লোক বিরক্ত হইয়া চলিয়াও যাইত। কিন্তু যাহারা থাকিত তাহারা ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইত। তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে যেখানে সেখানে পড়িয়া যাইতেন। সব সময়ই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এই অবস্থার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "হরপ্রসন্ন পূর্ব্ববঙ্গের সেরা।" তাহার একটা লাগা ভগবৎ ভোগ ছিল। এক দিন পলসাইর পুকুরে স্নান করিতে যাইয়া পারে পড়িয়া থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে যাইয়া আনিতে বলেন। মা নিয়া আসেন। সেই হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিলেন, "উহাকে বাড়ীতে জল আনিয়া স্নান করাইও।" মা পাক বসাইলে, কোন দিন মা'র পিঠে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিঠ ভাসাইয়া দিতেন। কোন দিন বা ঘর ভরিয়া নাচিতেন ও গান করিতেন। কোন দিন বা আফিসে চলিয়াছেন, মা'কে প্রণাম করিয়া ওখানেই কাঁদিতে কাঁদিতে বিভোর; আর আফিসে যাওয়া হয় নাই। সারা দিন গান গাহিয়াছেন আর প্রাঙ্গন ভরিয়া নাচিয়াছেন। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও হরপ্রসন্ন বাবু মণ্ডপে বসা, মা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তামাক সাজিয়া নিয়াছেন, হরপ্রসন্ন বাবু নিজে খাওয়ার জন্য হুঁকা নিলেন। মা ছাড়িয়া দিলেন,

তাঁহার হাত হইতে হুকা পড়িয়া গেল। শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হইয়া দক্ষিণের ঘরে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। তখন হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী. মা'র ভগিনী ও ঠা'ন্‌দিদি এবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দক্ষিণের ঘরে ছিলেন। কতক্ষণ পরে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও হরপ্রসন্ন বাবু ঐ ঘরে আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নানারূপ ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া টীকা খাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং বিনাজলে আচমনের মত করিতে লাগিলেন ও নানারূপ বলিতে লাগিলেন। এই সব দেখিবার জন্য মা তাঁহার ছোট ভগিনীকে দিয়া নটবর বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইহাতে হরপ্রসন্ন বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং লাফ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের খারা কোলে উঠিয়াই গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। "আমার সঙ্গে হট্ করিস্ না, তুই আমার সঙ্গে কিছুতেই পার্‌বি না, জানিস্ আমি কার ছেলে?" অর্থাৎ গানের পদ নটবর বাবুকে জব্দ করা এবং ঠাকুর তাঁহারই, নটবর কিছুই না। তখন শ্রীশ্রীমা রাগ করিয়া মাটীতে তিনবার থাপর দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই নটবরও এক দিন রাজত্ব করিয়া খাইবে।" নটবর আসিয়া শ্রীশ্রীমা'র কোলে উঠিলেই হরপ্রসন্ন বাবু পুনরায় ঐরূপ গান করিতে করিতে ঠাকুরের কোল হইতে নামিয়া দৌড় দিয়া মণ্ডপে গেলেন। নটবর বাবুও কোল হইতে নামিয়া ঐ ঘরেই রহিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু মণ্ডপে গিয়া কেবল ছুটাছুটি ও নানারূপ বকাবকি আরম্ভ করিলেন। এই সব দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে শীঘ্র আসিতে বলিলেন। মা আসিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, ও কেমন

করিতেছে—উহাকে ধর। মা'কে ধরিতে ডাকিয়া নানারূপ বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি এরূপ কেন কর!" শ্রীশ্রীমা দরজার নিকট যাওয়া মাত্রই এদিক ওদিক খুঁজিয়া কিছু না পাইয়া খুব বড় একটা বালিশ দিয়া মা'র মাথায় পাঁচ সাতটা বাড়ি দিলেন। বাড়ি খাইয়াও মা যাইয়া তাহাকে ধরিলেন এবং কোলে করিয়া বসিলেন। ঘরে লোকে লোকারণ্য। ঐ সময় নটবর বাবুও ওখানে ছিলেন। নটবর বাবু ও অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। মা তৈল দিয়া দিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু ও নটবর বাবু উভয়ে স্নান করিতে গেলেন। সেই দিন সোমবার, বধূকে রাখিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া হরপ্রসন্ন বাবু কাছারীতে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া দিলেন, "কাছারী হইতে এখানে আসিও।" সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে আসিয়া, পর দিন বধূকে নিয়া বাসায় গেলেন; যাইয়াই উন্মাদ। রাস্তা দিয়া লোক চলিলে মারিতে যান, লোক দেখিলে ডাকিয়া বলেন, "ভাল ছাড়া মন্দ নাই" এ ছাড়া আরও অনেক বলিতেন। জুতা পায় নাই, পিড়ান গায় নাই, কাছারীতে যান না। শ্বশুর খবর পাইয়া আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করিবার প্রস্তাব করায়, বধূ বলিলেন, "অন্য চিকিৎসার দরকার নাই, আমি তাঁহাকে দেওভোগ নিয়া যাইব।" পর দিন বধূ স্বামী ও ছেলে নিয়া এখানে আসিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন অস্পৃশ্যা, মণ্ডপের ধারে দাঁড়ান ছিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এবং হরপ্রসন্ন বাবুকে নগ্নপদে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খালি পা

কেন ?" হরপ্রসন্ন বাবু বলিতে লাগিলেন, "জুতা মুখে," "জুতা মুখে।" হাতে এক ঠোঙ্গা অমৃতি ছিল। তাহা দাদার নিকট দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বধূ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আত্মোপান্ত বলিলে, তিনি বলিলেন, "আনিয়া ভাল করিয়াছেন, ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলে ইনি আর ভাল হইতেন না।" শ্রীশ্রীঠাকুর দুগ্ধাদি পথ্য ও যাহা প্রয়োজন,তাহার যথেষ্ট ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এমন অবস্থা যে নাম পর্য্যন্ত ভুল। ছুটির দরখাস্ত পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে ধরিয়া ছেলেপেলেকে যেরূপ লেখান হয় সেইভাবে দরখাস্ত লিখাইয়া আফিসে পাঠাইলেন। লিখিয়া নাম দস্তখত করিতে চাহেন না; ঠাকুর ধমক দিয়া, মারার ভয় দেখাইয়া হাতে ধরিয়া লিখাইলেন। পনর দিনের বিদায় নেওয়া হইল। এই সময়ের মধ্যেই সম্যক্ আরোগ্য লাভ করিলেন। কাপড় পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল না, মা'কে কিম্বা তাঁহার বধূকে খাওয়াইয়া দিতে হইয়াছে। এক দিন জিহ্বায় কামড় দিয়া কালী হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ধমক দিয়া বলিলেন, "এরূপ করিলে মারিব।" সর্ব্বদা তিনি তাঁহাকে নিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর উপদেশ দিতেন, ইহাতেই রোগ সারিয়া গেল। তিনি তাঁহাকে নিয়া বাসায় পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। পূর্ব্ব দিন বৈকালে যাইয়া ঢাকায় থাকেন,পর দিন খাওয়া দাওয়া করিয়া বৈকালে আসেন।

হরপ্রসন্ন বাবু পাগল হইবার পূর্ব্বে শনিবার হইলেই সকলে আনন্দে উৎসুক হইয়া থাকিতেন যে, হরপ্রসন্ন বাবু কতক্ষণে

আসিবেন। বর্ষাকালে কৈলাস দাস মহাশয় তাঁহার নৌকা, চাকর ৺লক্ষ্মীনারায়ণের আখড়ার নিকট পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহাকে আনিবার জন্য। পরে আবার দিয়া আসা হইত। তাঁহার নৌকা চাকর সব সময়ই একাজ করিত। হরপ্রসন্ন বাবু আসিলে তুমুল গান হইত, রাত্রিদিন ভেদ থাকিত না।

পাগল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন মা রান্নাঘরে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও হরপ্রসন্ন বাবু উঠানে সিড়ির নিকটে। শ্রীশ্রীমা কথায় কথায় বলিয়াছেন, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" অন্যান্য কথাও হইতেছিল। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "আমি দুই বৎসরের শিশু হইয়া মা'র কোলে উঠি।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি কি শক্তি রাখ যে, দুই বৎসরের শিশু হবে? এ তোমার গুণে নয়।" অন্যান্য আরও অনেক কথার পর মা কাঁদিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বিনীতভাবে অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কাঁদিও না। তুমি কাঁদিলে উহার অমঙ্গল হইবে।" মা কান্না থামাইলেন।

হরপ্রসন্ন বাবু তখন থেকে কম আসিতে থাকেন। এক দিন ৺জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বহু লোক খাওয়া দাওয়া করিয়াছেন; আরতি, পূজা ও গান শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমা উপবাসী, শ্রীশ্রীঠাকুরও উপবাসী। হরপ্রসন্ন বাবুকে খাইতে বলা হইল; তিনি বলিলেন, "আমি এ পাক খাইব না।" তখন তাঁহার এরূপ অবস্থা ছিল যে, এ ঘরের ভাত

ও ঘরে নিলে বা কেহ দেখিলে খাওয়া হইত না। মা এত রাত্রিতে তাঁহার জন্য রান্না করিতে চৌধুরী বাড়ী গেলেন; কারণ তখনও পাকের ঘর লেপা হয় নাই। রান্না হইতে অনেক রাত্রি হইল। তাহাকে খাইতে বলায় তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ না হইলে খাইব না।" ইহা নিয়া অনেক সাধাসাধি হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া খাইবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরও কোন দিন কাহাকেও প্রসাদ দেন নাই। মা'কে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার পাতেও না খায়। তাঁর জন্য পাক করা হইয়াছে, তিনি খাইবেন না। এ কেমন ব্যাপার। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা অনেক তোষামোদ করিলে তিনি গেলেন এবং আসনে বসিলেন। ঐ চৌধুরী বাড়ীই যায়গা করা হইয়াছিল। যাহা পাক করা হইয়াছিল সব দেওয়া হইল। তিনি আসনে বসিয়া একেবারে ভাবে বিভোর, সমস্ত একত্র মাখিয়া লইলেন দুই একবার মুখেও দিলেন। পরে হরপ্রসন্ন বাবুকে প্রসাদ নিতে ডাকিলেন, তিনি তখনও গেলেন না, তিনি উঠিয়া আসিলেন। পরে মা অনেক বলায় হরপ্রসন্ন বাবু খাইতে গেলেন এবং সামান্য খাইলেন।

পাগল হইবার পূর্ব্বে, শ্রীশ্রীমা হয়ত হাটিয়া চলিয়াছেন, হরপ্রসন্ন বাবু দৌড়িয়া যাইয়া কোলে উঠিলেন এবং 'মা, মা' বলিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। এইরূপ কোলে উঠিতে দেখিয়া ঠাকুরদাদার মন কেমন হইত। তখন হরপ্রসন্ন বাবু হাসিয়া বলিতেন, "আয় বুড়ো (ঠাকুরের বাপ) তুইও মা'র কোলে

আয়” কোন সময় বা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, “আয় ঠাকুরদাদা, মার কোলে আয়, আয় আমাদের সঙ্গে নাচ এসে।” এক দিন আনিয়া দাদাকে উঠানে নাচাইয়াও ছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু সর্ব্বদা এইরূপে মা'র কোলে উঠিতেন, নটবর বাবুও কখন কখন উঠিতেন, ইহা দেখিয়া দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “উহারা এইরূপ কোলে কাখে উঠে কেন?” তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “উহারা কি ভাবে তাহা আপনি কি জানেন? ইহারা কি মানুষ জ্ঞান করে? সাক্ষাৎ ভগবতী পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী মনে করে। যদি ইহার ভিতর এক-বিন্দু বিকারের গন্ধ থাকিত, আমি কখনই তাহাকে নিয়া ঘর করিতাম না।” এরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, “ইহাদের চিঠিপত্র পড়িয়া দেখেন, কি ভাব, কি লিখে।” তখনও মা হরপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে কথা বলিতেন না।

হরপ্রসন্ন বাবু পাগল হওয়ার পর যখন কম আসিতেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিতেন, হরপ্রসন্ন “আসা যাওয়া যেন বন্ধ না করে, এবং সর্ব্বদা যেন আসে, বলিয়া দিও।” মা বলিতেন, “আপনি বলেন না কেন?” তিনি বলিতেন, “তুমিই বলিও।” একবার হরপ্রসন্ন বাবুর বধূ এখানে ছিলেন, তিনি ঢাকায় এক আখড়ায় খাইতেন, সেই সময় হইতেই ভাবের একটু একটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। কথাবার্ত্তাও অন্যরূপ বলিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, সবখানে খাওয়া ভাল নয়, এবং তাহার পক্ষে পুরাণাদি কিম্বা অন্য ধর্ম্মপুস্তক পড়াও উচিত

নয়, পড়িলে তাহার বিশ্বাস অন্যরূপ হইয়া যাইবে।" শ্রীশ্রী-ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবেও তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু আসিলে তিনি এক দিনও দুধ না আনিয়া ছাড়েন নাই রাত্রি দশটা হইলেও নিজে যাইয়া দুধ আনিতেন। ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের পর এক দিন ঢাকা যাইবেন বলিয়া হরপ্রসন্ন বাবু, পার্ব্বতী মিত্র ও অন্নদা ঠাকুর খাইতে বসিয়াছেন। অন্নদা ঠাকুর পাক করিয়াছিলেন; তিনিও বাড়ী যাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিলেন, "দুধ যে দুই সের আছে তাহা হরপ্রসন্ন ও অন্নদাকে দাও।" মা বলিলেন, "আমি এরূপ দিতে পারিব না, তিন জন বসিয়াছেন দুই জনকে কি ভাবে দিব? তখন তিনি নিজে যাইয়া বেশীভাগ হরপ্রসন্নকে ও অবশিষ্ট অন্নদাকে দিলেন। হরপ্রসন্ন বাবুকে দেখিলে মা নিজেই দুধের ঘটি নিয়া বাহির হইতেন; কারণ কথায় কথায় রাত্রি বেশী হইয়া পড়িলেও তিনি দুধ না আনিয়া ছাড়িবেন না। এক দিন মা গোয়ালবাড়ী দুধ পান নাই জানিয়া, রাত্রে তিনি গোয়ালবাড়ী যাইয়া গোয়ালাকে দিয়া গাই দোহাইয়া দুগ্ধ আনেন।

একবার মা, মা'র বোন, নটবর বাবু ও কৈলাস দাস হরপ্রসন্ন বাবুর ঢাকার বাসায় গিয়াছিলেন। জগবন্ধু ভৌমিকও খাওয়া দাওয়া করিয়া তথায় পরে যান। তাঁহারা এক দিন থাকিয়া ঢাকেশ্বরী বাড়ী দর্শন করিয়া পর দিন খাওয়া দাওয়ার পর চলিয়া আসেন। হরপ্রসন্ন বাবু মা'কে আদর যত্ন করিতে ব্যস্ত। কিছু খরচপত্র হইতেছে দেখিয়া তাহার বধূর যেন

বিষম লাগিতেছিল। কারণ তাহার ভাই, মা, ঠাকুরমা, ইত্যাদির জন্য হরপ্রসন্ন বাবু কিছুই করেন না, তাঁহারা আসিলে ভাল খাবার ইত্যাদি আনা হয় না, অথচ মা'র জন্য সবই করিতেছেন। আসার সময় হরপ্রসন্ন বাবু তাঁহার বধূ ও ছেলে সঙ্গে আসিল। মা ও অন্যান্য সকলেই যেন কেমন হইয়া গেলেন, ক্ষণে হাসেন, ক্ষণে কান্দেন, একেবারে উল্টা সব।

হরপ্রসন্ন বাবু নটবর বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা ঈর্ষ্যা করিতেন, ঈর্ষ্যা অন্য কিছু নিয়া নয়, বুঝি মা নটবর বাবুকে বেশী ভালবাসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাহার দিকে চাহিয়া একটু কথা বলিলেন, তাহা নিয়া মন কষাকষি করিতেন। এই সব দেখিয়া মা সর্ব্বদা বুঝাইতেন, যার একটী ছেলে আছে তার আর একটী ছেলে হইলে সে কি পূর্ব্বের ছেলেকে কম ভালবাসে ? ইত্যাদি। কিন্তু হরপ্রসন্ন বাবু কিছুতেই প্রবোধ মানিতেন না। একটু বেশকম হইলেই পাকের ঘরে আসিয়া কান্না জুড়িয়া দিতেন। কখনও বা কথা বন্ধ করিতেন, কখনও বা শুইয়া থাকিতেন, কখনও বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নানারূপ অশান্তি ভোগ করিতেন।

একবার ৺দুর্গাপূজার পর ৺লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে হরপ্রসন্ন বাবু মা'র নিকট পাঁচ টাকা দেন, মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "ফিরাইয়া দেও।" হরপ্রসন্ন বাবুর বাসায় যাওয়ার সময় মা টাকা দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিতে চাহিলেন না। মা পকেটে দিয়া দিলেন, তিনি রাগ করিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। হরপ্রসন্ন বাবুর শ্বশুর

শাশুড়ী বলিতেন, "সমস্ত টাকা ঠাকুরকেই দেয়।"

হরপ্রসন্ন বাবু এই বৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে এখানেই থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের চারি দিন পূর্ব্বে তিনি ঢাকা চলিয়া যান। যাওয়ার সময় তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ, কখন কি হয়। মা যাইতে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই না শুনিয়া চলিয়া গেলেন। মা বলিলেন, খালিবাড়ী কোন বিপদ হইলে আমি একা কি করিব? হরপ্রসন্ন বাবু চলিয়া যাওয়া মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের কেমন ভাবান্তর হইল। মা ষ্টেশনে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় ফিরিলেন না! ফিরিলেন দৈবগতিকে। গাড়ী ফেল হওয়ায় নটবর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্বশুরকে নিয়া রাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আবার অতিথির জন্য ভিন্ন পাকের ও থাকার বন্দোবস্ত করিতে হইল। পরের দিন তাহারা ঢাকায় চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ সময়টা তাঁহার উপর একটুকু বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেন থাকিলেও ক্ষতি নাই গেলেও ক্ষতি নাই। যে দিন অতি প্রত্যুষে শ্রীশ্রীঠাকুর লীলা সংস্বরণ করেন, হরপ্রসন্ন বাবু সেই দিন বৈকালে আসেন। পর দিন হরপ্রসন্ন বাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, সকলের কথায় বিশেষতঃ শরৎ বাবুর অনুরোধে এক মাস থাকেন। শরৎ বাবু বলিলেন "আমি চলিয়া যাইব, তুমি থাক।"

হরপ্রসন্ন বাবু একদিন শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন "ওহে ভায়া আমাদের অদৃষ্ট ভাল। আমাদিগকে উদ্ধার করিবার

জন্যই তিনি নর শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দয়াতেই আমরা এজন্মে অভয়ের পারে চলিয়া যাইব।"

হরপ্রসন্ন বাবু বলেন,—যে বার শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বাড়ী ও শরৎবাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন, সেইবার ভোজেশ্বর পালদের বাড়ীও যান। তাঁহারা তাঁহাকে আটটি টাকা ও একখানা কম্বল দেন। ষ্টেশনে পৌঁছিতেই এক ভিখারিণী তিন চারিটি সন্তান সহ তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাদের দুরবস্থার ও অনাহারের কথা কাঁদিয়া বলে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই টাকা ও কম্বল ঐ ভিক্ষারিণীকে দিয়া ফেলেন, সঙ্গে কেবল কয়েকটি পয়সা রহিল। খরচ অভাবে তিনি সেই যাত্রায় হাটিয়াই কলিকাতা গিয়াছিলেন।

একবার সত্যগাপাল সংকীর্ত্তন সহ ঠাকুর বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, শ্রী শ্রীঠাকুর যাইয়া জোড় হাতে বাড়ীর বায়ু-কোণে দাঁড়াইলেন এবং কীর্ত্তন নিকটে আসিতে না আসিতেই, উপুড় হইয়া পড়িয়া পথের ধূলা বালি সব গায়ে মাথায় দিতে লাগিলেন—ভাবে একেবারে বিভোর। ধূলিকণায়ও যেন ব্রহ্ম অনুভাব করিতে লাগিলেন। কোন ভগবৎ প্রসঙ্গ হইলেই তিনি ভাবে চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিয়া কেমন হইয়া যাইতেন, জ্বলন্ত আগুনে পর্য্যন্ত হাত দিতেন; হাত পুড়িয়া যাইবে সে খেয়াল পর্য্যন্ত থাকিত না। হরপ্রসন্ন বাবু বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যাবধিই দেহাত্ম বুদ্ধি ছিলনা, তিনি জন্মিয়াই বিদেহী।

হরপ্রসন্ন বাবু তামাক খাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর

এক ছিলুম তামাক ,ভরিয়া আনিয়া বলিলেন, "তামাক খান," হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "তামাক ছাড়িয়া দিয়াছি।" তখন তিনি বলিলেন, "খান, একটা কিছু কু-অভ্যাস থাকা ভাল। তবেই কু-অভ্যাস নাই বলিয়া অহঙ্কার আসিতে পারিবে না। সে কু-অভ্যাস তামাক খাওয়াকে তিনি নির্দ্দেশ করিলেন। সেই অবধি হরপ্রসন্ন বাবু পুনরায় তামাক খাওয়া আরম্ভ করেন।

হরপ্রসন্ন বাবু বলেন, এক দিন ঘরামীরা কাজ করিতেছিল। তখন একটী সাপ মণ্ডপের সম্মুখে উঠান দিয়া যাইতে ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর মণ্ডপে বসা ছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবুও তথায় ছিলেন। এক মুসলমান ঘরামী সেই সাপটিকে যাইয়া লাঠি দ্বারা আঘাত করে। শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি উঠানে লাফাইয়া একেবারে সাপের উপর পড়িলেন, বোধ হইল যেন লাঠির আঘাত তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। ঘরামী ভয়ে কম্পিত ও অপ্রস্তুত। সাপটী আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন, এবং ঘটে, ঘটে যে ভগবান তাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

হরপ্রসন্ন বাবু ইহাও বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কতই না আদর যত্ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের নিকট কতই না আবদার করিয়াছেন, ত্যক্ত করিয়াছেন, যন্ত্রণা দিয়াছেন ; তবুও তাঁহাদের ভালবাসার অবধি ছিল না। তাঁহাদের ভালবাসা জগৎজোড়া। ইহা বলিয়াই আবার বলেন, "ঠাকুর আজন্ম কীট পতঙ্গ হইতে দেবতা সবই সমভাবে দেখিয়াছেন। ধূলিকণাতে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম অনুভব করিয়াছেন। গাছের

পাতা পর্য্যন্ত ছিড়িতে পারেন নাই। আর আমরা ত মানুষই, আমাদিগকে ভালবাসিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি। তিনি ভালবাসার খনি ছিলেন। ঐ ভালবাসায় আত্মহারা হইয়া বিভোর ও পাগল প্রায় থাকিতাম। সর্ব্বদা একটা বেহুসভাব থাকিত। যখন যাহা মনে উঠিত পাগলের মত তাহাই করিতাম। কখন বা নাচিতাম, কখন বা গাহিতাম, কখন বা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিতাম; কখন বা কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইতাম।"

এক দিন হরপ্রসন্ন বাবু উত্তেজিত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আপনি মা'র জন্য কি করিয়াছেন?" শ্রীশ্রীঠাকুর অতিশয় কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কি আছে? কি করিব? যদি বলেন তাহার জন্য এ দেহটি আগুনে জ্বালাইয়া দিতে পারি।"

হরপ্রসন্ন বাবু বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাকিয়া অতি বিনীতভাবে কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন, "আমার কি আছে? আপনাকে কি দিব? আমার এই মাত্র আছে যে, আজন্ম আমি পশুযোনীও মাতৃযোনীবৎ জ্ঞান করিয়াছি।" সেই কথা শুনা অবধি হরপ্রসন্ন বাবু আর স্ত্রী-সংসর্গ করেন নাই। তিনি বলেন, "তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ জীবন কোথাও দেখেন নাই।"

অম্বিকাচরণ বিশ্বাস ডেভিড কোম্পানীর বড় বাবু, মাঝে

মাঝে এখানে আসিতেন। এক দিন মণ্ডপ ভরা লোকের সম্মুখে তিনি বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা তুলিয়া নানারূপ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই বিষয় নিয়া পরস্পরের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। অম্বিকা বিশ্বাস কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরকে তুলনা করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে খাট করিতেছিলেন। এই সময় হরপ্রসন্ন বাবু মা'র নিকট পাকের ঘরে আসিলে, মা বলিলেন, "এখানে বসিয়া তোমরা তাঁহার নিন্দা শুন।" ইহা বলা মাত্রই হরপ্রসন্ন বাবু যাইয়া অম্বিকা বাবুকে কয়েক ঘা বসাইয়া দিলেন। অম্বিকা বাবু তখন বলিতে লাগিলেন, "আয় কানাই ভাই, করি তোরে কাঁধে।" এই বলিয়া গান করিতে করিতে হরপ্রসন্ন বাবুকে কাধে নিতে গেলেন।

হরপ্রসন্ন বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু গান লিখিয়াছেন, তিনটি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

তাঁহার নমস্কার—

যার অধিষ্ঠানে অনু ও চেতন,
তরু পত্র ধূলি জ্ঞান-প্রেমাঞ্জন।
সর্ব্বভূত আত্মভূত যাঁর-আকর্ষণে,
নমঃ সেই গুরু ব্রহ্ম শ্রীদুর্গা চরণে ॥

(১)

কেমনে করিব নাম আমি তোমার যোগ্য নই,
(তবু) সাধ মনে ঐ চরণে রেণু হইয়ে লেগে রই ?
যে যাহার যোগ্য হয়,

নাম ধরে দেয় পরিচয়,
নইলে নামের শুধু কলঙ্ক হয়
নামের গুণ তার মিলে কই ?
তুমি কৃপাময় প্রেম মাখা,
কেরেছ প্রাণ যেই দেখা,
ঠাকুর রূপে গুণে তুমি একা
(তোমার) তুলনা আর মিলে কই ?
তুমি প্রাণারাম পূর্ণ কাম,
সচ্চিদানন্দ ধাম,
যাহে কালী কৃষ্ণ শিব রাম
মিশেছে এক রূপ হই ?
শুক নারদ গৌর হইত,
হরি বলি নাম করিত,
অভাজন আমার মত
কি বল্‌বে আর তুমি বই ?

পদ

গুরো ত্বং হি কেবলম্।
নাহং নাহং ত্বং হি ত্বং হি,
ত্বং হি কেবলম্।
কারণং তারণং পাবণং,
শরণং ত্বং হি কেবলম্।
সম্বলং মঙ্গলং সকলম্,

গুরো ত্বং হি কেবলম্।
সুন্দরং মধুরং চিরপ্রেমঘনং,
গুরো ত্বং হি কেবলম্।

(২)

জয় দেব জনার্দ্দন জয় শ্রীদুর্গাচরণ,
জয় জীব জীবন, জীব নিকেতন,
জগত কারণ, নর নারায়ণ ;
জয় মহা যোগেশ্বর, যোগমায়া অধীশ্বর,
গঙ্গাধর দিগম্বর হরি শঙ্কর অবতার।
জয় জ্ঞান-করম-ভকতি-সন্ধান,
মুকতি সদন (পরং) ব্রহ্ম সনাতন ;
পরম জ্যোতিঃ পূর্ণরস, গুহাশায়ী হৃষিকেশ,
প্রেম পবন, তমোনাশন গুরো চিদানন্দ চাঁদ।
জয় ভূতভাবন, ভব নিবারণ,
সর্ব্বভাব ঘন ভক্ত-প্রাণ-ধন ;
সত্যং শিবং সুন্দরং শান্তং কান্তং মধুরং,
শুদ্ধং বুদ্ধং শরণৈকসাধ্যং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
ভূমানন্দঘন, অনন্ত অধিষ্ঠান,
(শিব রামকৃষ্ণ) দেহি শ্রীচরণ পুরুষ পুরাণ ॥

(৩)

জীব জাগো জাগো, কেন আর ঘুমেরে।
অমানিশা শেষ হের ভানুকরে ॥

আর্ত্ত-দুঃখ হেরি, নিত্য-সুখ-পাশরি।
ধরা মাঝে এবে এল যে শ্রীহরি ॥
রবেনা রবেনা ভবের ভাবনা।
(আর) পাবেনা পাবেনা তাপের যাতনা ॥
দেখ কেবা নরে, বিদেহে বিহরে।
দেব কি মানবে সমভাবে সেবে ॥
ভাব কে জগতে গেছে শূন্য হাতে।
বিশ্বের সেবাতে জীবন দেয়রে পেতে ॥
শুন কার বাণী আলোক দায়িনী।
জাগ সবে অজ্ঞানী, জুরায়রে পরানি ॥
কলির সংসারে, স্বধর্ম্ম উদ্ধারে।
বল কে গোপনে এত ত্যাগ পারে ॥
পাবে কোথা বিনে, শ্রীদুর্গাচরণে।
(তাঁরে) ভজরে জীবনে, কি ভয় মরণে ॥

শ্রীযুক্তা সুশীলা সুন্দরী দেবী ঃ—

ইনি হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী। আশ্বিন মাসে প্রথম স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ী আসার পর যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার স্বামী সর্ব্বদা এখানে আসেন, তখন সর্ব্বদা তিনি মা'র নিকট চিঠি লিখিতেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমা'কে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। তাঁহাকে ঢাকা নেওয়াইতে যেন হরপ্রসন্ন বাবুকে মা বলিয়া দেন। তবেই তিনি সর্ব্বদা ঠাকুরবাড়ী আসিতে পারিবেন। এবং তাহার নইড়া, ফরিদপুর স্বামী বাড়ী একা

থাকিতেও বড় কষ্ট হয়; ঘড়ে সংশাশুড়ী। তিনি ঢাকা আসিলেন পর যখন হরপ্রসন্ন বাবু প্রতি শনিবার এখানে আসিতেন, তখন তিনিও আসিতেন এবং সোমবার চলিয়া যাইতেন। আসার সময় কোন কোন বার তিনি অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িতেন, বেশীর ভাগই পড়িতেন পুরোহিত বাড়ীর নিকট। বাড়ীতে খবর আসিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে আনিতে পাঠাইতেন। মা তাঁহাকে কোলে করিয়া আনিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বাড়ীতে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষেই এইরূপ অজ্ঞান হইতেন বেশী। তিনি ৺দুর্গা পূজার সময় আসিয়া কয়েক দিন থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ ত্যাগের পর তিনি আর পূজায় ঠাকুরবাড়ী আসেন নাই। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় জঙ্গলে যাইয়া, অন্য দুইবারও গানের সময় জঙ্গলে যাইয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একবার কালীপূজার পর দিন হরপ্রসন্ন বাবু তাঁহার স্ত্রীকে রাখিয়া চলিয়া যান কারণ শনিবার নিকটে, তিনি আবার আসিবেন। কিন্তু হরপ্রসন্ন বাবু যাওয়ার পরই তিনি বলেন, "আমি থাকিব না, আমি যাবই।" শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিলেন, "তুমি যাইয়া উহাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া আইস।" তখন বর্ষাকাল, কোমর জল। মা হরপ্রসন্ন বাবুর তিন বৎসরের ছেলে কোলে নিয়া রওনা হইলেন। নটবর বাবুও পিছনে পিছনে গেলেন। মা ষ্টেশনে হরপ্রসন্ন বাবুর নিকট বধূকে দিয়া আসিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, মা,

তুমি জলের মধ্যে এইভাবে এখানে কেন আসিলে ? বাড়ীতে ফিরিবার সময় ঝড় বৃষ্টিতে ভিজায় মা তিন মাস সর্দ্দি কাশিতে ভোগেন।

হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'কে লক্ষ্য করিয়া হাতে তুড়ি দিয়া খুব ভাল ভাল গান গাইতেন। হয়ত বাড়ী ভরা লোকের সাম্‌নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মধ্য উঠানে জড়াইয়া ধরিতেন। তাঁহার তিন বৎসরের ছেলে গান আরম্ভ হইলে শুনিয়া খাইতে বসিত না। বলিত, "ঠাকুরের নাম না করিয়া খায় না।" শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ অসুখের সময় যখন হরপ্রসন্ন বাবু এখানে ছিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী একবার মাত্র আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—(স্বামী শিষ্য সংবাদ প্রণেতা)

শরৎবাবুর বাড়ী ফরিদপুর জিলায়, পল্লী গ্রামে। কলেজে পড়িতে ঢাকাতে ৪ বৎসর ছিলেন। তখন তিনি প্রথম সত্য-গোপালের নিকট আসিতেন; হরপ্রসন্ন বাবুর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসার এক বৎসরের মধ্যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসেন। তিনি সত্যগোপালের স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিতেন, একেবারে আঁচল ধরা, একটুকু নড়িতেন না। সত্যগোপালের স্ত্রীও শরৎ বাবুকে খুব ভালবাসিতেন। সত্যগোপালের স্ত্রী শ্রীশ্রীমা'র এখানে আসিলে, মা জলযোগ করাইতেন, কিন্তু তিনি সন্দেশ খানা পর্য্যন্ত নিজে না খাইয়া শরৎ বাবুর জন্য উঠাইয়া নিয়া যাইতেন। শরৎ বাবু সত্যগোপালকে বলিতেন,

"সত্যই ইঁনি গোপাল, ইঁনি ভগবান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই।" এবং সেইরূপ আচার ব্যবহারও করিতেন শরৎবাবু এইভাবে বহু দিন সত্যগোপালের নিকট থাকেন, তৎপরে তিনি শুভাঢ্যা দারোগা বাড়ীর সত্যগোপালের এক শিষ্যাকে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন এবং তথায় যাতায়াত করিতে থাকেন। যখন সত্যগোপালের নিকট আসিতেন, তখন সত্যগোপালের স্ত্রীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ী আসিতেন। কীর্ত্তনের সময়ও আসিতেন।

পরে এক দিন শরৎ বাবু একাই শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসেন। দুই তিন দিন ছিলেন। নিজেই পাক করিয়া খাইতেন। আসিয়া বলিয়াছিলেন "আমি আপনাদের পাকেই খাইব, আমার জাত নাই," কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা খাইতে দেন নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একটুকুও এদিক সেদিক হওয়ার যো ছিল না। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় জল ভাঙ্গিয়া আসেন, তখন আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস ছিল। এই সময় হইতেই সত্যগোপালের বাড়ী কিম্বা শুভাঢ্যা যান নাই। ঢাকা হইতে প্রত্যেক শনিবার আসিতে লাগিলেন। তিনি একাকী সর্ব্বদা 'মাগো, বাবাগো' বলিয়া গান করিতেন। মাঝে মাঝে পাগলের ন্যায় খুব জোরে চীৎকার করিতেন। মা মাঝে মাঝে শরৎবাবুকে সত্যগোপালের স্ত্রীকে দেখা দিয়া আসিতে বলিতেন। মা বলিতেন, "গোপালের স্ত্রীর চৌদ্দটি সন্তান নষ্ট হওয়ায় যে কষ্ট না হইয়াছে, আপনি না যাওয়ায় তাঁহার সে কষ্ট হইতেছে।" কিন্তু শরৎবাবু কিছুতেই যাইতেন

না, আর কোন দিন যানও নাই। সত্যগোপালের নিকট হইতে আসিয়া তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা করিতেন। আসার সময় তাঁহাকে অনেক গালাগালি করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "এসব লোক খাইল পাতে বাহ্যি করে।" অর্থাৎ যে পাত্রে খায় সে পাত্রেই বাহ্যি করে। শরৎবাবুর স্ত্রীর নাম মোক্ষদা। মা'কে শরৎবাবু বিবাহের পর বলিতেন বিবাহ করিয়াছি তোমাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য। মোক্ষদা তোমাদের সেবা যত্নই করিবে। শরৎবাবু সর্ব্বদা বলিতেন সে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন। চিঠিতেও এইরূপ লিখিতেন। মা প্রবোধ দিতেন, "নিজের মন ঠিক থাকিলে সংসারে কে আটকাইতে পারে? স্ত্রী পারে না, টাকা পয়সা পারে না, বাপ পারে না, মা পারে না, কেহই পারে না। সংসারে থাকায় দোষ কি।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের বাড়ী হইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শরৎ স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না। কোন সময় শুইলেও মধ্যে বালিশ দিয়া শোয়। সে সংসার ধর্ম্ম আর করিবে না।" শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "যত রকমই কেন করুক না, সংসার না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।" এসব কথা শরৎবাবুর ছেলে পেলে হওয়ার পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহার পর তাহার কয়েকটী সন্তান জন্মিয়াছে। ছেলে মেয়ের বিবাহও হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "রামপ্রসাদের গান শুনিয়া চিত্তেশ্বরী ঘাড় ফিরাইয়াছিলেন, আর শরতের গানেও সেইরূপ আকর্ষণ করে।" শরৎবাবু খুব ভাল গান গাইতে পারিতেন। মা'কে

লক্ষ্য করিয়া মালসী গানই বেশী গাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াও গান গাইতেন। শ্রীশ্রীমা শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে বিশ্বাস করিতে নাই। আজ এখানে, কাল ওখানে আজ একে মা, কাল তাকে মা বলেন"। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "মা তুমি এরূপ বলিও না, শরৎ মনে কষ্ট পাইবে," মা বলিলেন, "পাইলে কি করিব ? এরূপ করে কেন।"

বাড়ীতে চাকর কিংবা অন্য লোক ছিল না। সমস্ত খাটুনিই মা'কে খাটিতে হইত। তার উপর দ্বিপ্রহর নাই, আড়াই প্রহর নাই, সন্ধ্যা নাই, রাত্রি নাই; লোক অনবরতই আসিত। মা'কে খাটীয়া একেবারে হয়রান হইতে হইত। মা'র কষ্ট দেখিতে বুক ফাটিয়া যাইত। এক দিন শরৎবাবু জোড় হাত করিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া ঠাকুরের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, ' আমি যদি কোন পুণ্য করিয়া থাকি, একবারও কোন সাধন ভজন করিয়া থাকি, তবে যেন এখানে এই ভাবে আর অতিথি না আসে।" ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিলেন না। অতিথি আসা ক্ষান্ত হয় নাই।

শরৎবাবু যখন ইচ্ছা, আসিতেন। আসার কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না। এক দিন তিনি দক্ষিণ দিকের হিজল তলার রৌদ্রে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। মা তখন তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বাজারে গিয়াছিলেন। মা কথা না বলিয়া নানারূপে তাঁহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া উঠাইয়া আনেন। এক দিন গান

করিতে করিতে অজ্ঞান প্রায় হইয়া পড়িলেন, কাপড় খুলিয়া গেল। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "কাপড় ঠিকঠাক করিয়া গান গাইতে পারেন না ?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আগে কি জানা ছিল, গানের সময় কি অবস্থা হইবে ?"

এখানে সেখানে আসা যাওয়ায় পড়ার ব্যাঘাত ঘটিত। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় ফেল হইলেন। তার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা নিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় শরৎ বাবু বেলুর মঠে যাইতে থাকেন। ক্রমে মঠের জাক জমকে তথাকার ভক্ত হন। কলিকাতা যাইয়া সর্ব্বদা দুই চারি দিন পরেই মা'র নিকট পত্র দিতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট যে সব পত্র দিতেন, তাহা পাঠাইতেন। লিখিতেন, "যখন লিখিতে বসি তখন আর কলম থামে না. যেন আমার কথা আর ফুরাইতে চায়না।" প্রত্যেক পত্র চারি পাঁচ তা কাগজে পূর্ণ থাকিত। পত্রের মধ্যে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীশ্রীমা পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী,— এইরূপ নানা কথা, নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা ছন্দে, শত সহস্র বিশেষণে লিখা থাকিত ; এবং শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর দুই-ই এক একই দুইরূপে লীলা করিতেছেন, ইত্যাদি। তখন নটবর বাবু এখানে আসিতেন। মা কোন কোন পত্র নিজেই পড়িতেন। আর সমস্ত পত্রই নটবর বাবুকে দিয়া পড়াইতেন ও উত্তর লিখাইতেন। শরৎবাবুর এসব পত্র পড়িয়া নটবর বাবুর ঠাকুরভাব জাগিল। একবার ঢাকা হইতে কয়েকজন লোক

এখানে আসিয়াছিলেন। শরৎ বাবুও এখানে ছিলেন। শ্রীশ্রী-ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বলিতেছিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমার সুখ দুঃখ নাই।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ অসুখের সময়, দেহত্যাগের দশ বার দিন পূর্ব্বে মা শরৎবাবুকে তার করিয়া আনান। তাহাতে বেদানা আনিবার কথাও ছিল। তিনি কিছু বেদানা আনিয়াছিলেন। বেদানা ভাল না বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেওয়া হয় নাই। আনিয়াছেন তাই মাত্র চারি পাঁচ রোয়ার রস দেওয়া হইয়াছিল। রান্না করিয়া খাওয়ার সময় ব্যতীত শরৎবাবু সব সময়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "গুয়ে মুতে অপরিস্কার জায়গা, এখানে আসিবেন না, থাকিবেন না।" কিন্তু শরৎবাবু তাহা না শুনিয়া নিকটেই থাকিতেন।

শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় :—

ইনি কাশীকান্ত গাঙ্গুলীর দৌহিত্র। সেই বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন। সেই বাড়ী ঠাকুর বাড়ীর লাগ-পূর্ব্বদিকে। মধ্যে অপ্রশস্ত একটি কাচা মাত্র ছিল। যখন মা'র বিবাহ তখন নটবর বাবুর বয়স দুই বৎসর। তাঁহার মাসীমাতা মা'কে খুব ভালবাসিতেন। তিনি নটবর বাবুকে কোলে নিয়া আসিতেন ও মা'র নিকট বসিয়া আলাপ করিতেন। এজন্য তিনি পিশী-শাশুড়ী ও ননদিনীর গালিও শুনিয়াছেন; তবুও আসিতেন। নটবর বাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। তখন

এমন অবস্থা হইয়াছিল যে তাঁহাকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিলে মা ঘাট হইতে দৌড়িয়া বাড়ী আসিতেন। নটবর বাবু একবার কোন এক মিথ্যা স্ত্রী-ঘটিত মোকদ্দমায় পড়েন। এই মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়া অবধি নটবর বাবু যখনই সময় পাইতেন, তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতেন ও ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময়ের পূর্ব্বে গান লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন, অন্য কাহাকেও দেখিলে লুকাইয়া ফেলিতেন। তিনি দেখিলেও কিছু বুঝিবেন না তাই তাঁহাকেই দেখাইতেন। তাঁহার বিদ্যা মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা ফেল, তাহাও অঙ্কে শূন্য পাইয়া। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল থাকায় মা'র মনে হইয়াছিল যে, একটু শাস্তি হইলেই ভাল হয়। মোকদ্দমার গতিক দেখিয়া জনরব হইল, তাঁহার চারি পাচ বৎসর জেল হইবে। শুনিয়া মা'র মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল ; কেবল ভাবনা, আমি কেন এরূপ বলিলাম ? মা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটও বলিতেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি বল, এখনই উহাকে খালাস করিয়া নিয়া আসি, দেখি কে জেল দেয়।" তখন মা বলিলেন, "থাক্, দরকার নাই আমি দেখ্‌তে চাই না।" তারপর মাত্র তিন মাস জেল হয়। তখন মা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন এবং যাহাতে নটবর বাবু শান্তি পায়, সেইরূপ নানা প্রবোধ পূর্ণ চিঠির মুসাবিদা করিতেন। এই মোকদ্দমার বিচারের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় ছিলেন। মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণ যেদিন যাহা হইত, নটবর বাবু তাহা মা'কে

বলিয়া যাইতেন। জেলই তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীমা'র কৃপা হওয়ার কারণ, অহৈতুকির হেতু। লোকে বলিত, "সে জেল হইতে বাহির হইয়া আর বাড়ী আসিবেন না, এক দিকে চলিয়া যাইবেন!" কিন্তু জেল হইতে রাত্রিতে বাড়ী আসিলে, সংবাদ পাওয়া মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অতি ব্যস্ত হইয়া দেখিতে গেলেন। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া নটবর বাবু সর্ব্বদাই ঠাকুর বাড়ী থাকিতেন। কোন বাহিরের লোক আসিলে জেল খাটিয়াছেন, এই লজ্জায় দৌড়িয়া বাড়ী যাইতেন। জেল হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নটবর বাবুর বিবাহ হইয়াছিল। বধূর বয়স তখন বার,তের বৎসর। তাহাতে কোনই আকর্ষণ ছিল না। মোকদ্দমার সময় তিনি পাটের আফিসে কাজ করিতেন। জেল হইতে আসিলে আর কোন কাজকর্ম্ম জুটিল না, বাড়ীতেই বসা। হাট বাজার তাঁহাকেই করিতে হইত। বাড়ী হইতে চাউলের টাকা দিত, কুলীর পয়সা দিত না; নিজে মাথায় বহিয়া চাউল আনিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে দিন জানিতে পারিতেন, কুলীর পয়সা দিয়া দিতেন। হরপ্রসন্ন বাবু ও শরৎ বাবু আসার কিছু দিন পরেই এই মোকদ্দমা হয়। নটবর বাবু জেল হইতে আসিয়া কুলগুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন।

নটবর বাবু পরে মাঝে মাঝে পাটের কাজ করিতেন। অন্য সময়ে সর্ব্বদা ঠাকুর বাড়ী থাকিতেন। নটবর বাবুর স্ত্রী মরার পর শ্রীশ্রীঠাকুর এক বার কলিকাতা গিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় নটবর বাবুরও কলিকাতা যাওয়ার দিন ঠিক করিয়া দিয়া

গিয়াছিলেন। সেই দিনটি নটবরের জন্মদিন ছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সেই দিনই রওয়ানা হইলেন। তাঁহার বড় ভাই কেবল পাথেয় মাত্র দিলেন। নটবর বাবু শুধু এক আলোয়ান গায়ে চলিলেন। তখন মাও যাইতে মানা করিয়াছিলেন। কারণ সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ চলিয়া গিয়াছিলেন, বাসা খালি, নটবর বাবু কোথায় থাকিবেন, কি খাইবেন। নটবর বাবু বলিলেন, "আমি যে দিন কলিকাতা পোঁছিব তিনি সেদিন থাকিবেনই।" যেদিন নটবর বাবু পৌছেন, তার পূর্ব্ব দিন ঠাকুর কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কালীকুমার ভৌমিক ও তারিণী মিত্র বাড়ী হইতে নটবর বাবুর পূর্ব্বেই তথায় গিয়াছিলেন। কিছু দিন পর তাহারা চলিয়া আসেন। নটবর বাবু মাসেক ওখানে ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর নানারূপ খাদ্য খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, এই সময়ই তিনি তাঁহাকে কৃপা করেন।

নটবর বাবু যে দিন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসেন, হরপ্রসন্ন বাবু সেইদিন উৎসুক হইয়া তাঁহাকে আনিতে ষ্টেশনে যান। দুই জনে ষ্টেশন হইতে ঠাকুর-বাড়ী আসিয়া তুমুল গান করেন, যেন উঠান ফাটিয়া যায়, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গান শেষ হইলে হরপ্রসন্ন বাবু ঘরে যাইয়া মা'র নিকট বলিলেন, "এখন আর সে নটবর নাই, সম্যক্ পরিবর্ত্তন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত গুণ যেন তাঁহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।"

নটবর বাবু যখন কলিকাতা ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করিয়া বলিয়াছিলেন. ভূত নাই, তিনি বলিয়াছিলেন

আছে। তিনি বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় এক দিন মা'র সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হাতে বাতি ও ছাতি ছিল। তখন আষাঢ় মাস। বৃষ্টির জলে রাস্তায় কাদা হইয়াছিল। ঠাকুর বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় সোণাচরার মাঠে মাঝামাঝি জায়গায় তাঁহার পাঁচ সাত হাত দূরে দেখিতে পাইলেন, একটী কাল মূর্ত্তি ভূত বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আকাশে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখা মাত্রই ভয়ে হাত হইতে বাতি ও ছাতি খসিয়া পড়িল। তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক মিনিটের মধ্যে যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তর্কের কথা মনে পড়িল, অমনি ভূত অদৃশ্য হইল। পরে অনেক সময় তিনি গভীর রাত্রে ঐ স্থানে যাইয়া ভূতকে ডাকিয়াছেন কিন্তু আর দেখা পান নাই।

হরপ্রসন্ন বাবু ও নটবর বাবু দুইজনে বেদম গান করিতেন। দুই জনেই মোরায় গাহিতেন, অন্যান্য লোক খাদে গাহিত। তাঁহাদের খুব ভাব ছিল, এমন কি দুই জনে হাটিয়া ঢাকা হরপ্রসন্ন বাবুর বাসায় গিয়াছেন। একে অন্যকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন নাই। নটবর বাবুর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের টান পড়িয়াছে দেখিয়া হরপ্রসন্ন বাবুর ক্রমে হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে কেহ কাহাকেও কিছু বলেন নাই, কিন্তু ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেন নটবর বাবুর দিকে চাহিয়া কথা বলিলেন, শ্রীশ্রীমা কেন তাঁহাকে খাইতে বলিলেন, ইহা নিয়া হরপ্রসন্ন বাবু শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে কোঁদল করিতেন। আবার

হরপ্রসন্ন বাবুকে ঐরূপ করিতে দেখিলে নটবর বাবু মা'র নিকট কোঁদল করিতেন, গা ছাড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইতেন। নটবর বাবুর তখন হইতে খুব উন্মাদ অবস্থা। জেল হইতে আসার পর কখন বা জঙ্গলে গিয়া বসিতেন, কখনও বা গান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অধীর হইয়া পড়িতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে শান্ত করিতে বলিতেন। মা তাঁহাকে শান্ত করিতে গেলে, তিনি পা জড়াইয়া ধরিতেন, কোন দিন তাঁহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যাইত না। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহাদের বাড়ীর লোক খুজিতে বাহির হইতেন। হয়ত রাত্রিতেও এইরূপ হইত। কোন দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিতে বলিলে মা কোলে করিয়া তাঁহাকে নিয়া গিয়াছেন।

মা বলেন, নটবর বাবুর ও হরপ্রসন্ন বাবুর অবস্থা এত উচ্চ ছিল যে এরূপ থাকিলে দেহ টিকে না। আরও বলেন যে ইহাদের পাখা থাকিলে তখন আকাশে উড়িত। সকল সময়ই বিদেহ ভাবে থাকিত। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগলপুরি চাদর গায়ে দিয়া ঘুমাইয়াছেন, নটবর বাবু ঘরে যাইয়া দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পা হইতে এক অপূর্ব্ব ছটা বাহির হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে তাহা অন্তর্হিত হইল।

নটবর বাবু জেল হইতে আসার আট মাস পরে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন নটবর বাবুরা প্রথম দ্বীপান্বিতা কালীপূজা আরম্ভ করেন। জেল হইতে আসার পর তাঁহার

হাত পায়ের অঙ্গুলীতে শ্বেতী হয়। তাঁহার মা ঔষধ ব্যবহার করিতে বলিতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, "না, আপনিই সারিয়া যাইবে।" তাঁহার বিশ্বাসই এ ব্যারাম সারিবার মূল। জেল হইতে আসার পর স্ত্রীর উপর এত টান হইয়াছিল যে, "মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, আর মাটিতে রাখিলে পিপড়ায় খায়!" স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আর বিবাহ করিতে চাহেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিনও বিবাহ করিতে বলেন নাই। মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেন, "আপনি বলিলেই বিবাহ করিবে।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তবুও বলেন নাই। শ্রীশ্রীমা, তাঁহার মা ও আত্মীয় স্বজন বিবাহের জন্য অনেক বলিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই, বলিতেন, "তোমরা সম্বন্ধ ঠিক করিলে আমি হাতের শ্বেতী দেখাইব, তবেই সম্বন্ধ ফিরিয়া যাইবে।" তাঁহার বড় ভাই অম্বিকা বাবুর স্ত্রীও ঐ সময় মারা যান। তাঁহার দাদা অম্বিকা বাবু বলিলেন, "নটবর বিবাহ না করিলে আমিও করিব না।" তাই নটবর বাবু বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। বিবাহ করিয়া আসার সময় ঠাকুর বাড়ীতে স্ত্রী নিয়া উঠেন, এক রাত্রি থাকিয়া পর দিন বাড়ী চলিয়া যান। এই স্ত্রীর বয়স ১৪।১৫ বৎসর ছিল। প্রথম বিবাহের সময় এখানে আসার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিন সত্যগোপালের নিকট যাইতেন।

নটবর বাবুর শেষের বিবাহ তাঁহাদের পুরাণ বাড়ীতেই হয়। পরে তাঁহারা নূতন বাড়ীতে চলিয়া যান। তখন নটবর বাবু মেকটাবিশ সাহেবের কেশিয়ার। নূতন বাড়ীতে যাইয়া

মায়ের মৃত্যু জনিত কাল-অশৌচেই ৺দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। পূজাতে খুব সমারোহে আরতি হইত। শ্রীশ্রীমা ও হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী এক বার আরতি দেখিতে যান। আরতি শেষ হইলে নৌকা অভাবে সে রাত্রে আর আসিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। শ্রীশ্রীমা ও হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী নটবর বাবুর ঘরে মাটিতে একখণ্ড ছিড়া পাটীতেই পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার স্ত্রী খাটের উপর শুইলেন। পর দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নৌকা পাঠাইলে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। নূতন বাড়ীতে যে পুকুর কাটা হয়, তাহার তলা শুক্‌না ছিল। এক দিন তথায় নারায়ণ সেবা করেন, এবং কীর্ত্তন হয়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় গিয়াছিলেন। তিনি একটুকু করতালি দেওয়া মাত্রই সংকীর্ত্তন তুমুল হইয়া উঠিল এবং এক দিক দিয়া নীচ হইতে জল উঠিতে আরম্ভ করিল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঠাকুর বাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন প্রাণ ভরিয়া মনের আনন্দে এই পুকুরেই ডুব দিয়া স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। নটবর বাবুর পুকুর, এখানে হিংসা হইবে না বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কোন জায়গা শুকাইলে তথা হইতে মাছ ধরিয়া নিয়া তথায় ছাড়িতেন। নটবর বাবুর মাতাকে যখন দাহ করা হয় তখন চারি দিক ঘুরিয়া কীর্ত্তন হইতেছিল, ঠাকুর সেই সময় তথায় দাড়াইয়া হাতে তুড়ি দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কোন খোঁজ নেয় নাই। নটবর বাবুর প্রথম ছেলের অন্নারম্ভের দিন মা নিজে যাইয়া ধান দুর্ব্বা

দেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও যাইয়া বাদ্য শুনিয়াছিলেন। নটবর বাবু যাইতে বলেন নাই।

নটবর বাবু তাঁহার মা'র শ্রাদ্ধের কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, মা'র ভগ্নী, তাঁহার মেয়ে বিনদাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নটবর বাবুর স্ত্রী পাক করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পূর্ব্বের চৌচালা ঘরে বসিয়া খাইয়াছিলেন। তাঁহার খাওয়া শেষ না হইতেই মা তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীর কন্যা সহ তথায় যান। তাঁহার খাওয়ার সময় নটবর বাবু নিকটে ছিলেন। তিনি খাইতে বসিয়াই ভাবগ্রস্থ। সমস্ত একত্র মাখিয়া দুই এক বার মুখে দিলেন। তাঁহার খাওয়া হইলে শ্রীশ্রীমা, মা'র ভগ্নী ও ভগ্নী কন্যা ঐ পূর্ব্বের ঘরেই খাইতে বসিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের থালাতেই বসিয়াছিলেন। নটবর বাবু মা'কে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার দিদিমাতাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাই তিনি মা'র সম্মুখে আসিয়া নটবর বাবুকে নানারূপ অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। মা বলেন, "ঠাকুরের পাতে বসিয়াছিলাম বলিয়াই খাইলাম, নতুবা এমন খাওয়া না খাওয়াই ভাল ছিল। জন্মে এক দিন তাঁহার বাড়ী খাইতে বসিয়াছিলাম তাহাতেই এইরূপ।"

এক বার নটবর বাবুর পুরাণ বাড়ীতে পৈতা উপলক্ষে ৺কালী পূজায় পাঠাবলি দেওয়ার প্রস্তাব হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলি দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নটবরের ভাইরা তাহাতে রাজী না হওয়ায় নটবর বাবু রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাঠাবলি দিলে আমি

বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব।" আর পাঠাবলি দেওয়া হয় নাই।

নটবর বাবু 'কর্ম্মই সাধনা' ও 'মানিনী' উপন্যাস ছাপান এবং উদ্ধব ও কলির নির্ব্বাসন নামক দুইখানি নাটক লিখিয়াছেন। কোন খানাই ছাপা হয় নাই। উদ্ধব নাটক খানায় তাঁহার নিজকে নির্দ্দেশ করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে ব্যবহারের কথা লিখিয়াছিলেন, আর কলির নির্ব্বাসন খানায় ঠাকুরের আগমনে কলির পলায়ন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছিল। এই কলির নির্ব্বাসন নাটক তাঁহার বাড়ীতে অভিনীত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "এসব যে সে লিখে পড়ে ইহা তার দৈবশক্তি হইতে।" এই নাটকের ষ্টেজ যখন সাজান হয়, তখন তিনি অনেক সময় দেখিতে যাইতেন। মাঝে মাঝে ঐ বাড়ীতে বেড়াইতেও যাইতেন।

কোন দিন ভাল মাছ কিম্বা অন্য জিনিষ হইলে মা নটবর বাবুকে পাক করিতে বলিতেন। তিনি কোন দিন পাক করিয়া খাইতেন, কোন দিন বা পাক বসাইয়া মাঠে দৌড়াইতেন, মা পিছু পিছু যাইতেন। রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইত, ভ্রূক্ষেপ নাই। অনেক সাধিলে আবার আসিতেন। এক দিন মা'র মিষ্টান্ন পাক হইয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর নটবর বাবুকে দিতে বলিলেন। বলিলেন, "মিষ্টান্নে দোষ নাই।" হয়ত অন্য দিন মা মিষ্টান্ন খাইতে বলিলে, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "তোমার পাক সে কেন খাইবে ?" ঠাকুরের অনন্তলীলা কে বুঝিবে !

নটবর বাবু কাজ করার সময় ছাড়া সর্ব্বদা ঠাকুর বাড়ীতেই থাকিতেন। রাত্রিতেও দুটা তিনটা পর্য্যন্ত থাকিয়া ভাগবত

পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিতেন। এমন কি বাড়ীতে ভাত খাইয়া এখানে তামাক খাইয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ ছিল যে, তাঁহার বাজারে যাওয়াও প্রমাদ ছিল, গেলেও মনে করিতেন, কতক্ষণে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় তিনি ময়মনসিংহে পাটের কাজ করিতেন। অন্তিম সময় যখন মা বুঝিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর আর দেহ রাখিবেন না, তখন ১০।১২ দিন পূর্ব্বে তার করিয়া তাঁহাকে আনাইলেন। দেহত্যাগের তিন চারি দিন পূর্ব্বে তিনি চলিয়া যাইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা না করিয়াই যাইতে-ছিলেন। মা চৌধুরী বাড়ীর আমগাছ তলা হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন, এই বলিয়া, "আর ত দেখিবা না, এক বার দেখিয়া যাও।" মা'র অনুরোধে আসিয়া দেখিয়া চলিয়া যান। শ্রাদ্ধের দিন তিনি রাত্রিতে নবিগঞ্জ আসিয়া থাকেন, মা রাত্রি দশ এগারটার সময় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনান।

নটবর বাবু বাড়ী হইতে যাইবার দুই দিন পূর্ব্বে ঢাকা হইতে চাকর পাঠাইয়া দুইটী বেদানা আনাইয়াছিলেন, কারণ শরৎ বাবুর বেদানা দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "একি খাবার বেদানা ?" নটবর বাবুর বেদানা ভাল ছিল। মা ঐ বেদানার দুই এক রোয়ার রস দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আর দিওনা, দিলে আমার কষ্ট হয়।" আর দেওয়া হইল না। নটবর বাবু বাড়ী আসিয়া দুই এক বারের বেশী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যান নাই বা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন না।

জেল হইতে আসিয়া তিনি সর্ব্বদা মা'র নিকট বলিতেন, সংসারী হইবেন না; সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন, সংসারে আর তাঁহাকে বাঁধ্‌তে পার্‌বে না। প্রথমা স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। মা বলিতেন, "বধূকে এরূপ কাঁদাইয়া লাভ কি? দেখিব, তুমি কেমন সংসার না কর?" শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পর নটবর বাবু অনেক সময় বলিতেন, "আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইব।" ক্রুদ্ধ হইলেই তিনি এরূপ বলিতেন। ঠাকুর স্বদেহে থাকিতে এক দিন বাড়ীতে ঝগড়া করিয়া উলঙ্গ হইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। গায়ে জামা ও পায়ে জুতা ছিল। তখন তাঁহারা পুরাণ বাড়ীতে ছিল। গণ্ডগোল শুনিয়া শ্রীশ্রীমা যাইয়া পথ হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন।

তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র বহুগান লিখিয়াছেন। চারটি গান নিম্নে দেওয়া গেল।

(১)

(তোরা) কেনরে কলির জীব রলি অচেতন,
(একবার) মায়া ঘুম ছেড়ে হের সত্য নিরঞ্জন।
মোদের পাপ তাপ হরিতে অবতীর্ণ অবনীতে,
শ্রীমধুসূদন হরি ব্রহ্মসনাতন।
হের হের হের তারে, পূজ সবে প্রেমভরে,
বসাইয়ে হৃদ মাঝারে রাখ অনুক্ষণ।
প্রেম ময় দয়াল হরি, বিতরিতে প্রেমবারি,
যোগমায়া সঙ্গে করি কৈল আগমন।

মনের সাধে সবে মিলি দাও তারে প্রেমাঞ্জলি,
ভক্তিভরে পূজ সবে ঐ রাঙ্গা চরণ।
ভবের কাণ্ডারী হরি, পার করিতে ভব বারি,
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে করি কৈল আগমন।
ধন্য ধন্য ভারত ভূমি,—ব্রহ্মলোক তুচ্ছ গণি,
বৈকুণ্ঠ বিহারী যাহে করে বিচরণ।

(২)

ভাব ভাব শ্রীদুর্গাচরণে,
সদা ভাব সে অচিন্তে, রবেনা কুচিন্তে,
রবি অভয় পদ প্রান্তে জীবনে মরণে।
(হল) যে পদ ভাবিয়ে শিব মৃত্যুঞ্জয়,
ভবারাধ্য সেই ত্রিপুরা তনয়,
(সদা) রবিসুত ভীত যে নাম শ্রবণে।
বিষয় বাসনা কামিনী প্রসঙ্গ,
ছাড় ওরে মন, ধর আত্ম সঙ্গ ;
বহিবে হৃদয়ে প্রেমেরি তরঙ্গ,
সদা আনন্দ লহরী খেলিবেরে প্রাণে।
এই অকিঞ্চনে কয় ভজিবে যে জনে,
পূর্ণ ব্রহ্ম দীন দয়াল নন্দনে ;
কিবা ভয় তার জীবনে মরণে,
থাকে সদানন্দে সদা নাম সুধাপানে ॥

(৩)

আমি আর কি শমন তোরে ডরি,
বাবা আমার মৃত্যুঞ্জয়, মা আমার ত্রিলোকেশ্বরী।
প্রতি লোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়,
যাঁহার ইচ্ছাতে হয় সৃজন পালন লয় ;
তোর মত কত শত নিত্য ভৃত্য অনুগত,
যাঁর ভয়ে শশঙ্কিত হয়ে আছে দ্বারের দ্বারী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, নিত্য যাঁর অনুচর,
ধন্য জ্ঞানে যাঁর আজ্ঞা পালিতেছে নিরন্তর ;
কি করিবে তাঁর সুতে তোর মত শতে শতে,
(তোরে) ইচ্ছা করলে পারি রাখ্‌তে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।
সুরাসুর নারী নর, যাঁর মহিমা গুণ গায়,
আমি মনঃপ্রাণ সঁপিয়াছি সে দুর্গাচরণ পায় ;
ত্রিপুরা নন্দন নাম জপি হৃদে অনুদিন,
সেইরূপ নিরুপম, রাখিয়াছি হৃদে ভরি।
অকিঞ্চন কয় দিব্য করি, মা আমার ব্রহ্মময়ী,
যাঁর বলে জানিস্‌ মনে, আমিরে ব্রহ্মাণ্ড জয়ী ;
শ্রীদুর্গাচরণ নাম সুধা শোন অবিরাম,
যাব চলে নিত্যধাম, বাজায়ে সে নামের ভেরী।

(৪)

মা কি এমনি মেয়ের মেয়ে,
যাঁর-পদ-তলে শব-ছলে সদা শিব পড়িয়ে।

ধরে অসি মুক্ত কেশে রণ মদে, দিগ বাসে,
নাচিছে সমর উল্লাসে হুঙ্কারে কাঁপায়ে।
মায়ের নামে শমন পলায় ত্রাসে, মুক্ত জীব অষ্টপাশে,
জীব ভাসে চিদানন্দ রসে, ঐরূপ ভাবিয়ে।
জীব শিব মৃত্যুঞ্জয়, মায়ের নামে কিনা হয়,
গেল অকিঞ্চনের ভব ভয় ঐরূপ ভাবিয়ে।

৵ বসন্ত কুমারী দেব্যা :—

তিনি নটবর বাবুর প্রথমা স্ত্রী, ঢাকা নবাবপুরের গোস্বামী-বংশের মেয়ে। স্বামীর অনাদর ও অযত্নে সর্ব্বদাই কাঁদাকাটি করিতেন। মনে ভয়ানক অশান্তি। নটবর জেল হইতে আসিলে বধূ ঠাকুর-বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীও খুব ভালবাসিতে লাগিলেন।

এক বার তিনি স্বামীর অনাদরের কথা মনে করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর বাড়ীর উপর দিয়া মামাশ্বশুর কামিনী গাঙ্গুলীর বাড়ী দোল উপলক্ষে একটী ছেলে সঙ্গে নিয়া যাইতেছিলেন। মা বড় ঘরের পিঁড়া লেপিতেছিলেন, তাঁহাকে এরূপভাবে যাইতে দেখিয়া, কোলে করিয়া ঘরে নিয়া খাইতে দিলেন। তিনি খাইতে আপত্তি করিলেন,—পাছে শাশুড়ী মন্দ বলেন এই আশঙ্কায়। কিন্তু শেষে খাইলেন। খাওয়া দাওয়ার পর দোল দেখিতে গেলেন। কয়েক দিন পরে এক দিন এই বাড়ীতে একাই বৈকালে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন দক্ষিণের ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। তিনি কোথায় যান, কি করেন, কোন যত্ন

করিতে পারিলেন না ইত্যাদি বিষয় মনে করিয়া মা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। নটবর বাবুর বধূ আসিয়াই কোন কথা না বলিয়া মা'কে কাঁদিতে দেখিয়া তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। মাও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনিও কিছু বলিলেন না। এই সময় তাঁহার পিত্রালয় হইতে লোক আসায় তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে দিনে ফাঁক পাইলেই এখানে আসিতেন। তিনি খুব স্বাধীনচেতা রমণী ছিলেন। কাহাকেও ভয় না করিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। মা অনেক সময় বলিতেন, "শাশুড়ী ও ভাসুর দেখিলে কি বলিবে?" তিনি বলিতেন "দেখুক গিয়া।" সময় সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কোলে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেন, কোন সময় বা গা ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নানা কথা বলিতেন, "আমি স্নান করি না আমার গা নোঙরা; আমাকে ছুইতে নাই।" কিন্তু কিছুতেই শুনিতেন না। তাঁহার সরম ভরম কিছুই ছিল না,—যেন একেবারে আত্মহারা। ঠাকুর যেন কত আপন। তিনি বলিতেন, "আমি কাহাকেও ডরাই না।" ঠাকুর বলিতেন, "মা লক্ষ্মী, যাও, বাড়ীতে যাও; কাজ কর গিয়া" তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ঠাকুরের কোলে জোর করিয়া বসিতেন। দক্ষ পাগল কাছে থাকিত, তথাপি কিছু মনে করিতেন না। রাত্রিতে খালে সাঁতার কাটিয়া চলিয়া আসিতেন। স্বামী কলা গাছের ভেলায় আসিতেন। যাইতে দুই জনে একত্র ভেলায় পার হইতেন। মা বলিতেন, "রাত্রিতে

আসা যাওয়া ভাল নয়।" কিন্তু তিনি বলিতেন, "এখানে আসিলে যদি কোন অনিষ্ট হয়, হউক।" ঠাকুর বলিতেন, "লক্ষ্মী মা, তোমরা লক্ষ্মী গোবিন্দের মত সংসারে থাকিবে।" লোকে দেখিলে লজ্জা করে কিনা, পরীক্ষা করিবার জন্য মা বলিয়াছিলেন, "নটবরকে কোলে নিতে পারেন? লজ্জা করিবে না?" তিনি বলিলেন, "লজ্জা কি?" অমনি কোলে নিলেন। ঠাকুরের নিকট ঘোমটা দিতেন না। যেন ভাই ভগিনী বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মনে যত কষ্ট ছিল, নটবর বাবুর জেল হইতে আসার পর অল্প সময় মধ্যেই আশাতীতরূপে দূর হইয়াছিল। ভাদ্র মাসে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া যান।

হরপ্রসন্ন বাবুর ছেলের পায় ঘা হইয়াছিল। মা আশ্বিন মাসে ৺দুর্গা পূজার পূর্ব্বে নটবর বাবুকে নিয়া তাহাকে দেখিতে হরপ্রসন্ন বাবুর ঢাকার বাসায় গেলেন। দেখিয়া আসার সময় ঐ সঙ্গে নটবর বাবু তাহার স্ত্রীকে আনিবেন। যাওয়ার সময় মা গাড়ীতে রহিলেন। নটবর বাবু শ্বশুরের বাসায় বলিয়া আসিতে গেলেন যে, যাবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া যাইবেন। শাশুড়ী গাড়ীতে আসিয়া মা'কে তাঁহাদের বাসায় নেওয়ার জন্য অনেক বলিলেন কিন্তু মা গেলেন না। পরে হরপ্রসন্ন বাবুর বাসায় যাওয়ার সময় মা'র মনে অনুতাপ হইল। আসার সময় মা তথায় উঠিলেন। নটবর বাবুর শাশুড়ী মা'কে বলিলেন "এ মেয়ে তোমাকে দিলাম, ইহাকে তুমি রক্ষা করিবে, তাহার ভালমন্দ দেখিবে। তোমাকে সঁপিয়া দিলাম।" শারদীয়

পূজার পূর্ব্বে নটবর বাবুর স্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, পূজার কয় দিন আর বাড়ী যাইবেন না ঠাকুর বাড়ীই থাকিবেন। কিন্তু জ্যার অশৌচ পড়ায় আর থাকিতে পারিলেন না। পূজার চিড়া প্রভৃতি ঝাড়িয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, কালীপূজার সময় আসিয়া দুই তিন দিন থাকিবেন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন, স্বামীও দ্বীপান্বিতা কালীপূজা করিবেন, তাঁহার আসা হইবে না, তখন আর দুঃখের সীমা রহিল না। দ্বীপান্বিতার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার কলেরা হয়। ব্যারাম হওয়ার এক দিন পূর্ব্বে মা তাঁহাদের বাড়ী যান। তিনি বলিলেন "বস মা।" মা বলিলেন, "এখন বসিব না।" তিনি বলিলেন, না বসিলে যা গিয়া! কালীপূজার দিন ভোরে মা গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে চিনেন কি?" তিনি বলিলেন, "তোরে আমি চিনি না? চিনি। তুই যে কালী! কালী! মহাকালী!" তাড়াতাড়ি কালীপূজা হইয়া গেল। বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। নটবর বাবু বলিতে আসিয়াছিলেন যে, অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন এ বাড়ীতে নিয়া আসা হউক। মা ধমক দিলেন। ইতিমধ্যেই কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। তাঁহার প্রাণ-বায়ু চলিয়া গেল। সেই দিন ভোর হইতেই নানারূপ স্তব করিয়াছিলেন। তখন বিকারগ্রস্থ। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে এত স্তব স্তুতিবাদ জানেন, কেহ জানিত না।

৺মহিমচন্দ্র ভৌমিক :—

তিনি মা'র জ্যেঠতুত বড় ভাই ছিলেন। তাঁহার এক বার

রক্ত অতিসার হয়। তখন শীতকাল। মা'র দিদিমারও তখন ব্যারাম ছিল। মা প্রতি দিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। দিদিমাতাকে দেখিতে ভাইকেও দেখিয়া আসিতেন। তখন মহিম ভৌমিক মা'কে বলিতেন, "আমার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যাইয়া বলিও।" মা বলিতেন, "আসিয়া দেখিতে বলিব ?" তিনি বলিতেন, "না কেবল আমার কথা বলিও।" তিনি কখনও ঠাকুরের নিকট আসা যাওয়া করিতেন না। মা বাড়ী আসিয়া তিনি যাহা বলিতে বলিতেন, তাহাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইতেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে তাঁহার ছোট ভাই উমেশ আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "দাদার অবস্থা খারাপ আপনি যাইয়া দেখিয়া আসিবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা গেলেন। তিনি যাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্ত্রী সেক দিতেছিলেন, তিনি বসা। বলিলেন, "কাকে আর সেক দাও ? আমার সব ছাড়িয়া আসিয়াছে।" মা বলিলেন, "কেন, বসিয়াইত আছেন, তবে একথা বলেন কেন ?" "বোঝত না," এই বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া তাহার মাতার পদধূলি নিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "আমার নাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। আমার বুক পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে। এ সমস্তও বলেন, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "আমার গতি যেন ভাল হয়, আমার গতি যেন ভাল হয়।" এই বুলিই চলিতেছিল। মধ্যে আবার বলিলেন, "আমাকে কে জল দিবে দেও। আমার আর সময়

নাই।” পরে বলিলেন, “আমার জিহ্বা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে। আমাকে বাহিরে নেও।” ইহা বলা মাত্রই শ্রীশ্রী-ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহির করা হইলে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মা সেখানে রহিলেন। বাড়ীতে অতিথি। ঠাকুর বাড়ী আসিয়া অতিথি ও দাদাকে খাওয়াইয়া নিজে না খাইয়া পুনরায় তথায় যাইয়া মা'কে বলিলেন, “আমি ভাত রাধিয়াছি” এ বাড়ীর যার যার ইচ্ছা যাইয়া খাইতে পারে।” শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিলেন মা ও অন্যান্য সকলে কাঁদিতেছেন। শব দাহ প্রায় অর্দ্ধেক। মা'কে কাঁদিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “কান্নাকাটির কোন প্রয়োজন নাই আমি মহিম ভৌমিককে এখনই আনিতেছি।” মা বলিলেন “কাজ নাই আমি দেখ্‌তে চাই না।” শ্রীশ্রীমা নিষেধ করিলেন। লেখক নিষেধ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন, “এইরূপ করিলে লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে ত্যক্ত করিবে, কাজেই এসবে দরকার কি ?”

৺রাজকুমার নাগ ও শ্রীমতি বিনোদিনী মিত্র :—

তিনি সম্পর্কে ঠাকুরের দূরস্থ জ্ঞাতি খুড়তুত ভাই হইতেন। তিনি বরাবর আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার পিতা মা'কে খুব ভালবাসিতেন। মা বলেন, স্বামী-বংশে মা'কে কেহই এমন ভালবাসেন নাই। মা'র যখন ১৪।১৫ বৎসর বয়স, তখন এক বার রাজকুমার নাগের এক ভগিনীর ব্যারাম হয়। তখন কাজকর্ম্ম করিতে মা'কে নেন। দাদা তখন বাড়ীতে। শ্রাবণ

হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মা তথায় থাকেন। কুম্ভকারগণ ৺দুর্গা প্রতিমা তৈয়ার করিত। তাহারা দিনে বাড়ী হইতে খাইয়া আসিত, রাত্রিতে রাজকুমার নাগের বাড়ী খাইত। তাহাদের পাতে যাহা থাকিত তাহা রাজকুমার নাগের মাতা মা'কে খাইতে বলিতেন, মা শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা খাইতেন। ঘরের বউ, কি করেন? খাইতে বাধ্য হইতেন। মা পরে এক বার রাজকুমার নাগের কন্যা সৌদামিনী ও বিনোদিনীর বিবাহে যাইয়া চারি দিন থাকেন। তাহাদের বিবাহ এক তারিখেই হয়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা ছিলেন।

প্রথম প্রথম রাজকুমার নাগ ঠাকুর বাড়ী একাই আসিতেন। পরে সময় সময় তাঁহার ভগিনীগণও আসিতেন। বিনোদিনীর বিবাহের তিন চারি বৎসর পর হইতে রাজকুমার নাগ, তাঁহার স্ত্রী, ছেলেরা, মেয়েরা, জামাই, মেয়েদের ননদ ইত্যাদি বহু লোক আসিতেন। বিনোদিনীও সঙ্গে আসিত। তাঁহারা কোন সময় দুই এক দিন থাকিতেন। কোন সময় বা পর দিনই সব চলিয়া যাইতেন। পূজা আরম্ভ হইলে আসাও বেশী আরম্ভ হইল। তাঁহাদের বাড়ীও ৺দুর্গা পূজা হইত। দশহরার পর দিন তাঁহারা এখানে আসিতেন এবং অন্যান্য সব পূজার সময়ই আসিতেন। সময়ে পার্ব্বতি মিত্র ও তাঁহার স্ত্রী বিনোদিনী একত্র আসিতেন, তখন তাঁহারা কোন সঙ্কোচ ভাবেন নাই। বিনোদিনী ঘোম্‌টা দিত না। স্বামীর সঙ্গে সকলের সম্মুখেই কথা বলিত, ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াও কথা বলিত। পার্ব্বতী বাবু কথা বার্ত্তা

কমই বলিতেন। কোন সময় বিনোদিনী একা তাহার পিসতুত ভাই, কিম্বা বিমলার সঙ্গে, কোন সময় বা নগরবাসী ভূমালীর সঙ্গে আসিত। সে এখানে থাকিয়া দুই এক দিন উঠানে ও ঘরের পিছনে অজ্ঞানের মত পড়িয়া থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে ধরিয়া আনিতে বলিতেন। মা ধরিয়া আনিয়া শোয়াইয়া রাখিতেন।

বিনোদিনী ঠাকুরকে অনেক ত্যক্ত করিত। বেশী রাত্রিতে যখন সকল লোক চলিয়া যাইত, শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতেন, তখন যাইয়া আবার বসিত ও কথা বলিত। মা বলিতেন, "ঠাকুরের শরীর ভাল না, ব্যথার ব্যারাম।" সে বলিত, "তাঁর আবার সুখ দুঃখ কি?" তখন মা বলিতেন, "তবে আর কি? এখন কুড়াল দিয়া যাইয়া কোপাও।" শ্রীশ্রীঠাকুর খাবার সময় অন্য লোক কাছে গেলে খাইতে পারেন নাই। তথাপি বিনোদিনী খাবার সময় কাছে যাইয়া বসিত ও সর্ব্বদা ঠাকুরকে নানারূপ ত্যক্ত করিত। কাজেই উহার এরূপ চাল চলতি ও ত্যাক্ত করা মা'র ভাল লাগিত না, এবং এরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। উহাদের বাড়ীর অন্য ভগিনীরা ও পিসীরা আসিতেন কিন্তু এরূপ ত্যক্ত কেহ করিতেন না। মাও তাঁহাদিগকে কিছু বলিতেন না। মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ত্যক্ত করিতে নিষেধ করিতেন তাই বিনোদিনী মা'কে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত।

বিনোদিনী সব সময় স্বাধীন ভাবে চলিত। যখন তাহার বয়স ১৬।১৭বৎসর*, সে শ্বশুরালয় কুইচামরা হইতে বিমলার

* বিনোদিনী মিত্রের 'শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়' ১৩৩০ সন সংস্করণ পৃঃ ১৭৩।

সঙ্গে কাহাকেও না বলিয়া একাকী রাত্রে চলিয়া যায়‡। সেই দিনই মাত্র সে পিত্রালয় হইতে ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে তথায় আসিয়াছিল। তখন পার্ব্বতী বাবুও বাড়ী ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে আর গ্রহণ করিবেন না, এমন কি মুখও দর্শন করিবেন না, সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন§ ইত্যাদি কথা বলেন। এই ব্যাপার নিয়া খুব গোলমাল চলে। রাজকুমার নাগ পার্ব্বতীর আচরণ দেখিয়া মনে করিলেন, তিনি বিনোদিনীকে নিয়া সংসারী করিবেন না। তিনি ব্যস্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া সব বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন পার্ব্বতী বিনোদিনীকে নিয়া সংসার করিবে না, তখন আপনি আপনার অন্য কন্যা পার্ব্বতীকে দেন।" শ্রীশ্রীমা ইহা রাজকুমার নাগের নিকট শুনিয়া বলিলেন, "এমন কাজ কখনও করিবেন না। পার্ব্বতী আর বিনোদিনী যদি সংসারী না করে তবে আমি নাক কাটিয়া কুত্তার পায়ে দিব।" পার্ব্বতী বাবু পরে তাহাকে নিয়াই সংসার করেন। এখন তাহার দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বদেহে থাকিতে, বিনোদিনী মাসে ৫।৭ বারও আসিত। ঠাকুর যখন শেষ শয্যায় শায়িত, তখন পার্ব্বতী বাবুর সঙ্গে এক দিন মাত্র আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া যায়।

হরপ্রসন্ন বাবু বলেন, বিনোদাকে আসিতে দেখিলে শ্রীশ্রীঠাকুর জোরে জোরে বলিতেন, "অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী,

‡ বিনোদিনী মিত্রের 'শ্রীশ্রী নাগ মহাশয়' ১৩৩০ সন সংস্করণ পৃঃ ১৭৭। § ঐ বহি পৃঃ ১৭৮।

তারা, মন্দোদোরী তথা। পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহা পাতক নাশনম্"। সে চলিয়া গেলে আরও কত কি বলিতেন।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ মিত্র ঃ—

তাঁহার বাড়ী কুইচামোরা, বিক্রমপুর। তিনি ঢাকা কলেজে পড়িতেন। তাঁহার পড়ার খরচ রাজকুমার নাগ দিতেন। কতক তিনি নিজেও যোগাড় করিয়া লইতেন। বিমলাচরণ দে রাজকুমার নাগের মামাত ভাই ছিলেন, বিমলা ঢাকা চাকুরী করিতেন। তাঁহারা দুই জনে একত্র শনিবার ঠাকুর বাড়ী আসিতেন রবিবার থাকিয়া সোমবার চলিয়া যাইতেন। হরপ্রসন্ন বাবু ও শরৎ বাবু যখন এখানে আসিতেন তখন ইহাঁরাও আসিতেন এবং সকলের সঙ্গে গান করিতেন। পার্ব্বতী বাবু বেশী কথাবার্ত্তা বলিতেন না। লোকে যাহা বলিত, তাহাই বেশীর ভাগ শুনিতেন, সময় সময় দুই একটী কথা বলিতেন। যখন তাহার স্ত্রী বিনোদিনী নিকটে থাকিত, তখন সেই কথা বলিত তিনি শুনিতেন। পার্ব্বতী বাবু বি-এ পরীক্ষায় কয়েকবার ফেল করেন। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে আসিতে দেখিলে ঠাকুর বলিতেন, "আপনারা লক্ষ্মী গোবিন্দের ন্যায় সংসারে থাকিবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর যখন এরূপ বলিতেন তখন মা বলিতেন, "আপনি এরূপ বলেন, ইহাতে তাহারা ভুল বুঝিবে, অমঙ্গল হইবে।" তিনি বলিতেন, "নাহিয়া মরুক যাইয়া। এইরূপ বলিলে সুখী হয় তাই বলি।" এই দম্পতীকেও ঠাকুর ঐরূপ বলিতেন। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর দুই আনা মূল্যে এক সের দুগ্ধ রাখিয়া-

ছিলেন। ভাঙ্গা পয়সা ছিল না। পার্ব্বতী বাবু পয়সা দিতে চাহিলে তিনি কিছুতেই নিতে চাহিলেন না। তখন পার্ব্বতী বাবু বলিলেন, যে, পয়সা যেন ফিরাইয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে পয়সা দিয়া দিতে বলিলেন। মাও পরে তাহা দিয়া দিলেন। পার্ব্বতী বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ ত্যাগের ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতে রোজই রাত্রিতে আসিয়া ভোরে চলিয়া যাইতেন। দেহ ত্যাগের পর দিন তিনি চলিয়া যান।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—

ইনি ৺অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী পুরোহিতের পুত্র। প্রথম ২ পূজার সময় তিনি পিতার সঙ্গে ঠাকুর বাড়ী আসা যাওয়া করেন, পরে এখানে গান বাদ্যও করিতেন। খোল বেশ বাজাইতে পারেন। গানে আত্মহারা হইয়া খোল বাজাইতে বাজাইতে ঘামে ঘামময় হইতেন। হাঁটু গাড়িয়া খোল বাজাইতেন, তাহাতে তাঁহার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ফাটিয়া রক্ত বাহির হইত। নটবর বাবুর মোকদ্দমার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বাজারের পথে বলিয়াছিলেন, "আপনি যাহা জানেন, তাহা ছাড়া মিথ্যা যেন বলেন না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "মিথ্যা বলিব না।" তাঁহাকে গ্রামের আরও অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। তাহাতে নটবর বাবুর জেল হয়। তদবধি তিনি আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দেখিলেই লুকাইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রাণে একটা আতঙ্ক হইয়াছিল। নটবর বাবু

জেল হইতে আসিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আনেন, আবার গান বাজনায় প্রবৃত্ত করান। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পর কতক দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার ভোগ আরতি তিনিই করিতেন এবং ঠাকুর বাড়ীর সমস্ত পূজা করিতেন। নটবর বাবু মা'র সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে আসিয়া প্লেগে আক্রান্ত হন। তখন নটবর বাবু মরিয়া যাইবে বলিয়া অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পথ্য পাচন সব তিনিই তৈয়ার করিয়া দিতেন। চন্দ্রকুমার দাসের যজ্ঞের দিন নটবর বাবু তাঁহাকে দিয়া শ্রীশ্রীমা'কে অঞ্জলি দেওয়ান। অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববৎই পূজাদি করিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া প্রণাম করেন ও প্রসাদ খান। অশ্বিনী বলেন, নটবর বাবুর জ্যেঠতুত শ্বশুর, বেজগাঁও নিবাসী আনন্দ মজুমদার এক দিন ঠাকুর বাড়ী অনেক সময় বসিয়া চলিয়া যায়। তখন অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী ও ঠাকুর ছিলেন। মজুমদার মহাশয় চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, এই ব্রাহ্মণের ভিতর এত সয়তানি! তাহার মাথা যেন পোকে খাইয়া শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে; ইহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি"। গত দুই বৎসর হয় অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বাড়ীর রাস্তার মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। তদবধি তিনি ঠাকুর বাড়ী আসিতে পারেন না। ঠাকুর বাড়ীর সম্পর্কীয় কেহ তাঁহাকে দিয়া পুরোহিতের কোন কাজ করান না।

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র দাস :—

ইনি ঠাকুরের ভায়রা। সেহাচর তাহার নিজ বাড়ী ছিল।

সেই বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গেলে দেওভোগ শ্বশুর বাড়ী থাকিতে আরম্ভ করেন। দেওভোগ আসা অবধি তিনি পূজা পার্ব্বনে ঠাকুর বাড়ীর হাট বাজার করিতেন। যখন টাকা পয়সা না থাকিত, তখন তিনিই চালাইতেন। কিন্তু টাকা আসা মাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা দিয়া দিতেন। তিনি কাহারও এক কপর্দ্দক কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি গয়া কাশী গেলে দাস মহাশয় ঘরের ভাঙ্গা বেড়া সব মেরামত করেন। তিনি বাড়ী আসিয়া মা'কে বলিলেন, "এখন এসব কেন ? আমি গিয়া লই, শেষে ভাল ঘরে দুয়ারে থাকিও।"

ঠাকুর বাড়ী দাস মহাশয়ের বাজারের পথে। আসিতে যাইতে বাজার হইতে কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানিবার জন্য এ বাড়ী হইয়া যাইতেন। অধিকাংশ সময় হাট বাজার তিনিই অম্লান বদনে করিতেন। মাছ তরকারী যখন কিছু আনিতেন এ বাড়ীতে দিয়া, শেষে নিজ বাড়ীতে যাইতেন।

অর্দ্ধোদয় যোগের সময় ঠা'নদিদি ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসেন। গঙ্গা স্নানে যাইতে না পারায় বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করান। দাস মহাশয় মদ খাইয়া আসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক জিনিষ আনিতে চাহিয়াছিলাম তাহারা দিল না। আপনারা আস্তে আস্তে খান। আমি সব আনিব।" এইরূপ মাতলামী করিতে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দাস মহাশয়কে ওখান হইতে সরিয়া যাইয়া সুস্থির হইয়া বসিতে বলিলেন, এবং মদ খাওয়া

যে অত্যন্ত দোষের, তাহা নানারূপ বুঝাইয়া বলিলেন। সেই অবধি তিনি তাহার বহু কালের অভ্যাস মদ খাওয়া চির দিনের জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

দাস মহাশয় তাঁহার উত্তরের ভিটীতে ঘর তুলিয়াছিলেন। গৃহ সঞ্চার উপলক্ষে কালীপূজা করার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "রটন্তী চতুর্দ্দশীর দিনই পূজা করুণ।" তাহাই হইল। পূজার পর দিন অমাবস্যাতেই তাঁহারা ঘরে গেলেন। শ্রীশ্রীমা ভগিণীকে বলিয়াছিলেন, "অমাবস্যার দিন ঘরে যাইবে?" তিনি বলিলেন, "ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন অমাবস্যাতেই যাইব।" শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি ঠাকুর বাড়ী হইতে কুলা ও সরা নিয়া প্রত্যেক বৎসর ৺রটন্তী কালীপূজা করা হয়। প্রথম পূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর, দাদা ও শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন। পরে আর যান নাই। মা যাইয়া পূজার সব তৈরার করিয়া দিয়া আসিতেন। কোন বৎসর পূজার সময় থাকিতেন, কোন বৎসর বা পূর্ব্বেই চলিয়া আসিতেন। পূজা উপলক্ষে ঠাকুর বাড়ী যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রন করিতেন ও পর দিন খাওয়াইতেন। কৈলাস দাস যে বৎসর প্রথম কালী-পূজা করেন তার পর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও দাদাকে খাওয়ান।

৺হরকামিণী দেবী :—

তিনি মার ছোট ভগ্নী কৈলাস দাস মহাশয়ের স্ত্রী। পূজা পার্ব্বণে যেমন দাস মহাশয় হাট বাজার ও বাহিরের কাজ কর্ম্ম

করিতেন তেমনি হরকামিণী দেবী ঘরের কাজ রান্না বান্না ইত্যাদি সব করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন।

লীলা সংবরণের ১৪ দিন পূর্ব্বে তিনি ঠাকুর বাড়ী আসেন। যে দিন শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে সেবা করিতে ডাকিয়াছিলেন সেই দিন হরকামিণী দেবী পাক করিতে গেলেন। লীলাসংবরণের ৬ দিন পূর্ব্বে, শুক্রবার রাত্রি একটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কল্পতরু হইয়াছিলেন, তখন কাহাকেও না বলিয়া তিনি তাঁহার স্বামীকে তাহা দেখাইতে একাকী দৌড়িয়া নটবর বাবুদের বাড়ী যান, তথা হইতে বৈকুণ্ঠ মজুমদারকে নিয়া বাড়ী যাইতে। বৈকুণ্ঠ মজুমদার তাঁহাকে ঠাকুর বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিজে যাইয়া দাস মহাশয়কে নিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ ত্যাগ হইলে তাঁহার গলার সোণার মালা স্বামীর নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "ইহা বন্ধক রাখিয়া দাহ করার জন্য ঘৃত, চন্দন প্রভৃতি আনুন।" উহা বন্ধক রাখিয়া তাহাই করা হইয়াছিল। তদবধি তিনি আর গহনা পত্র পরেন নাই। কোন নিমন্ত্রণ খান নাই। সখের যাহা কিছু সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমনকি যাহা ভাল খাবার তাহাও খাইতেন না। পরে তাহার এমন হইল যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ঠাকুর প্রণাম না করিয়া খাইতেন না। প্রণাম করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবয়ব সম্যক্ দেখিতে না পাইতেন, সে পর্য্যন্ত শুধু প্রণামই করিতেন। তিনি মা'র

সঙ্গে তীর্থাদিতে গিয়াছেন। তিনি শেষ সময় ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ না খাইয়া জল গ্রহণ করেন নাই। স্বামীর দেশ ছাড়িয়া এখানে আসায় তাঁহার বড়ই লাগিয়াছিল। তাহার বড়ই অপমান ও ঘৃণা বোধ হইত। কিন্তু যখন ঠাকুর-বাড়ী আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন তখন বলিতেন, "আমার বহু তপস্যার ফলে এখানে আসিতে পারিয়াছি। নতুবা সর্ব্বদা এমন যাতায়াত করিতে পারিতাম না।" তাঁহার মেয়ের প্রথম সন্তান হওয়ার সময় প্রসবে খুব কষ্ট হয়, ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় যান। যাওয়ার অল্প সময় মধ্যেই ছেলে হইল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে কি খাইবে?" তিনি মাছের ঝোল ও ভাত খাইতে বলিলেন। কিন্তু এদেশে নয় দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে মাছ বা তরকারী দেওয়া হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, আর দ্বিধা নাই,—তাহাই দেওয়া হইল। তদবধি তাঁহার যত ছেলে মেয়ে, ছেলের বধূ ও মেয়েদের সন্তান জন্মিয়াছে ঠাকুরের ঐ ব্যবস্থাই তাঁহারা পালন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন অসুখ হয় নাই।

লীলাসংবরণের পর এক বার হরকামিনী দেবী দারুণ অদ্ভুত রোগে শয্যাগত হন। বার বৎসর ভোগেন। মা তাঁহাকে ঠাকুর-বাড়ী আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া চিকিৎসা দ্বারা ভাল করেন। তিনি কিছু দিন ভাল থাকিয়া পুনরায় ঐ রোগে বৎসরাধিক ভুগিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যু সময় শ্রীশ্রীমা যাইয়া তাঁহার বাড়ীতে সাত দিন থাকেন। মৃত্যুর পর চলিয়া আসেন। মা'র

সম্মুখেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন মা ও তাঁহার মেয়ে নিকটে ছিলেন। মা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুই আমাকে রাখ, তুই আমাকে রাখ।" মা চুপ করিয়া রহিলেন। মৃত্যুর সময় মা তাঁহার মুখে দুই তিন ফোটা প্রসাদী কমলার রস দিলেন, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহার প্রাণ বায়ু চলিয়া গেল।

শরৎ বাবু বলেন, একবার ঠাকুর কলিকাতায় থাকিতে হরকামিণী দেবীর বাড়ী এক ছড়া কলা হয়। তাহা তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেওয়ার মানসে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাড়ী ফিরিবার পনর দিন পূর্ব্বেই মা জেদ করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। হরকামিণী দেবী তাড়াতাড়ি উহা হইতে বাছিয়া এক ফানা কলা তাঁহার জন্য রাখিয়া দিলেন। পনর দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিলে ঐ কলা তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কলা একটুও নষ্ট হয় নাই। তিনি প্রীত হইয়া কতক কলা উহা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺আদিত্য চন্দ্র ঘোষ :—

ইনি কৈলাস দাস মহাশয়ের জামাতা। তিনি ঢাকায় পড়িতেন। হরপ্রসন্ন বাবু, শরৎ বাবু প্রভৃতি যখন আসিতেন তিনিও তখন আসিতেন, সকলের সঙ্গে গান গাইতেন। আদিত্য বাবুকে তাহার শাশুড়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ রক্ষার সময় এখানে তার করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিনি তখন মৈমনসিংহে ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া মানিতেন। তাঁহার কোন আরাধ্য দেবতা থাকিলে, শ্রীশ্রীঠাকুরই। তিনি অনেক

গানও লিখিয়াছিলেন। এক সময় আদিত্য বাবু, নটবর বাবু, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী চন্দ্রকুমার দাস ও অন্যান্য সকলে একটী পন করিয়াছিলেন যে, মঙ্গল আরতির জন্য ভোরে কে কাহার আগে ঠাকুর বাড়ী আসিতে পারেন। আদিত্য বাবু তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে অযথা গালাগালি করিতেন বলিয়া, শ্রীশ্রীমা তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ধন্বন্তরীর বংশ বলিতেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুর বাড়ীই ছিলেন। ১৩৩৪ সনের আশ্বিন মাসে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোক গমন করেন। শ্রীশ্রীমা প্রতি দিন নৌকা যোগে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বে মা তাঁহাকে দেখিয়া আসেন। তখন মৃত্যুর কোন লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল না। মা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আসার সময় সে মা'কে প্রণাম করিতে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন কিন্তু আর পারিলেন না। মা বাড়ীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ :—

ইঁহাদের বাড়ী কোরহাটী, বিক্রমপুর। ইহারা খুড়তুত জ্যেঠতুত ভাই ; একপ্রাণ ; যোগেন্দ্র বাবু বড়। মনীন্দ্র বাবু এই গ্রামের লালমোহন গুহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। সে মেয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীমা'র ও নটবর বাবুর কথায় অন্য কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়।

লালমোহন গুহ মহাশয় ঠাকুরের নিকট যাতায়াত

করিতেন, সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে জানাইতেন। মনীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ভাল সম্বন্ধ, করুন।" সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে শুনিয়া তিনি হাতে তুড়ি দিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।" বিবাহ আসর সাজান হইলে, তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মা'কে বলিয়াছিলেন জামাই আসিলে জল খাইতে দিও। সে আসিয়া না বসিয়াই অন্য বাড়ী চলিয়া যায়। বিবাহের কিছু দিন পরে মণীন্দ্র বাবু ও যোগেন্দ্র বাবু মাছ মাংস খাওয়া ও জুতা ছাতি ব্যবহার করা ছাড়িয়া দেন। মণীন্দ্র বাবু স্ত্রীকে সঙ্গে শুইতে দিতেন না, দিলেও কোল বালিশ মধ্যে রাখিয়া স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করেন, একথা তাঁহার দিদি শাশুড়ী আসিয়া কাদিয়া কাটিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলিয়াছিলেন।

প্রথম এক দিন যোগেন্দ্র বাবুকে নিয়া মণীন্দ্র বাবুর দিদি শাশুড়ী ঠাকুর বাড়ী আসেন; তখন বর্ষাকাল। যোগেন্দ্র বাবু বলেন নৌকা পুষ্করিণীতে পেঁৗছিলে তাহার নিতান্ত ছটফটানি আরম্ভ হয়। কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরত সবই দেখেন ও জানেন। এই কুৎসিত মনঃ প্রাণ নিয়া কেমনে তথায় যাওয়া যায়। কিছু ক্ষণ পরেই আবার এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন যে, যাহা হউক, তবুও চর্ম্ম চক্ষে ভগবান্ দর্শন করিয়া লওয়া যাক। পরে মণীন্দ্র বাবু ও আসিতে আরম্ভ করেন। শ্বশুর বাড়ী আসিলেই এখানে আসিতেন। বৈকালে আসিলে, তাঁহার শ্যালককে নিয়া আসিতেন, রাস্তায় বসিয়া থাকিতেন। বর্ষা-

কালে খালে নৌকায় থাকিতেন। সকলে চলিয়া গেলে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতেন।

যোগেন্দ্র বাবু ও মণীন্দ্র বাবু ময়মনসিংহে এক পাটের অফিসেই কাজ করিতেন। যোগেন্দ্র বাবুও দেশে আসিলে এখানে আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "মাছ মাংস খাইলে ও জুতা ছাতি পারিলে কি হয় ?" ইহা শুনার পর হইতেই তাঁহারা সবই আরম্ভ করিলেন। মণীন্দ্র বাবুর প্রথমা স্ত্রী দুই ছেলে হইলে পর পরলোক গমন করেন। মণীন্দ্র বাবু তখন জলপাইগুড়ি চাকুরী করেন। তথায় স্ত্রীর চিতার উপর তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া মঠ দিয়াছেন।

যখন তাহারা ময়মনসিংহে চাকুরী করেন, তখন নটবর বাবুও সেখানে পাটের অফিসে চাকুরী করেন। তাঁহাদের তথায় দেখাশুনা হয়। নটবর বাবুর কথায় তাহাদের ঠাকুর বাড়ীর ভাব ফোটে ও মাখামাখি বেশী হয়। মণীন্দ্র বাবু ও যোগেন্দ্র বাবুর অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, নটবর বাবুর পদ সেবা করিতে করিতে রাত্রি ভোর হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "ছেলে দুটী ভালই।"

৮ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (লেছরা) ঃ—

ইনি ঠাকুরের ভাগিনেয়। কৈলাস দাস মহাশয় যখন দেওভোগ আসেন, তখন রিক্ত হস্তে আসেন। পয়সার অভাবে পান আনিতে না পারিয়া তুলশী পাতা চিবাইতেন। তাঁহার স্ত্রীর গহনা পত্র বন্ধক দিয়া টাকা আনিবার জন্য তাহা

ঠাকুর বাড়ীতে রাখেন। কিন্তু তাহা চুরি যায়। শ্রীশ্রীমা বলেন, "ঘরে আমি আর লেছ্‌রা থাকি। লেছ্‌রা না নিলে আর কে নিবে?" তিনি লেছ্‌রাকে নানারূপ বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—কোথাও বন্ধক দিয়া থাকিলে খালাস করিয়া আনা হইবে ইত্যাদি। এই কথাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মা'র সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, বলিলেন, "তুমি না দেখিয়া এরূপ কেন বল? সে নেয় নাই।" লেছ্‌রাও মা'কে নানারূপ গালাগালি করে, এবং দৌড়িয়া দৌড়িয়া মারিতে পর্য্যন্ত যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এরূপ মিথ্যা বলিয়াছ, তোমাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।" লেছ্‌রা বকাচ্ছলে বলিয়াছিল, "সূর্য্য ঠাকুর যেন বিচার করেন।" মাও বলিলেন, "তাই হবে। সূর্য্য ঠাকুরই বিচার করিবেন।" পরে বাহির হইল যে লেছ্‌রাই গহনা বন্ধক দিয়াছে। মা বলেন," সে-যে গালাগালি দিয়া মা'কে মারিতে আসিয়াছিল সে চেহারা অদ্যাপি মনে পড়ে।" তদবধি মা তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন নাই। ঐ জিনিষ আর আনা হইল না। ঐ জিনিষ যাওয়াতে দাস মহাশয় একটী কথাও বলেন নাই। লেছ্‌রার চুরি ধরা পড়িলেও মা আর তাহা মুখে আনিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর কিম্বা দাদা তবুও তাহাকে একটী কথাও বলিলেন না।

তাহার ব্যারাম হইলে মৃত্যুর ২০।২৫ দিন পূর্ব্বে তাহার পিসীমা তাহাকে এখানে রাখিয়া যায়। পর দিন তাহার মাতাকে তাহাদের বাড়ী পঞ্চসার হইতে আনান হয়। তাঁহার বয়স

২৪।২৫ বৎসর। প্লীহা ছুটিয়াছে। সে পূর্ব্বের ঘরে থাকিত। শেষ দিন রাত্রিতে যখন হাত পা ঠাণ্ডা হয়, লেছ্‌রা তাঁহার মাতাকে বলিল, "মামাকে ডাক দাও।" ডাক দিতেই শ্রীশ্রী-ঠাকুর গেলেন এবং শ্রীশ্রীমা'কে দেখিতে ডাকিলেন। তিনিও গেলেন। প্রাণ বাহির হবার সময় সে নিজে এবং তাহার মাও ঠাকুরের পায়ের ধূলি নিয়া তাহার মাথায় দিল, প্রাণ বায়ু চলিয়া গেল। সারা রাত্রি ঘরে রহিল। বর্ষাকাল, উঠানে জল। পরের দিন দাহ করা হইল।

৺সেখ একাব্বর ফকির ঃ—

তাঁহার বাড়ী কাশীপুর। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী তিন পুত্র প্রসব করিয়া যখন পরলোক গমন করেন তখন একাব্বরের বয়স ষাট বৎসর। তিনি অশীতি সৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। একাব্বর এক দিন দুগ্ধ বেচিতে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর দুগ্ধ রাখিয়া যে মূল্য দেন, বাজারে একাব্বর তদপেক্ষা এক পয়সা কম দরে বিক্রি করেন, কাজেই ঠাকুরের ঐ এক পয়সা ফিরাইয়া দিয়া যান। একাব্বর সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিতেন। রাত্রিতেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া নানারূপ ধর্ম্মালাপ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্ন জাতীয় কাহাকেও কখনও উচ্চ জাতীয় লোকের সঙ্গে এক আসনে বসিতে দিতেন না, কিন্তু একাব্বরের বেলায় ঘর হইতে পাটী বালিশ নিয়া তাহাকে শুইতে দিতেন। একাব্বর তাহা

ব্যবহার করিতেন না। তিনি আক, তরমুজ, বাঙ্গি, খিরাই কিম্বা অন্যান্য তরকারী,—যখন যাহা ক্ষেতে হইত, ঠাকুরের জন্য নিয়া আসিতেন; তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। একাব্বরও কিছুতেই না দিয়া ছাড়িবেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর শ্রীশ্রীঠাকুর মূল্য দিলে তিনি অল্প মূল্য নিয়া তাহা রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। সময় সময় তাঁহার বাড়ীও গিয়াছেন। হরপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি যখন ভাবে বিভোর হইয়া মা'র কোলে উঠিতেন তখন একাব্বরও বলিতেন, তোমরা মা'র কোলে উঠ, আমি বুঝি উঠিতে পারি না? আমিও উঠিব। শ্রীশ্রীমা'কে তিনি মা বলিয়া ডাকিতেন। সব সময়ই বলিতেন, "যত হবে ব্যক্ত তত হবে ত্যক্ত। যত থাক্‌বে গুপ্ত তত হবে পোক্ত।" মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে সে তাঁহার ছেলেকে দিয়া মা'কে বলিয়া পাঠাইলেন তাহার প্রসাদ খাইতে ইচ্ছা হয়। মা অন্ন-ব্যঞ্জন, পিঠা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া প্রচুর পরিমাণে পাঠাইলেন। তাহা তাহারা শত সেলাম করিয়া মহা আহ্লাদের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি আর কিছু খান নাই, কেবল এক বাটী চা খাইতেন। কোন ব্যারাম ছিল না, তথাপি শরীর খারাপ। সাত দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "আর বাঁচিব না।" বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। শেষ দিন প্রাতে অনেক লোক দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় ছেলেকে উত্তর শিয়রি করিয়া তাঁহাকে শোয়াইতে বলিলেন। শোয়ান

হইলে অতি অল্প সময় মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। বহু লোক অতি সমারোহে তাঁহাকে কবর দিল।

ঠা'নদিদি (শ্রীশ্রীমা'র মা) ঃ—

ইঁনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া মানিতেন। তিনি শিব পূজা না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। এক বার যখন কলিকাতা ঠাকুরের বাসায় মা'র নিকট গিয়াছিলেন, তখন গঙ্গাতে স্নান করিয়া কিনারায় বসিয়া শিব পূজা করিতে শিব ফাটিয়া যায়। তদবধি তিনি আর শিব পূজা করেন নাই। এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর পিতার সঙ্গে কথায় কথায় উত্তেজিত হইয়া কাপড় ফেলিয়া লেংটা হইয়া পড়েন। তখন ঠা'নদিদি এ বাড়ীতে ছিলেন, দৌড়িয়া পলাইলেন। পরে সকলে ঠাট্টা করিয়া বলিত, "ঠা'নদিদি, শিব লিঙ্গ দেখিয়াছেন ?" ঠা'নদিদি বলিতেন, "না, আমি দেখি নাই !" লীলাসংবরণের পর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো সর্ব্বদা প্রণাম করিতেন। তাহাতে শ্রীশ্রীমা বলিতেন,"এ কি কর ?" তিনি তাহা কিছুতেই শুনিতেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার জামাতা শিব।

শেষ সময় ঠা'নদিদি বলিতেন, তিনি যেন খুব কীর্ত্তন শুনিতেছেন, এবং অন্য লোকেও শোনে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু অন্যে কিছুই শুনিতে পাইত না। তিনি মা'র সঙ্গে তীর্থাদি দর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা' তাঁহাকে ছাড়া কোথাও যান নাই।

ঠা'নদিদি খুব ভাল রান্না করিতে পারিতেন। কেহ খাইয়া প্রশংসা করিলে, তাহাকে যে, কি ভাবে খাওয়াইবেন, তাহা

ভাবিয়া পাইতেন না। তিনি নিজে না খাইয়া লোককে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। মা তাঁহাকে দুগ্ধ খাইতে দিতেন, কিন্তু তিনি ঠাকুর চাকরের জন্য রাখিয়া দিতেন। মা বলিতেন, "তাহাদিগকে দিয়াছি।" ঠা'নদিদি বলিতেন, "দিয়াছ দিয়াছ, আমিও দিব।" এখানে যাঁহারা আসিতেন, সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন, সকলকেই আপন বলিয়া মনে করিতেন। কোন সময়ই কাহাকেও কটু কথা বলেন নাই।

ঠা'নদিদি যখন মা'র সঙ্গে কলিকাতা গিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আদর যত্ন করিতেন। পুণ্যক্ষেত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতে মা'র সম্মুখে ১৩২৮ সনে চৈত্র মাসে ৯৫ বৎসর বয়সে ঠা'নদিদি পরলোক গমন করেন। তাঁহাকে কোন জায়গায় পোড়ান হইবে, এসম্বন্ধে লেখকের মত জিজ্ঞাসা করায়, লেখক মা'র অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে মা বলিয়াছিলেন, "আমার কোন ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই; সুখও নাই, দুঃখও নাই; ভালও নাই, মন্দও নাই; যাহা বলেন তাহাই করিব" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের উত্তরের গোল কোঠায় তাঁহাকে দাহ করা হয়। দাহ করার সময় বহু লোক হইয়াছিল এবং তুমুল কীর্ত্তন হয়। মা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন।

৺কামিনী কান্ত গাঙ্গুলী :—

ইনি কাশীকান্ত গাঙ্গুলীর ছেলে। ছোট সময় তাঁহার পিতার অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল। তিনি অতি কষ্টে লেখা পড়া শিখেন। ৺কালীচরণ ভৌমিক মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার

বাড়ী থাকিয়া, নিজে পাক করিয়া খাইয়া, লেখা পড়া শিখেন। পরে পাটের অফিসে কাজ করিতেন। অবস্থাও ভাল হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ঠাকুর বাড়ী আসিতেন এবং সকলের সঙ্গে গান করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে কয়েকটী গান লিখিয়াছিলেন, একটী গান গাহিতে গাহিতে এক দিন আত্মহারা হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অনেক সময় পরে চৈতন্য হয়। সেই গানটী নিম্নে দেওয়া হইল।

তিনি দোল করিতেন। তাঁহার বাড়ী হইতে মেটে হোলির দিন সকলে কীর্ত্তন নিয়া কাদা মাখিয়া ঠাকুর-বাড়ী আসিয়া কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এক পাশে দাঁড়াইয়া দুই এক বার হাতে হাত মিলাইয়া আস্তে আস্তে করতালি দিতেই কি যেন ভাবের উদয় হইত! সকলে গানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। একেবারে আত্মহারা হইয়া নাচিয়া বাজাইয়া ও গান করিয়া বিভোর হইয়া যাইতেন। তিনি ঠাকুরকে কি ভাবিতেন, তাঁহার রচিত গানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিন মণ্ডপে খুব কীর্ত্তন হইতেছিল; কামিনী বাবুও গাইতেছিলেন। গাহিতে গাহিতে তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়া গেলেন। পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি বাতাস দিতে লাগিলেন। ভাবে বিভোর, একেবারে বাহ্য জ্ঞান রহিত। অনেক সময় পরে চৈতন্য হইল।

কামিনী বাবু যখন আসিতেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিবা মাত্র হয় একটা বড় পিড়ি নতুবা সতরঞ্চি নিয়া দৌড়িয়া

াহির হইতেন। মণ্ডপে বসিতে গেলে তোষক পাতিয়া দিতেন। তনি চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সে মাসিলে এরূপ করেন কেন? অন্যের জন্যত করেন না।" তখন তিনি বলিয়াছেন, "যে যেমন লোক, তার জন্য সেরূপ ব্যবস্থা।"

কামিনী বাবু নূতন বাড়ীতে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'কে খাইতে বলেন। মা'কে একখানা সরু লাল পেড়ে সাধারণ কাপড় দেন। সাধারণ ভাবে মাছ ভাত খাওয়ান। ঠা'ন-দিদি সময় সময় কামিনী বাবুর নিকট হইতে গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার আনিতেন, তিনি তাহার সুদ রীতিমত নিতেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীকে মা এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার কোন ব্যারাম হইলে মা বলিতেন, "তাঁর ব্যারাম আমার হউক, সে ভাল থাকুক।" এক বার মা গহনা রাখিয়া চারি টাকা আনেন। এক মাসে তিন আনা সুদ দেন।

কামিনী বাবুর গান ঃ—

(আমরা) চাইনা সাধন চাইনা ভজন সাধনের ধন পেয়েছি,
যতনের ধন যতন ক'রে হৃদ-মাঝারে রেখেছি।
সে ত গোলকে গোপনে ছিল যোগী ঋষি কেউনা পেল,
সে যে আপনি এসে দেখা দিল তাইতে মোরা দেখেছি।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরা, সাধন ক'রে হ'ল সারা,
সে ত সেধে এসে দিল ধরা, তাইতে মোরা ধরে'ছি।
তাঁরে যে চেয়েছে সে পেয়েছে, যে দেখেছে সে ভুলেছে,

সেত মন মজাতে ভাল জানে, তাইতে মোরা মজেছি।

৺প্রসন্ন কুমার নাহা :—

তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াইতে ক্ষীর ও আম-সত্ত্ব আনেন। বর্ষাকাল বহু লোক সঙ্গে নৌকায় আসিলেন। পূর্ব্ব দিন মা সকলকে পাক করিয়া খাওয়াইলেন, কিন্তু প্রসন্ন নাহা খাইলেন না, কাজেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা'র খাওয়া হইল না। ঠাকুর তাহার জিনিষ না খাইলে তিনিও খাইবেন না, ইহাই মনের ভাব। পর দিনও মা পাক করিলেন, অন্যান্য সকলে খাইল, নাহা খাইলেন না। সে জন্য ঠাকুর ও মা খান না। বৈকালে নটবর বাবু আসিয়া দেখিল, ঠাকুর ও মা খান নাই। নাহাকে খাইতে অনেক অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি খাইলেন না। পরে তাঁহাকে বলা হইল, "না খান ত চলিয়া যান। নতুবা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা খাইবেন না।" তিনি কিছুই করিতে রাজী নন। দুদিন চলিয়া যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা কিছুই খান না। কাজেই তাঁহাকে উত্তম মধ্যম দিতে হইল। তখন না খাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বেও তিনি মেয়ে লোক নিয়া আসা যাওয়া করিতেন, কিন্তু এরূপ করেন নাই। এই ঘটনার পরেও আসিতেন, তখন আর শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু খাওয়াইতে চাহেন নাই।

৺কালী চরণ ভৌমিক :—

তিনি লেখকের পিতা। মা'র পিতৃকুলে তাঁহার জন্ম। সম্পর্কে মা'র জ্যেঠতুত ভাই। ইঁনি এক জন তালুকদার ও দেশমান্য লোক। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুবাবুদের নায়েব ছিলেন।

াহার প্রবল প্রতাপ ছিল। অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও খুন রাবত তাঁহার নায়েবিতে হইয়াছে।

এক দিন আসিয়া তিনি দাদাকে কোন সামাজিক কন্ধার কথা বলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'সামাজিকতা নিয়া এই বুড়ার কাছে আসেন কেন? এইরূপ কখনও করিবেন না।" দুই এক কথায় রাগারাগী হয়, তিনি চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের এই কথায় তাঁহার রাগ থাকে এবং ঠাকুরের নিন্দা তাঁহার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র জগবন্ধু ভৌমিকের নিকট করেন। তাহা শুনিয়া তিনিও নাকি কুড়াল নিয়া তাঁহার খুড়াকে কাটিতে যান, কিন্তু তিনিও নিন্দা ছাড়েন না, তুমুল ব্যাপার! এই সব শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন তাঁহাদের বাড়ী যান ও তাঁহার পায়ের ধূলা নেন। অমনি তিনি হাসি মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসিতে বলেন ও কথা বার্ত্তা বলিতে থাকেন। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি সব রাগ, দ্বেষ নিয়া গেলেন। তদবধি আর কোন দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিন্দা বা খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রে ঝগড়া হয় নাই। তার পর হইতে প্রতি দিন খাওয়া দাওয়ার পর তিনি ঠাকুর বাড়ী যাইতেন। গেলেই শ্রীশ্রীঠাকুর অথবা নটবর বাবু ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। এমন হইয়াছিল যে খাইয়া বিশ্রাম পর্য্যন্ত করিতেন না। তাঁহার শেষ সময় যখন সকলে চেঁচাইয়া তাঁহাকে রাম, নাম, কালীনাম ইত্যাদি শুনাইতে ছিলেন, তখন নটবর বাবু তাঁহার বড় ছেলে শরচ্চন্দ্র ভৌমিক ও জগবন্ধু ভৌমিককে বলিলেন, "কাণে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম বল।" কিন্তু

কেহই বলিল না। সকলে নটবর বাবুকে বলিতে বলিল; তিনি কা'ত ভাবে শোয়া ছিলেন, নটবর বাবু যেই মাত্র কাণে শ্রীশ্রী ঠাকুরের নাম বলিলেন, অমনি ঘাড় ফিরাইয়া চিৎ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া উঠিল। এবং সেই জ্যোতিঃ নটবর বাবুর মধ্যে মিলাইয়া গেল। প্রাণ চলিয়া গেল, মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। বদ্ধ মুষ্টি অঙ্গুলী করে ধরা ছিল। মহা সমারোহে কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দাহ করা হয়। তাঁহার অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা অনেক দিন প্রসাদ পাঠাইয়াছেন; নিজেও যাইয়া খাওয়াইয়া আসিয়াছেন।

এক বার কিছু ক্ষীর ও ফজ্‌লি আম তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা খান নাই। দাদা বলিলেন, "কালী পাঠাইয়াছে, তাহা কেন খাইব না?" তিনি সন্তোষের সহিত খাইলেন। পরে যখন তিনি ভাগবত শুনিতে আসিতেন, তখন এক দিন এই শ্লোকটী বলেন।

"অতিথি বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "ভার্য্যা, এটা বলিতে পারেন না।" কালী চরণ ভৌমিক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি সংসারে নিস্পৃহ হইয়া থাকি।" ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাগিয়া উঠিলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

শ্রীশ্রীমা'র বয়স যখন খুব কম ঠা'নদিদি ও মা কেবল বাড়ী থাকিতেন। কাচার লাগ পূর্ব্ব পারে জগৎ দের বাড়ী। সে

মাঝে মাঝে ঘরের বেড়ায় বাড়ি দিত, এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিত। এক দিন সারা রাত্রি বেড়ায় ঘা দেয়। তাহাতে মা ও ঠা'নদিদি সারা রাত্রি জাগিয়া থাকেন। ভাসুর পুত্র কালী চরণ ভৌমিক মহাশয়ের নিকট যাইয়া খুড়িমা এই কথা জানাইলেন। শুনিবা মাত্রই তিনি বলিলেন, "আপনারা যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমান।" সেই অবধি তিনি নিজেও দুই এক বার আসিতেন এবং সর্দ্দার পাহাড়াও রাখিলেন। যে কয় দিন সর্দ্দার ছিল, আর কোন উপদ্রব ছিল না। যে ভাবেই হউক জানিতে পারিয়া সে আর আসিত না। পাহাড়া না থাকিলেই উপদ্রব করিত। যখন দেখিল পাহাড়া দিয়া ধরা যায় না, তখন তাহাকে দিনেই মারিতে হুকুম দেওয়া হয়। সে ডেভিড্ কোম্পানীর অফিসে কাজ করিত। বাড়ীতে আসার সময় তাহাকে এক ছাড়া ভিটায় নিয়া, প্রহার করিয়া শয্যা শায়ী করিয়া রাখা হয়। তিনি পুনরায় তাঁহার খুড়াত ভাই ডাক্তার শশিমোহন ভৌমিককে পাঁচ টাকা দেন উহাকে ভাল করিতে। তাহা সারিতে তাহার ছয় মাস লাগিয়াছিল। এই মারেই তাহার জুয়ানকি শেষ।

৺রামলক্ষ্মী দেব্যা ঃ—

ইঁনি মাধব চৌধুরীর মেয়ে, বাল বিধবা। ঠাকুর-বাড়ীর লাগ উত্তরে তাঁহার বাড়ী। তিনি কাণে একেবারেই শুনিতেন না অপরে চীৎকার করিলে দুই এক কথা আভাসে বুঝিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বাজারের পয়সা দিতেন। তিনি বেশী পয়সা দিয়া সদায়পত্র আনিয়া দিতেন। দুই পয়সা দিলে চাকি

পয়সার আনিতেন। তিনি বলিতেন, "দুর্গা কেমন ভাল সদায় আনে! বড় সুন্দর বাজার করে। ওত পয়সা খায় না, কাজেই ভাল বাজার হয়।" অন্যে জিনিষ আনিলে আর তাহা হইত না। তিনি সকলের নিকট বলিতেন, "ওরা পয়সা খায়, দুর্গা এতটা আনিয়াছিল ওরা মাত্র এই কয়টা আনিয়াছে।" মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেন, "আপনি বেশী পয়সা দিয়া আনিয়া অন্যকে চোর বানান কেন? বলিলেই হয়, বেশী পয়সা দিয়া আনিয়াছি।" বেশী পয়সা বলিলে যে আবার পয়সা আনিয়া দিবেন, কাজেই তিনি বেশী পয়সার কথা বলেন নাই। রামলক্ষ্মী কাহারও এক পয়সা খান নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর কখনই চেচাইয়া কথা বলিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি যে মৃদু স্বরে কথা বলিতেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ঠা'নপিসী বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীশ্রীমা'কে তিনি খুবই ভালবাসিতেন এবং বউ বলিতেন। মা'র খাটুনি দেখিয়া বলিতেন, "বউ আমার খাটিয়া খাটিয়া সারা হইল।" অনেক সময় পাক করিয়া তরকারী পর্য্যন্ত দিয়াছেন। মা'কে দিতে হইবে, নাম করিয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বউকে দিয়াছ কিনা?" ইহাতে ননদিনী কত কথা বলিয়াছেন, "দিতেই বা বলে কে, আবার তাহার এত নিকাশই বা কেন?" ইত্যাদি।

রামলক্ষ্মী দেব্যা শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভক্তি করিতেন। লোক জন তাঁহার বাড়ীর রাস্তা দিয়া যাইত। তিনি আপন মনে বলিতেন, "ইহারা সাধু দেখিতে চলিয়াছে!"

শ্রীশ্রীমা'র নিকট তিনি পৈত্রিক চারিশত টাকা গোপনে রাখিয়াছিলেন কাহাকেও না জানাইয়া। তিনি মা'কে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। মা তাহা বড় ঘরের মাটীর নীচে রাখিতেন। তিনি যখন যত টাকা চাহিতেন, মা তাহা দিতেন। এই ভাবে ক্রমে তিনি দুই শত টাকা নেন। মা'র যখন বৃন্দাবনে ব্যারাম হইয়াছিল, তখন সংবাদ পাইয়া তিনি একেবারে পাগল প্রায় হইলেন। মা আসিয়া তাঁহার অবশিষ্ট দুই শত টাকা দেন। তিনি তাহা কামিনী গাঙ্গুলীর নিকট রাখেন। ক্রমে দেড় শত টাকা আনেন। পঞ্চাশ টাকা বাকি থাকিতে গাঙ্গুলী মারা যান। সে টাকা আর তাঁহারা দেন নাই। মা'কে পাঁচিশ টাকা সাধিয়া ছিলেন কিন্তু মা, তাহা নেন নাই। শ্রীশ্রীমা'কে তিনি একখানা লাল পেড়ে গরদের রংদার কাপড় দিয়াছিলেন।

৺ বামাসুন্দরী দেবী :—

তিনি তারিণী চরণ মিত্রের স্ত্রী ও দেওভোগের শ্রীযুক্ত কালীনাথ গুহ মহাশয়ের ভগিনী; বয়সে মা'র অনেক বড় ছিলেন। তিনি এক বার শ্রীশ্রীমা'কে একা খাইতে নিমন্ত্রণ করেন। পূর্ব্ব দিন আসিয়া বলিয়া যান মা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন তবুও তিনি পাকশাক করিয়া পর দিন নিজেই নিতে আসেন। ইতিমধ্যে মা অস্পৃশ্যা হইয়াছেন। যাইবেনই না, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। অনেক অনুরোধেও মা কিছুতেই তদবস্থায় যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন। তিনি যাওয়ার পর হইতেই মা'র ছটফটি

আরম্ভ হইল। মা কিছুতেই আর ঘরে থাকিতে পারেন না; একেবারে অস্থির, যাবার জন্য ব্যাকুল। বেলা ৪'টা ৫'টার সময় মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "আমার এইরূপ অস্থির করিতেছে; আমি কি করি?" তিনি যাইতে বলিলেন। মা নিজেই রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে কতক পথ সঙ্গে নিয়া তথায় গেলেন। বামাসুন্দরী যেন হাতে আকাশ পাইলেন, আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা মা'র খাওয়ার জন্য পিঠা, পরমান্ন নানারূপ করিয়াছিলেন। তাহার স্বামী অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, তবুও তিনি এক দিনের তরেও স্বামীর নিন্দা করেন নাই।

৺মাধবী ঠাকুরাণী ঃ—

ইঁহার বাড়ী মালঞ্চা, ঢাকার পর পাড়ে। ঠাকুরের মা'র জ্যেঠাইমা। তাঁহার মাথা ভরা জটা ছিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেন। এক বার শ্রীশ্রীমা, মা'র ভগিনী হরকামিনী দেবী ও বৈকুণ্ঠ মজুমদার তথায় যান। বৈকুণ্ঠ পাক ও পরিবেশন করে। হরকামিনী দেবীকে তিনি কাপড় দেন। তিনি যোগ বলে উপরে উঠিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন "কুম্ভক করিয়া উঠেন।" এক দিন সন্ধ্যার সময় তুলসী প্রণাম করিতে তাঁহাকে জাতি সাপে দংশন করে। তিনি অমনি যাইয়া যে ঘড়ে মাধবের ঘট সেই ঘড়ে কপাট দিলেন। ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত কপাট না খোলায়, কপাট ভাঙ্গা হইল। দেখা গেল তিনি আসনে বসা। একবার ঐ ঘড় আগুন লাগিয়া

পুরিয়া যায়। তিনি ঘরে ছিলেন। তাঁহার কিম্বা ঘটের কিছুই হয় নাই। তিনি সব পূজাই করিতেন। তাঁহার খাওয়া মাত্রই ছিল না। কোন দিন এক আধটী সফরি কলা সামান্য দুগ্ধ খাইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাসে সাত দিন ভাত খাইতেন। বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে পাক করিয়া খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। লোককে ঔষধপত্র দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "যশ মানে পড়িয়া গেল। নতুবা কাবু করিতে পারিত।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি সাগর সেঁচা মাণিক বলিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম বিবাহে মাধবী ঠাকুরাণী ঠাকুর বাড়ী আসিয়াছিলেন। কলিকাতা যাইয়া ঠাকুরের বাসায় চারি মাস ছিলেন। সেই সময় কোন কোন দিন মাত্র এক পোয়া দুগ্ধ ও একটী সফরি কলা—তা'ও সব নয়—খাইতেন। মাধবী ঠাকুরাণী দীনদয়াল নাগ মহাশয়কে বলিতেন, "তুমি অন্য তপ, জপ, সন্ধ্যা, পূজা আর কি কর, ছেলের নাম জপ ঐ রূপই ধ্যান কর। এই যে সাক্ষাৎ ভগবান্।"

৺অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঃ—

অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায় নটবর বাবুর মেঝো ভাই। তাঁহার বড় স্ত্রীর ছেলের বয়স চারি পাঁচ বৎসর ছেলেটি সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া থাকিত। শুধু খাবার সময় দুটী খাইতে যাইত। বর্ণ খুব সুন্দর ছিল। তাহাকে কেহ দেখিতে পারিত না। তাহার গর্ভধারিণীর বুদ্ধি কম ছিল। পিতা দুই বোনকে এক দিনেই বিবাহ করেন। মা জিজ্ঞাসা করিতেন,

"তোমাকে কে কেমন ভালবাসে?" সে বলিত, "সকলেই আমাকে ভালবাসে।" সে খেলার সাথীদের কাছে বেশী থাকিত না। অধিকাংশ সময়েই ঠাকুর-বাড়ীতে থাকিত। এমন কি সে রাত্রিতেও এখানে শুইয়া থাকিত। মা খাইতে দিতেন। এখানে সে গান গাহিত ও নাচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন এ ছেলেটির লক্ষণ বড় ভাল, বাঁচিলে খুব ভাল হইবে। ছেলেটীর কলেরা হয়, এবং সেই দিনই মারা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন। বলিলেন, "যেমন বীর ছিল তেমনি বীরের ন্যায় মরিল।" তিনি ছেলেটীকে খুব আদর করিতেন।

লেংটা ফকির :—

সে প্রথম দিন দুই তিন জন ব্রাহ্মণ শিষ্য সঙ্গে মণ্ডপে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট কি সব বলিতে থাকে। শিষ্যেরা তাহার সব গুণ কহিতে লাগিল। নানা কথার মধ্যে লেংটা বলিয়া উঠিল, "আমি এক গলা গুয়ের মধ্যে থাকিতে পারি।" শ্রীশ্রীঠাকুর রাগিয়া বলিতে লাগিলেন, "শিয়াল কুকুরও গুতে থাকে। তুমি থাক দেখি এক গলা গুতে? দেখি কেমন তোমার শক্তি?" বলা মাত্র হাত ঘুরাইয়া লাল লাল বলিয়া ফকির চলিয়া গেল। পরে আর এক দিন আসিয়া সে বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যায়।

মোস্তাজ ফকির :—

সে প্রথম দিন মণ্ডপে ব্রাহ্মণদের পাটীতে বসে। তাহার সঙ্গে দুই জন লোক ছিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয়

পাইয়া ব্রাহ্মণদের হুকার জল ফেলিয়া দেন। তাহাকে বাহিরে বসিতে চিকনাই দেন। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল। তারপর এক দিন কতগুলি কমলা লইয়া আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "যে আসে তাহাকে দিয়া ফেলেন।" এই ফকির একটী চাউল দিয়া এক ডেগ মিষ্টান্ন পাক করিত। তাহার অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোক শিষ্য ছিল।

প্রসন্ন দারোগা ঃ—

ইনি এক দিন দুইটী ময়মনসিংহের বেগুন নিয়া আসেন। ঠাকুর কিছুতেই রাখিবেন না, তিনিও ফেরৎ নিবেন না। তিনি শত মানা সত্বেও তাহা রাখিয়া যান। শ্রীশ্রীঠাকুর একটী রামলক্ষ্মী দেব্যাকে অপরটী নটবর বাবুকে দেন।

৺অন্নদা খাসনবীশ ঃ—

তিনি বিক্রমপুর বেতকা গ্রাম নিবাসী। তিনি মাঝে মাঝে সুবিধা মত ঠাকুর-বাড়ী আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শত মুখে তাঁহার ভক্তি এবং সরল বিশ্বাসের প্রশংসা করিতেন। তিনি খুব কর্ম্মবীর ছিলেন। যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি ঢাকাতে হরপ্রসন্ন বাবুর বাসায় কিছু দিন ছিলেন।

অন্নদা বাবু একবার ডা'ল উননে বসাইয়া চলিয়া যান। নটবর বাবু তাঁহাকে পাক করিয়া খাইতে বলেন, তিনি বলেন, পাক করিবেন না ও খাবেন না। তিনি চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার তালাস করিতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের আখরা পর্য্যন্ত যান।

কিন্তু না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। অন্নদা বাবু সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আম ও মুড়ি খাইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাও খাইতে চাহেন না। তাহাতে নটবর বাবু বলেন, "না খাইলে আসেন কেন ? না খাইয়া থাকিতে পারিবেন না। এরূপ ত্যক্ত করিলে যাহা করিতে হয়, করিব।" এ সব বলার পর আম ও মুড়ি খান।

হরপ্রসন্ন বাবুর কটকের চাকুরী এই অন্নদা বাবু লওয়াইয়া দেন। ঠাকুরের লীলা সম্বরণের আট নয় বৎসর পর অন্নদা বাবু আমাশয় রোগে মারা যান। মৃত্যু সময়ে তিনি ঠাকুরের ভক্তগণ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, হরপ্রসন্ন বাবু তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা শরীর যাইতে আর বিলম্ব নাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন দেহ বদলাইয়া শীঘ্রই আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আসিতে পারি।" এই বলিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বায়ু চলিয়া গেল।

৺শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ঃ—

তিনি সোনাকান্দা কাঠের তহবিলে কাজ করিতেন। এক দিন দুটী আম নিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে অনেক পীড়াপীড়ি করেন। রাখিবেনই না, তাঁহারা অবশেষে এখানে রাখিয়া চলিয়া যান। তিনি উহার একটী রামলক্ষ্মী দেব্যাকে আর একটী নটবর বাবুকে দেন। পরে তিলা সংক্রান্তির পর এক দিন ঘোষাল মহাশয় এক রাঙ্ তিলা নিয়া আসেন, এবং রাখার জন্য

অনেক পীড়াপীড়ি করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুতেই রাখিবেন না, তাঁহারাও ছাড়িবেন না। তখন তিনি মাথা কপাল কুটিতে লাগিলেন, তবুও তাঁহারা পীড়াপীড়ি করায় তিনি নিরুপায় দেখিয়া কাপড় ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দক্ষিণ দিকে জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। মা পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তাঁহারাও গেলেন। মা কথা বলেন না, তবুও এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন যেন তাঁহারা শুনিতে পান ;—"আপনারা এরূপ করিলে তিনি বাড়ী আসিবেন না" ইত্যাদি। এমন সময় ঠাকুর বাড়ীর গোয়ালা আনন্দ গোপ আসিল। মা তাহাকে দিয়া ঘোষাল মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলেন। ঘোষাল মহাশয় এসব দৃশ্যে অপ্রস্তুত হইলেন। অগত্যা তিলা নিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ী আসিলেন, আনন্দ গোপ কাপড় পরাইয়া দিল। যখন যে কেহ কিছু আনিত, তখনই ফিরাইয়া নিতে তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিতেন। তাহা না শুনিয়াও যদি কেহ কিছু রাখিয়া যাইত, তিনি তাহা জঙ্গলে ফেলিয়া দিতেন।

৺অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী :—

তিনি ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত; বড় রাগী ছিলেন। গালাগালি করিতেন, বিশেষতঃ ঠা'নদিদিকে। মা'কে কখনও একটী কথাও বলেন নাই।

এক বার অভয় চক্রবর্ত্তীর ছোট ভাই কৈলাশ চক্রবর্ত্তী ৺দুর্গা পূজা করিতে আসেন, তিনি লেখা পড়া কম জানিতেন, এবং তাঁহার উচ্চারণ ভাল হইত না। দাদার মন পরিস্কার নহে, তিনি

অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "পূজা নিজের কাছে। পুরোহিত কেবল লোক দেখান, সামাজিক। যার ইচ্ছা হয়, সে পূজা করুক, তাহা দেখিবেন কেন?" দাদা ক্ষান্ত হইলেন। এই কৈলাশ চক্রবর্ত্তী বলেন,—চাল ভাঙ্গা, আকাশ দেখা যায়, বৃষ্টি ভয়ানক পড়িতেছে, ঘরের এদিক ওদিক জল পড়িয়াছে কিন্তু প্রতিমা কিম্বা নৈবদ্যে জল পড়ে নাই। একথা এখনও তিনি অতি আশ্চর্য্যের সহিত বলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস ঃ—

তাঁহার বাড়ী দেওভোগ। যখন সকলে আসিয়া গান করিতেন, তখন তিনিও আসিতেন। যে গীত এক বার শুনিতেন তাহাই তাঁহার মনে থাকিত। তিনি সর্ব্বদা ঠাকুর বাড়ী যাতায়াত করিতেন। দাদার দেহত্যাগের সময় সে কিছু দিন আসা যাওয়া বন্ধ করেন। তিনি বলেন যে দিন প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেন সে দিনই ভগবান বলিয়া জানিয়াছেন। লীলা সংবরণের পর যখন পাটের অফিসে কাজ না থাকিত তখন প্রতি দিন আসিতেন ও গান গাইতেন। অফিসে কাজ থাকিলে আসিতেন না। সকল লোক চলিয়া গেলেও নটবর বাবুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য বহু রাত্র পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। নটবর বাবু তাহাকে দিয়া এক বার যজ্ঞ করান। যজ্ঞ সমাপনে নটবর বাবু তাহাকে গরম যজ্ঞ ভূমির উপর বসিতে বলেন। তিনি বসিলেন না; নটবর বাবু বলিয়াছিলেন বসিলে কাবু করিত। তিনি কয়েক বৎসর যাবত আবার ঠাকুর বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দত্ত ও মাধব চন্দ্র দে :—

ইহারা নারায়ণগঞ্জ স্কুলে পড়িতেন। মাধব বাবু চন্দ্রকিশোর বাবুর বাড়ী মাসদাইর থাকিতেন। ঠাকুর-বাড়ী যখন প্রথম আসেন তখন মণ্ডপে জগবন্ধু ভৌমিক মহাশয়, ঠাকুর পূর্ব্বের ঘরের উত্তর দিকের দরজার নিকটে ছিলেন। তাহাদিগকে মণ্ডপে বসিতে দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐখান হইতে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। জগবন্ধু ভৌমিক তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে বই পড়িতে দিলেন। তার পরও যখনই গিয়াছেন, তখনই কোন বই কিম্বা উদ্বোধন পড়িতে দিতেন।

চন্দ্রকিশোর বাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, "মুসরী ডাইল খাইতে দোষ কি?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "কোন দোষ নাই।" মাছ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, নিজে না ধরিলেই হইল। "সম্মুখে যাহা আসে তাহাই খাওয়া যায়, তাহাতে দোষ নাই। সমাজে যাহা চল আছে, তাহা খাইতে দোষ নাই।" অন্য এক দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "জ্ঞান, ভক্তি এসব হয় না। কিন্তু কর্ম্মটাই সহজে ধরিতে পারা যায়, এবং করা যায়।" প্রথম দিন আসার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এই দুটী ছেলে বেশ ভাল।"

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় :—

ইনি নটবর বাবুর প্রথম ছেলে। তিনি বাল্যাবধি তাঁহার

পিতার সঙ্গে ঠাকুর বাড়ী আসেন। তাঁহাকে ঠাকুর ও মা কোলে কাখে নিতেন ও ভালবাসিতেন।

তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটী গান লিখিয়াছেন, তাহার দুটী গান দেওয়া গেল ঃ—

(১)

জয় দে তোদের ঘরে এল নারায়ণ।

বন্দি শ্রীদুর্গাচরণ, আর যত ভক্তগণ,

প্রভু লীলা সাধ করি গান।

মৃদঙ্গ মধুর তালে, প্রভু লীলা সাধ করি গান॥

ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদে, বুধাদিত্য সহযোগে,

নারায়ণ লইলা জনম।

দীন দয়ালের ঘরে, নারায়ণ, লইলা জনম॥

পাড়া প্রতিবাসী যত, হইল সব সমাগত

শুনে তারি রূপেরি বাখান।

অনুপম, অপরূপ, শুনে তারি রূপেরি বাখান॥

অন্নারম্ভ, স্ত্রীআচার, হাতে খরি, ফলাহার,

যথাকালে হইল সমাধান।

পিতা দয়ালের ব্যয়ে, যথাকালে হইল সমাধান॥

পঞ্চক্রোশ হেটে যায়, তবে পাঠশালা পায়,

স্তম্ভিত হইল গুরুজন।

পাঠে অনুরাগ হেরে,
শিশুর বিক্রম হেরে } স্তম্ভিত হইল গুরুজন॥

কৈশোর হইল গত, যৌবন সমাগত

প্রভু রহে ধ্যানে নিমগন।

নিমতলা শ্মশানে
বিজন বিপিন মাঝে, } প্রভু রহে ধ্যানে নিমগন ॥

দয়াল বিপদ গণি, গেল বুঝি যাদুমণি,

বিষয়েতে নাহি ডুবে মন।

বংশের দুলাল সেজে, বিষয়েতে নাহি ডুবে মন ॥

শুভ দিনে শুভক্ষণে, মিলে যত পরিজনে,

পরিণয় কৈল সমাপন।

প্রভুর মঙ্গল ভেবে, পরিণয় কৈল সমাপন ॥

কিন্তু একি হইল হায়, প্রভু হইল নিরুপায়

পূজে তাঁরে মাতৃ সমতুল।

মা, মা, বলে ডাকে তাঁরে, পূজে তাঁরে মাতৃ সমতুল

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, শুধাইলা ধর্ম্ম মর্ম্ম,

করে সবে প্রেম আলিঙ্গন।

পশু, পক্ষী, নাহি গণে,
পাপী তাপি নাহি গণে, } করে সবে প্রেম-আলিঙ্গন ॥

প্রভুর অনন্ত লীলা, দেবের অসাধ্য বলা,

করে গৃহে গঙ্গা আনয়ন।

তাঁহার বাসনা জেনে করে গৃহে গঙ্গা আনয়ন ॥

অসার সংসার মরু প্রভু হইল কল্পতরু।

পুরাইল ভক্ত মনস্কাম।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু পুরাইল ভক্ত মনস্কাম ॥

দেখিতে মনেরি সাধ, বিধি তাতে সাধে বাদ,
নাহি তুমি দিলে দরশন।
দীনের কুটিরে হরি, নাহি তুমি দিলে দরশন ॥
দীন জনে দাও দেখা, আমি পড়ে আছি একা,
তুমি বিনে বিফল জনম।
আমার মরণ ভাল, তুমি বিনে বিফল জনম ॥
দেবভোগ তীর্থমণি, গয়া কাশী খাট মানি,
তুমি যথা হইলা অধিষ্ঠান।
লীলার আবাস ভূমি, (হরি) তুমি যথা হইলা অধিষ্ঠান ॥

(২)

নমো নর নারায়ণ, শ্রীদুর্গাচরণ,
নমি গুরু চরণে তোমারি।
জগত স্পন্দিত করি, বাজিল বাঁশরী,
ভকত বসিল পদবেরি ॥
কভুবা দীনের বেশে, বলে ভাব আবেশে,
আপনারে আপনি শ্রীহরি।
কেন তুমি রলে গুপ্ত, বিশ্ব মাঝে আছ ব্যক্ত,
লীলা তব বুঝিতে না পারি ॥
বিষয় বিভবে মাতি, মজে আছি দিবারাতি,
তোমারে না তিলেক স্মরি।
তুমি ভকতরঞ্জন নিত্যরঞ্জন,
কর মোরে প্রেম অধিকারী ॥

গোপী প্রাণবল্লভ, দেহি পদপল্লব,
ঢাল হৃদে তব প্রেমবারি।
কুরু কৃপা প্রজারাজ, মাগি তব পদরজ,
চরণেতে লুটিয়ে পড়ি ॥
তুমি হে দীনের রাজা বিশ্বভরা তোমার প্রজা
তুমি বিনে সব শূন্য হেরি।
শকতি বিহীন জানি, দিলে তোমার অভয় বাণী,
শমন শাসনে না ডরি ॥
তুমি ভালবাস যেমন ছুঁইয়ে আমায় কর তেমন,
ভাব ভরে দেও প্রাণ ভরি।
জাগ্রত কর মোরে, দীক্ষিত কর মোরে,
তব নাম মন্ত্রে মুরারী ॥

শ্রীপঞ্চানন্দ সাহা ঃ—

তাহার বাড়ী মাসদাইর। সে কি ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে মন্ত্র নিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট আসে। তাঁহাকে মনোভাব বলিয়া না খাইয়া সে দক্ষিণের জঙ্গলে থাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে আসিয়া দেখা দিত, আর বলিত, "আমাকে মন্ত্র দেও।" তিনি বলিতেন, "আমি কি জানি? আমি কি জানি? আমি

হাঁদা লোক, আমি শূদ্র, ক্ষুদ্র," ইত্যাদি। সে তিন দিন উপবাস থাকিয়া ঠাকুরকে এরূপ বিরক্ত করে। পরে চলিয়া যায়। সে চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যান্যের নিকট বলেন, "আর একটু থাকিলেই কাবু করিত।"

স্বামী বিবেকানন্দ :—

ইঁনি আমেরিকা হইতে আসিয়া শরৎ বাবুকে দিয়া পত্র দেন যে, তিনি ঠাকুর বাড়ী আসিবেন। তারিখও লিখা ছিল। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুসী হন। শ্রীশ্রীমা নারিকেল ও ক্ষীরের নানারূপ খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিলেন। ঠাকুর শৌচের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিলেন। ইতি মধ্যে শরীর অসুস্থ হওয়ায় আর স্বামীজীর আসা হয় নাই। কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা যান। তখন এক দিন বেলুর মঠে গিয়াছিলেন। তখন স্বামীজি ভক্ত সন্ন্যাসীদিগকে বলিয়াছিলেন, "ত্যাগে ও ইন্দ্রিয় সংযমে ইঁনি আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।" শ্রীশ্রীঠাকুরকে নৌকায় উঠাইয়া দেওয়ার সময় স্বামীজি হাতে ধরিয়া উঠান, এবং বলেন, "মধ্যে মধ্যে আমাদের দর্শন দিয়া যাবেন ও আমাদের কৃপা করবেন।"*

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁহার শিবাংশে জন্ম। ভুলেও তাঁহার কাম ভাব উঠে না। তাঁহার মনে এসব কিছুই নাই; কিন্তু পরক্ষণেই বলিতেন যে, যদি কোন সুন্দরী যুবতী রমণী নির্জ্জনে কায়দা করিত, তবে তাঁহার

* শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "সাধু নাগ মহাশয়" ৫ম সংস্করণ পৃঃ ৯৭।

কাম ভাব উঠিয়া যাইত।" স্বয়ং পরমহংসদেবও এক দিন কামভাবে ডগ মগ হইয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন, "আজ বুড়ি থুরি হইলেও আমার হাতে অব্যাহতি ছিল না।"*

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামিজী সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন, "পৃথিবী জয় করিতেছে সত্য, কিন্তু যখন তাঁহার নিজের দিকে নজর পড়িবে,‡ তখন কোথায় যাইয়া লুকাইবেন, ঠিক পাইবেন না। তিনি এত লোককে মন্ত্র দেন, এত হৈ চৈ করেন। কত লোক তাঁহার পাছে পাছে ঘোরে। যাইতে দুইটা একটা।"

ইংরেজী ১৮৯৭ সনে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দেশে ও নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পত্রিকায় স্বামীজীকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম আলোচনায় তাঁহার অধিকার নাই, এবং ইউরোপ যাওয়াতে তিনি জাতি

* রামচন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত ১২৯৭ সাল সংস্করণ পৃঃ ১৫৮। স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (সাধক ভাব) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৩৫২, ৩৫৩। ঐ (গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৮। শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ ৫ম সংস্করণ পৃঃ ১৪৭। শশিভূষণ ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৩৩২ সন সংস্করণ পৃঃ ১৬৯।

‡ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিবেকানন্দ চরিত পৃঃ ৪০৫।

ভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইত্যাদি নানা কথা বলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকায় এরূপ প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রাগিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্তই ভুল ও ঈর্ষ্যা মূলক। যখন ব্রহ্মার শরীরের বিভিন্ন শাখা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিতে কোন জাতিই সক্ষম ও সম্মত হইলেন না, তখন ব্রহ্মা তাহার সমস্ত কায়া হইতে একটী পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই পুরুষই চিত্রগুপ্ত নামে অভিহিত। কাজেই কায়স্থ অতি উচ্চ জাতি এবং বেদাদির অধিকারী।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "দেশের লোক কিরূপ হাঁদা, বিবেকানন্দের ন্যায় লোকেরও নিন্দা করে! যে কুলে স্বামীজীর জন্ম, সেই কুল ধন্য, যে দেশে তাঁহার জন্ম, সে দেশ ধন্য।" এ ব্যাপারের পর হইতে, ঠাকুর বাড়ী যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গবাসীর গ্রাহকগণ উক্ত পত্রিকার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করেন।

বারদীর ব্রহ্মচারী :—

তারাকান্ত গাঙ্গুলী বারদীর ব্রহ্মচারীর বহু প্রশংসা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন একাকী তাঁহাকে দেখিতে বারদী যান। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট টাকা পয়সা আছে?" তিনি বলিলেন, "টাকা নাই পয়সা আছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "পয়সা দেও।" তিনি পয়সা দিলেন। ব্রহ্মচারী তাহাদ্বারা বাতাসা আনাইয়া কয়েকটী কুকুরকে খাইতে

দিলেন। ওখানে একটী স্ত্রীলোক বসা ছিল, তাহাকে দেখিয়া ঠাকুরের মনে হইয়াছিল—ব্রহ্মচারীকে পিশাচে খাইতেছে। * এসব ব্যাপার দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন একটা কিছু করেন, তখনই বিচার আসিল—আমি উহার নিকট আসিয়াছি, উহার জায়গা। সে আমার নিকট যায় নাই। রাত্রিতে ওখানে থাকিয়া ভোরে চলিয়া আসিলেন। ঠাকুরের গলায় খুব বেদনা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন "ও শালা† কিছু করিল কি ?"

* গনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী সংগ্রহ একাদশ সংস্করণ পৃঃ ৩৪৪, ৩৪৫। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ৭৯, ৮০, ১০৩, ১০৫। কেদারেশ্বর সেনের শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য ১৩২৩ সাল সংস্করণ পৃঃ ১৩, ২১৩, ২১৭।

শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংস্করণ পৃঃ ১৭৪। দ্বিতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ১৬-১৭, ২৩০। ঐ ৩য় ভাগ ৫ম সংস্করণ পৃঃ ১৪০। ঐ ৪র্থ ভাগ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ১৫, ৮০, ৮১ ৯৯, ১১১-১১২, ২১০-২১১, ২৩৪। শশিভূষণ ঘোষের শ্রীরামকৃ দেব ১৩৩১ সাল সংস্করণ পৃঃ ১৮৮, ২২৩, ২৫৯। স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ (সাধক ভাব) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২০৮। রামচন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত ১২৯৭ সন সংস্করণ পৃঃ ১৬৯। সুরেশ চন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ ৭ম সংস্করণ পৃঃ ৩৯, ১২২, ১৩২, উপদেশ নং ১৫৪, ২০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫৫৯।

† ঐ লোকনাথ মাহাত্ম্য পরিশিষ্ট পৃঃ ৯০, ৯১। শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৩০০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভার পূর্ব্বার্দ্ধ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৫১। সুরেশ চন্দ্র দত্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ ৭ম সংস্করণ পৃঃ ২১৭, ২২৫, উপদেশ ৮৪০, ৮৭১।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান হইতে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মানুষ, সব কানা খাটাশ, কি সব দেখিয়া ভোলে! কেন ওখানে যায়?"

৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী :—

তিনি ঢাকা আসিয়াছেন। তাঁহার খুব নাম পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এক দিন তাঁহাকে দেখিতে ঢাকা গেলেন। যাওয়া মাত্রই গোস্বামীজী আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন; এবং বহু সময় ঐভাবে রহিলেন যেন তিনি ভাবে মগ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন, তিনি তথায় থাকেন নাই। গোস্বামীজী ঠাকুরের পূর্ব্ব পরিচিত। তিনিও মেডিকেল কলেজে পড়িতেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে প্রফেসার সাহেবের মারপিটের এক জন নেতা ছিলেন।

৺শশীমোহন কবিরাজ :—

ইনি নারায়ণগঞ্জে কবিরাজী করিতেন। গত দুই বৎসর যাবৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক দিন রোগী বাড়ী হইতে দেওভোগের মধ্য রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন, বর্ত্তমানে যেখানে নারায়ণগঞ্জ হইতে দেওভোগ যাইতে প্রথম পুল, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বাজারে চলিয়াছেন। কবিরাজ বাসায় ফিরিতেছেন। কে আগে যাইবেন ইহা নিয়া উভয়ে ঠেলাঠেলি, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা। কেহই আগে যাইতে স্বীকৃত নন। পরে কবিরাজ মহাশয় বসিয়া পড়িলেন। দৃষ্টি একটু অন্যদিকে যাইতেই ফিরিয়া আর শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন না। চারি দিকেই মাঠ। লুকাইবার

জায়গা নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে চিন্তাকুল মনে বাসার দিকে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। যখন কবিরাজ মহাশয় ৺লক্ষ্মীনারায়ণের আখরার দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোণের জিয়স গাছের নিকট পৌছিয়াছেন, তখন দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বাজার হইতে আসিতেছেন। তিনি কবিরাজকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনও আপনি বাসায় যান নাই?" কবিরাজ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেবল অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন কিছুই বলিতে পারিলেন না। শশী কবিরাজ যখন এসব বলিতেন তাহার বয়স আশীর উপর ছিল, তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত, দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে থাকিত এবং কথা রুদ্ধ হইয়া আসিত।

শ্রীলাল মোহন শীল :—

লালু বলে সে ঠাকুর বাড়ী দাদাকে কামাইতে যাইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল হয়ত বেশ বড় হইয়াছে। তিনি মাথায় হাতদিয়া চুল ধরিয়া বলিতেন, "চুলগুলি বাড়িয়াছে।" লালু বলিত "বসুন, কাটিয়া দেই।" তিনি বলিতেন, "না, থাক। এখন থাক, দেন যেন; পরে দেন যেন।" আবার হয়ত অন্য দিন লালু গিয়াছে, সেই দিনও ঐরূপ বলিতেন। "আজ থাক, আজ থাক।" এইরূপ করিয়া দুই তিন মাস কাটাইতেন। পরে হয়ত এক দিন বলিতেন, "কাটিবেনই? আচ্ছা।" এইরূপ বলিয়া পা ঢাকিয়া পরা-কাপড়ের আঁচল সম্মুখে

ধরিয়া বসিতেন, যেন কাটা চুল মাটিতে না পড়ে। হাতের নখ কিছু রাখিয়া কাটাইতেন। পায়ের নখ কাটিতেই দিতেন না। কাটা নখ কুড়াইয়া নিজেই চুলের সহিত ফেলিয়া দিতেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী কান্ত দে :—

ইনি মুন্সীগঞ্জে মোক্তারি করিতেন, প্রায়ই শনিবার হইলে ঠাকুর বাড়ী আসিতেন, রবিবার থাকিয়া সোমবার ভোরের ফেরি ধরিয়া যাইতেন—কাছারির মক্কেলের কাজকর্ম্ম জন্য। তিনি দেওভোগ নিবাসী নারায়ণগঞ্জের মোক্তার গোপাল কৃষ্ণ গুহকে বলিয়াছেন যে এক দিন প্রাতে মুন্সীগঞ্জে যাইবার জন্য ফেরির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা বেশী হইয়াছে ফেরি পাইব কি ?" তিনি বলিলেন "আচ্ছা যান, দেখুন গিয়া, ফেরি পাইলে পাইতেও পারেন।" তিনি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন যে, ফেরি এত বেলা নিশ্চয় ছাড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন ফেরি ছাড়িয়া যাইয়া নদীর মধ্যে কল বিগরাইয়া ঘটর ঘটর করিতেছে। তিনি একখানা নৌকা করিয়া যাইয়া ফেরিতে উঠিলেন। লক্ষীকান্ত বাবু অতি আশ্চর্য্যের সহিত বলিয়াছেন যে, ফেরিতে উঠা মাত্রই কল ঠিক হইল এবং ফেরি চলিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

লীলা সংবরণ।

দাদার মৃত্যুর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর হইতে থাকে এবং বুক জ্বালা ও পৈত্তিক-ব্যথা বৃদ্ধি পায়। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। লীলাসংবরণের এক বৎসর পূর্ব্বে জ্বর ও পৈত্তিক-ব্যথা ভয়ানক বাড়িয়াছিল; এক এক বার পাঁচসেরি পাতিল ভরিয়া পিত্ত বমি করিতেন। এক বার নটবর বাবুকে বলিয়া গোবিন্দ ডাক্তারকে মা আনান। তিনি ঐ বমি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এইরূপ এক বার পড়িলে, মানুষ তখনই মরিয়া যায়।" এত ঘাম হইত যে বিছানা ভিজিয়া যাইত। লোক আসিলে এইরূপ দারুণ ব্যথা ও জ্বর নিয়াও অমনি তিনি উঠিয়া বসিতেন, হাটিতেন এবং যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা করিতেন। এমন কি কীর্ত্তনের সময় হুকা ও কল্কি নিয়া ঐ ব্যথা নিয়াই বহু রাত্র পর্য্যন্ত ঘরের এক কোণে বসিয়া থাকিতেন ও তামাক সাজিতেন। যেই সব লোক চলিয়া যাইত, আর বিছানায় সারিয়া যাইতে পারিতেন না। এমন কি ধরিয়া নিয়া শোয়াইতে হইত। এই দারুণ ব্যথা নবাগত কিংবা যাহারা সর্ব্বদা আসিত তাহারাও বিন্দুমাত্র টের পাইত না। তিনি কাহারও নিকট বলেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলে কেহ বলিতে পারিত না যে, তখন এইরূপ ব্যথা বা কোন যন্ত্রণা ছিল।

লীলাসংবরণের পূর্ব্ব ভাদ্র মাস হইতে তিনি পৈত্তিক-ব্যথার জন্য কখনও বা দুইখানা লবণ ছাড়া চিতৈ পিঠা, কোন দিন বা আতপ চাউলের লবণ ছাড়া যাউ খাইয়া থাকিতেন। দাদার মৃত্যুর পর হইতে তিনি মরিচ খান নাই; শুধু গোল মরিচের ঝাল খাইতেন। তিনি যখন মাছ খাইতেন না, তখন ভাত কিংবা মুরির সঙ্গে তিন চারিটা বোম্বাই মরিচ খাইতেন, তাহাতেই পিত্তের জ্বালা বাড়িয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাদ্র মাস হইতেই বেশী কাতর; কার্ত্তিক মাসে আমাশয় আরম্ভ হইল। দীপান্বিতা কালীপূজার বাজার অতি কষ্টে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই আমার শেষ দীপান্বিতা, আর আমার দেহ থাকিবে না।" মা তখন কড়াই লইয়া ঘাটে যাইতেছিলেন, ইহা শুনিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন।

ভাদ্র মাস হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর মণ্ডপে শয়ন করিতেন; কারণ, ভাগিনেয় লেছ্রা প্লীহা জ্বর নিয়া ঠাকুর বাড়ী আসে, পরে তাহার মাও আসেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ঘরে যাহা বাসের উপযুক্ত ছিল, তাহাতে থাকিতেন। তিনি তিন দিকে ভগ্ন-বেড়া ও দক্ষিণে বেড়াশূন্য-মণ্ডপ ঘরে থাকিতেন। লেছ্রা আশ্বিন মাসে মারা যায়, তাহার মাতা কার্ত্তিক মাসে চলিয়া যায়।

হরপ্রসন্ন বাবু ফৌজদারীতে পেশকারী করিতেন। তিনি বদলি হইয়া নারায়ণগঞ্জ আসেন। পূজার বন্ধের পর হইতে ঠাকুর বাড়ী আসিয়া ঐ পূর্ব্বের ঘরে থাকিতে আরম্ভ করেন। নারায়ণগঞ্জ আর বাসা করিলেন না, এখান হইতেই কাছারীতে

যাইতেন। মা তাঁহার কাছারীর পাক করিয়া দিতেন। মাছ, তরকারী, দুধ তাঁর জন্য রোজই কৈলাস দাস মহাশয় বাজার করিয়া আনিতেন, না করিলে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়াই যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুখ নিয়াই খোলা ঘরে রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। এদিকে অর্থের অভাব। তিনি বিপিন দের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু বেতন পাইয়া ঢাকার বাসায় নিয়া যাইতেন। শেষ সময় পর্য্যন্ত এভাবেই কাটিল।

পালদের নিকট পাঁচ শত টাকা পাওনা ছিল, ব্যারামের পূর্ব্ব-পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আসার সময় তাঁহারা বলিলেন, "তুমি যাও, টাকা পাঠাইয়া দিব; রাস্তা হইতে কেহ নিয়া যাইতে পারে।" পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখা সত্ত্বেও টাকা আসিল না, কাজেই ধার কর্জ্জ করিয়া হরপ্রসন্ন বাবুকে খাওয়ান হইত। অভাব স্বভাব শ্রীশ্রীঠাকুর কোন দিন কাহাকেও জানান নাই। কেহ জানিতেও পারিত না।

মণ্ডপ ঘর বেড়া শূন্য, ভাঙ্গা বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে তথায় শুইতে দেন নাই, শ্রীশ্রীমা তখন পশ্চিমের রান্না ঘরে থাকিতেন। তাহাও ভাঙ্গাচূরা ছিল। ননদিনী থাকিতেও মা পূর্ব্বের ঘরে শোন নাই; কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর এরূপ খোলা ঘরে থাকিবেন, আর মা ভাল ঘরে কিরূপে শুইবেন? এই সময় মা বাধ্য হইয়া অন্য ঘরে শুইলেও তিনি যখন রাত্রিতে বার বার বাজ

যাইতেন, মা জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার অলক্ষিতে পিছন পিছন যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পাছে তিনি পড়িয়া যান। আবার আসিতে থাকিলে আগে আগে আসিয়া ঘরে ঢুকিতেন; কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর জানিলে মা'র রক্ষা নাই, গালিগালাজ ত করিবেনই বা কি প্রমাদ ঘটাইবেন ঠিক নাই। এক দিন টের পাইয়া বাহ্যে বসিয়াই মা'কে ঢিল ছুড়িয়াছিলেন।

লীলা সংবরণের এক মাস পূর্ব্বে বড় ঘরের বারান্দায় দাস মহাশকে বেড়া দেওয়াইয়া দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন। দাস মহাশয় নিফাইন করিয়া ভাল করিয়া চাটার বেড়া দিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে আনা হইল। ঠাকুরের জন্য মা খুব ভারী করিয়া তোষক তৈয়ারী করাইলেন। কিন্তু মণ্ডপে থাকিতে তাহা তিনি পাতিতে দেন নাই। যখন একেবারে দুর্ব্বল, তখন বারান্দায় আসেন ও সেখানে ঐ তোষক পাতিয়া দেওয়া হয়। হরপ্রসন্ন বাবু ঘরে থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে মল পরিস্কার করিতে দেন নাই। মা শত চেষ্টা করিয়াও তাহা পারেন নাই। মা অন্য লোক দ্বারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করাইয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। মা যাইয়া মলের পাতিল ধরিলেও তাহা টের পাইতেন, ধরিতে দিতেন না। যখন একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন, তখনও তিন চারি দিন পরে এক দিন মলের পাতিল নিজে ছেঁচড়াইতে ছেঁচড়াইতে ফেলিয়া আসিতেন। মা'কে বলিতেন "তুমি মল ফেলিলে, হরপ্রসন্ন ঘৃণা করিবে, সে তোমার হাতে

খায়।” শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেচ্‌ড়াইয়া মল ফেলার কথা বলিতে মা এখনও কাঁদিয়া আকুল হন।

লীলা সংবরণের চৌদ্দ দিন পূর্ব্বে রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে ডাকিয়া বলিলেন, “কৈ, সেবা করার ইচ্ছা ছিল না? এস দেখি, কত করিবে?” সেই সময় হইতে মা তাঁহার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা পার্শ্বে বসিলেন। খাইতে বাহির না হইলে তিনি পীড়াপীড়ি করিতেন, তাই খাইতে যাইতেন সত্য; কিন্তু সে নাম মাত্র। ঐ খাবার সময়টুকুও শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেই মাত্র যাওয়া অমনি ডাকা “কৈ, কোথা গেলে গো?” মা খাওয়া হাতেই ছুটিয়া যাইতেন, বলিতেন, “খাইতে বসিয়াছিলাম।” গেলেই আবার ডাক। খাওয়ার সময় টুকুর মধ্যেও শ্রীশ্রীমা চারি পাঁচ বার আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখা দিয়া যাইতেন। মা'কে না দেখিলে শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন। এখন হইতে মল প্রভৃতি সব মা'ই ফেলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের কথা শুনিয়া বহু লোক দেখিতে আসিতেন। মুন্সেফ, ডেপুটীরাও আসিতেন; কিন্তু কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করেন নাই। বলিতেন, “আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, দেখার দরকার নাই।” কাশীকান্ত গাঙ্গুলী তাঁহার ছেলের বড় বধূ সহ দেখিতে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “এ দেহ দেখিলে কষ্ট হইবে। আপনি দেখিবেন কেন?” এই বলিয়া গায়ের কাপড় খুলিয়া দেখাইলেন, কেবল

হাড় কয়খানা, কিছু মাত্র মাংস নাই ; তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে যেন কয়েকখানি কাঠি ; বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগিয়া গিয়াছেন ; নড়া চড়ার শক্তি রহিত। কেবল মুখখানি প্রফুল্ল, যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে ; চক্ষু বিস্ফারিত। পদ যুগলেরও কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই ; পূর্ব্বে যেরূপ এখনও ঠিক তেমনি ; পায়ের পাতার উপর হইতেই শুষ্ক কাঠীবৎ। স্বরের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই, পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে দেহের অবস্থা এরূপ হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইত দেহ খানা যেন আলগা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় আসিয়া পালদের খবর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই শেষ অবস্থা। তাঁহাদের টাকার জন্য পরে মামলা মোকদ্দমা করিতে হইবে। এখন আসিয়া সব লিখিয়া পড়িয়া নিয়া যান। কিন্তু যে দিন তাঁহাদের আসার কথা ছিল, সে দিন আসিলেন না। তাঁহারা আসিবেন, এজন্য তাড়াতাড়ি করায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পোটলা করিয়া যে ভাত রান্না হইত, তাহা একটুকু শক্ত থাকায় আর খাইতে পারিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই শেষ সময়, ইহা ভাবিয়া মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপূজা করিবেন কি? আগামী কল্য শনিবার।" এই শনিবার ৯ই পৌষ। তিনি বলিলেন, "টাকা পয়সা কৈ ? মা বলিলেন, "করিলে বলুন, টাকা পয়সার জন্য ঠেকা হইবে না।" তিনি বলিলেন, "পার্‌লে কর।" মা কৈলাস

দাস মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "কা'ল কালীপূজা করিতে হইবে।" তাঁহাকেই টাকা দিয়া সমস্ত জিনিষ আনিতে বলিলেন। তিনিই বাজার করিলেন, কালী প্রতিমা ফরমাইশ দিলেন। গণক প্রথমে এক দিনে প্রতিমা তৈয়ার করিয়া দিতে পারিবে না বলিয়া, অস্বীকার করিল; পরে অনুনয় করায় সে ছোট করিয়া দিতে রাজী হইল।

পর দিন রাত্রে কালী আনা হইল। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "কালী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া শেষে মণ্ডপে নিয়া রাখ।" পূর্ব্বের ঘরের বারান্দায় দক্ষিণ দিকে তিনি উত্তর শিয়রী হইয়া শুইতেন। পথের নিকট বেড়া ছাড়াইয়া কালী বসান হইল, যেন তিনি দেখিতে পান। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মা ও শরৎবাবু এবং ঘরে হরপ্রসন্ন বাবু, জগবন্ধু ভৌমিক ও অন্যান্য সকলে ছিলেন। কালীর দিকে চাহিবা মাত্রই যেন একটী জ্যোতিঃ বিদ্যুৎবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ হইতে কালীর শরীরে প্রবেশ করিল। তিনি গভীর সমাধি মগ্ন। বহু ক্ষণ এই সমাধিতে থাকেন। সকলের ভয় হইল, শ্রীশ্রীঠাকুর না জানি কালী পূজার দিনই লীলা সংবরণ করেন। বহু ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইল। তখন কালী প্রতিমা মণ্ডপে নেওয়া হইল। ঢাকের বাড়ি পড়া মাত্রই পুনরায় সমাধি। আর বিন্দু মাত্রও দৈহিক ক্রিয়া রহিল না। তখন বাতাসই কি, আর অন্যান্য শুশ্রূষাই কি; দেহে যেন আর প্রাণ নাই! যতক্ষণ পূজা হইল তিনি ঐ ভাবেই রহিলেন। মা সব সময়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট

ছিলেন। পূজার কাজ ঠা'নদিদি ও তাঁহার ছোট মেয়ে করিলেন। শরৎবাবু মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতেন, ঠাকুরের কাছেও থাকিতেন। তাঁহার নিকট কেহ গেলে, তিনি বিরক্ত হইতেন, তথাপি শরৎবাবু পাক করিয়া খাওয়া দাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেই থাকিতেন, বাতাস করিতেন, সময়ে গানেও টান দিতেন এবং ভাগবতাদিও পাঠ করিতেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন, অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে বলিতেন, "সচ্চিদানন্দ অখণ্ড চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্য।" সময় সময় সমাধির পর সুপ্তোত্থিত শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখ বাড়িলে তাঁহার ভগিনী সারদা, শাশুড়ী ও শালী প্রভৃতি অনেক লোক আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে চাহিলেন। তিনি কাহাকেও তাহা করিতে দেন নাই। শুধু মা একাই অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এসময় নটবর বাবু, পার্ব্বতী বাবু, অন্নদা ঠাকুর প্রভৃতি প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, এই দারুণ দুর্দ্দিনেও শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহাগত অতিথিগণের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এই সময় কৈলাস দাস মহাশয় হাট বাজার করিয়া যাহার যেরূপ আহারে রুচি, তাহার জন্য সেইরূপ খাদ্যই আনাইয়া দিতেন এবং অতি যত্ন ও আদরের সহিত সকলকে খাওয়াইতেন। এক দিন শরৎবাবু গাহিতেছেন,—"আমায় দে মা পাগল করে", ঠাকুর

রোগ শয্যায় শায়িত, নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই, কিন্তু এই গান শুনিয়াই সমাধির ভাব এবং এ অবস্থায়ও উঠিয়া বসিলেন, শরৎ গান গাহিতেছিলেন সুতরাং তাঁহার এ অবস্থা দেখিতে পান নাই। মা শরৎবাবুকে ডাকিয়া ইসারা করিলে শরৎবাবু দেখিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে সমাধি মগ্ন। তখন শরৎবাবুর ভয় হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিলে, শরৎ ও মা তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন। তিনি তখনও বলিতে লাগিলেন, "দে মা আমায় পাগল করে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পেটে অত্যন্ত জ্বালা, হুস হইলেই বলিতেন, "জ্বলিয়া যায়, জ্বলিয়া যায়।" পানার নীচের ঠাণ্ডা জল মাটির ঘটে করিয়া পেটে চাপিয়া ধরা হইত। দুই পাখার বাতাসেও কুলায় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল অবস্থায় নিজে ত বাতাস দেনই নাই, এমন কি মা দিতে গেলেও দিতে দেন নাই। অনেক সময় বলিয়াছেন, "অন্যের দায়ে প্রাণ গেল, অন্যের দায়ে প্রাণ গেল।" কিছুই খাইতে পারিতেন না, এক ঝিনুক বেদানার রস পর্য্যন্ত খাইলে কষ্ট হইত। তখন তিনি মা'কে বলিয়াছিলেন, "সময় থাক্‌তে খাইও; শেষে ইচ্ছা করিলেও খাওয়া যায় না।"

কল্পতরু

লীলাসংবরণের পূর্ব্বে ৮ই পৌষ শুক্রবার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎবাবুকে দিন দেখিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন সেই দিন ভাল কিনা। শরৎবাবু বলিলেন, "ভালই।" তখন সকলে ভাবিলেন, আজই বুঝি তিনি লীলাসংবরণ করিবেন। রাত্রি একটার সময় শ্রীশ্রীমা ও শরৎবাবু নিকটে; হরপ্রসন্ন বাবু, জগবন্ধু বাবু, নটবর বাবু, আদিত্য ঘোষ, পার্ব্বতী মিত্র, হরকামিনী দেবী, তাঁহার কন্যা বিনোদা ও ঠা'নদিদি ঘরে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ হাতে তুড়ি দিতে দিতে সজোরে বলিতে লাগিলেন—যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, যথা যোগ্য বাহনারূঢ় দেবতাগণ পরিশোভিত অনন্ত তীর্থ সমূহ, গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া যত তীর্থ আছে—হরিদ্বার! হরিদ্বার! ঐ যে ভাগিরথী কল কল শব্দে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া আকা বাঁকা হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ঐ যে পর পারে চণ্ডীর পাহাড় দেখিতে পাইতেছি, কত কত ঘাট পার হইতে নামিয়া আসিয়া গঙ্গা জলে পড়িয়াছে। আমি বহু দিন যাবত স্নান করি নাই, একটু স্নান করিয়া লই। 'মা গঙ্গা' 'মা গঙ্গা' এই বলিয়া একেবারে সমাধি মগ্ন হইলেন, যেন যথার্থই স্নান করিতে গেলেন। পরে যেন প্রয়াগ তীর্থে আসিয়া বলিলেন, 'জয় যমুনে, জয় গঙ্গে'। এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,

কোথায়, ভরদ্বাজের আশ্রম ত দেখিতে পাইতেছি না ? কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকিয়া, পরে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি,অপর পারে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে আবার বলিলেন "জয় রাম ! জয় রাম !" আবার গভীর সমাধি মগ্ন। তৎপর সাগর তীর্থের নাম করিতে করিতে সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার করিলেন। কাশী দর্শন হইলে বলিলেন, "জয় শিব, জয় শিব, বিশ্বেশ্বর ! হর হর বম্ বম্।" ইহার পরে জগন্নাথ পুরীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ঐ যে জগন্নাথ দেবের উচ্চ মন্দির ঐ যে আনন্দ বাজার, মহা প্রসাদ বেচা কিনা হইতেছে।" শেষে দুই একবার চৈতন্যের নাম নিয়া একটু ঘুমের আবেশ হইল। যখন কপিলাশ্রমের কথা বলিয়াছিলেন তখন বলিলেন—মহামুনি কপিল। কপিল, বড় তেজ, বড় তেজ। এইরূপে সব তীর্থ, এক একটী তীর্থ পনর মিনিট, আধ ঘণ্টা করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যখন এই ভাব হইল তখন ব্যারাম বলিয়া কেহ বুঝিতেও পারিল না। শরৎবাবু সম্মুখে বসা ছিলেন। নটবর বাবু প্রভৃতি যাঁহারা ঘরে বসা ছিলেন সকলেই নিকটে গেলেন। কেহ কেহ স্পর্শও করিলেন। সব তীর্থের বর্ণনা শেষ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিলেন। কোন উদ্বেগ, কোন কথা, কিছুই নাই, যেন দেহখানা প্রাণ ছাড়া।

লীলা সংবরণের পূর্ব্ব রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার উঠিতে চান, একবার বসিতে চান। এত দুর্ব্বল যে উঠাইলে কখন

কি হয়, এই আশঙ্কা। একবার মা ধরিয়া উঠাইলেন। অল্প সময় পরেই আবার শোয়াইলেন। যখন উঠান হইল, তখন তিনি মা'কে বলিলেন, "তুমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার, তুমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার।" এইরূপ তিন চারি বার বলিলেন। আরও বলিলেন, "পরের পুত্রে পুত্রবতী ভাগ্যবতী যশোদা।" মা বলিলেন, "রাখিবার কি সাধ্য আছে? মানুষ কি রাখ্‌তে পারে"? তখন শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিলেন, "তুমি রাখ্‌লে রাখতে পার," মা চুপ রহিলেন। তারপর তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন। তিনি শিব নেত্রে সমাধিতে রহিলেন। চক্ষু নাসাগ্রে বদ্ধ, কখনও বা এপাশ ওপাশ করিলেন মাত্র। কখন কি হয়, এই আশঙ্কায় আগেই ফুল বেল পাতা আনিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই দিন শীত খুব বেশী ছিল। পার্ব্বতী মিত্র উঠানে আগুন জ্বালাইতেই ব্যস্ত। এত শীত, শরীর যেন বরফ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপ শীত কখনও ভোগ করেন নাই।

চারিদিকে লোক। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। অন্য দিন কেহ গেলে, অশান্তি বোধ করিতেন। শ্রীশ্রীমা পায়ের কাছে, হরকামিণী দেবী, তাহার কন্যা, শরৎবাবু, কৈলাস দাস, আদিত্য ঘোষ, ঠা'ন্‌দিদি ও ঠাকুরের ভগিনী সারদা দেবী সব চারিদিকে। প্রথম মা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, পরে দেখাদেখি জগবন্ধু ভৌমিক, হরকামিণী দেবী ও অন্যান্য সকলেই দিলেন। রাত্রে কেহ ঐ জায়গা ছাড়িয়া আসেন নাই। খাওয়া দাওয়া কিছুই নাই। ভোর পাঁচ টায় কৈলাস

দাস শ্রীনাথ গুহ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীনাথ বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে চিনেন কি?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আপনি শ্রীনাথ বাবু।" তখন হইতে চক্ষে আর পলক নাই। নাসাগ্রে দৃষ্টি বদ্ধ, শ্বাস রুদ্ধ মহা সমাধিতে ডুবিতেছেন। ঘরের বাহির করা হইল। শরৎবাবুর বাহিরে আনার মত ছিল না। মা বলিলেন, "ঘরে রাখার কি প্রয়োজন আছে? সমাজে যাহা চল আছে, তাহাই কর।" সারা দিন উঠানে রাখা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩০৬ সালের ১৩ই পৌষ, বুধবার প্রাতে ৫৩ বৎসর ৪ মাস ৬ দিন বয়ঃক্রম কালে লীলা সংবরণ করেন। শরৎবাবু বলিলেন "মহা পুরুষদের জীবন ত্যাগ টের পাওয়া যায় না, সমাধিতে থাকেন। বার ঘণ্টা পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা হইবে।" সংবাদ পাইয়া বহু লোক সমাগম হইল। সারা দিন লোক আসিতে লাগিল, পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল; ফুল বেল পাতায় বাড়ী ভরিয়া গেল। ফুলের মালা দিয়া সাজান হইল। শরৎবাবু নিজ ব্যয়ে ফটো তুলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তোলার জন্য কেহ কেহ গোপনে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ফুল বেলপাতায় সুসজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীমা চারি দিকে বেদানা প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা ও ধূপ দীপ সহ ভোগ দিয়া পূজা করিলেন এবং সাত প্রদক্ষিণ করিয়া কেশ দিয়া পা মুছাইয়া দিলেন।

বাড়ীর দক্ষিণ দিকে যেখানে ঠাকুরের পিতার চিতা, তাহার সংলগ্ন জায়গায় পবিত্র দেহ রাত্রিতে ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠে ভস্ম করা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত ভস্মরাশি একটী পিতলের কলসীতে রাখিয়া তাঁহার স্বরচিত একটী গীত সহ তাহা চিতা ভূমিতে প্রোথিত করা হইল। হরপ্রসন্ন বাবু বৈকালে আসিলেন। বেলুর মঠের সারদানন্দ স্বামী রাত্রে দাহ সময় ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। দাহ শেষ হইলে শরৎ বাবু, সারদানন্দ স্বামী ও অন্যান্য সকলে কামিনী গাঙ্গুলীর বাড়ী খাইতে গেলেন। আবার কেহ কেহ গেলও না। স্বামিজী জেদ করিলেন, মা না খাইলে খাইবেন না ; সেজন্য ঐ ভোগের বেদানার একটী দানা ও এক রোয়া কমলায় কামড় দিয়া ফেলিয়া মা বলিলেন, খাইয়াছি। তারপর দিনও কামিনী গাঙ্গুলীর বাড়ী খাইয়া স্বামিজী চলিয়া গেলেন। লীলা সংবরণ হইলে শ্রীশ্রীমা'র অবস্থা এমন হইল যে সকলেই ভাবিল, মা'র দেহও এ সঙ্গেই যাইবে। দেহেতে প্রাণ ছিল বটে, কিন্তু একেবারে আত্মহারা, অজ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও কোন ঔষধ খান নাই। লীলা সংবরণের তিন চারি দিন পূর্ব্বে দুই এক দিন সেচি শাকের রস ও দুই এক দিন হেলেঞ্চার রস খাইয়াছিলেন।

লীলা সংবরণের পূর্ব্বেও দুই তিন দিন সারদানন্দ স্বামী ঢাকা হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইদানীং

(লীলা সংবরণের পর)

শ্রীশ্রীঠাকুর যে কালীপূজা করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি তুলসী তলায় ছিল পরে উহা সমাধির উপর রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় মা প্রতি দিন ধূপ, বাতি ও বৈকালী দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সংবরণের এক মাস মধ্যেই চৌদ্দ দিনের দিন মা গঙ্গাতে অস্থি দিতে ও পালদের নিকট হইতে টাকা আনিতে কলিকাতা যান। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লৌকিক রীতি ও সামাজিক প্রথানুসারে ৩০ দিন হবিষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমা যথা রীতি শ্রাদ্ধ করেন এবং বহু লোক ভোজন করান। শ্রাদ্ধে মা কাহারও কোনরূপ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

সাধু সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য বহু লোক দেশ বিদেশ হইতে ঠাকুর বাড়ী আসিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করিতে এবং কথা বলিতে চান। স্ত্রীলোক হইলে মা আদর করিয়া ঘরে নিয়া যান, পুরুষ হইলে অন্য লোক দিয়া বলান যে পুরুষের আবার মেয়েলোকের সঙ্গে দেখা ও কথা বলিবার কি

বেশী পীড়াপীড়ি করিলে ঘরে কবাট দিয়া বসিয়া থাকেন,

পর্য্যন্ত আগন্তুক চলিয়া না যান সে পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হন না। অনেকে বলেন "আপনি মা, ছেলেদের নিকট আবার লজ্জা কি?" মা বলেন "প্রথম মায়ের মত লাগুক, পরে ছেলে বলিয়া কথা বলিব।" মা সর্ব্বদা চলা ফেরা করিতেও বড় ঘোমটা দিয়া ছাড়া চলেন না।

মা সংসারের সকল কার্য্য নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতেন, কাহাকেও কিছু করিতে দেন নাই; এমনকি তাঁহার ভগিনী হরকামিনী দেবীকেও কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। তিনি যেন দশ হাতে দশ দিকে কাজ করিয়া বেড়ান। ব্যথা-বেদনা অসুস্থতা মা'র অনেক সময়ই থাকে কিন্তু কোন আগন্তুকের তাহা টের পাওয়ার যো নাই। হয়ত ব্যথায় পড়িয়া কোকাইতেছেন, তখন কেহ আসিল; মা অমনি উঠিয়া আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন এবং যাহা যাহা করা প্রয়োজন সবই করিলেন। আবার তাহারা চলিয়া গেলে যাইয়া শুইলেন। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে মা'র কোন অসুখ কেহ টের পায় না, হয়ত পূর্ব্ব দিন এমন ছিল যে বিছানা হইতে মাথা তুলিতে পারেন নাই। কাজের পরেও পূর্ব্বাবস্থা কিন্তু কাজের দিন কিছুই বুঝা যায় না, দৌড়াদৌড়ি করিয়া সব কাজ করেন। ঠাকুর বাড়ী যাহারা যান তাঁহাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় যত্ন আদর ও স্নেহ করিয়া থাকেন। বিশেষ ভোগের দিন তাহাদের কেহ কারণে অনুপস্থিত থাকিলে মা প্রসাদ বহু দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দেন। এমন কি মিষ্টান্ন তিন চারি দিন পর্য্যন্ত নূতন

দুধ দিয়া জ্বাল দিয়া রাখিয়াও খাওয়ান। নিজের খাওয়ার দিকে কোন লক্ষ্যই নাই; পরকে খাওয়াইতেই শত ব্যস্ত। তাঁহারাও মা'কে নিজ জননী হইতেও অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন। স্নেহ, দয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরার্থপরতার জীবন্ত ছবি মাতাঠাকুরাণীকে দেখিলে মনে হয় তপস্যার মূর্ত্তিমতী হইয়া আদর্শ রমণীরূপে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরের পুণ্য-স্মৃতি ও পবিত্র ভস্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীমা'র কৃপায় দেওভোগ এখন পরম তীর্থস্থান হইয়াছে। যাঁহারা তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন—যত্নে, আদরে, অতিথিসৎকারে মহা পুরুষের পবিত্র প্রভাব দেওভোগে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে।

পতি ভিন্ন মাতাঠাকুরাণীর অন্য ইষ্ট কখনই ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি পূজা না করিয়া তিনি কিছু খান না। এক বৎসর মহাষ্টমী পূজার দিন মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের পায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুষ্পগুলি কুড়াইয়া একটী স্বর্ণ কবচে পূরিয়া গল দেশে ধারণ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়িবে, সেই জন্য যে হুঁকায় তিনি তামাক খাইতেন, তাহার উপর কল্কি সহ তিনি যেভাবে রাখিয়াছিলেন ঐ কল্কির গুল সহ সেই ভাবে মা অনেক দিন রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহার্য্য হুঁকা, কল্কি, এব পাথরের ভারি বাটি (কিঞ্চিৎ ভগ্ন) অদ্যাপি মা রাখিয়াে

তাঁহার শেষ সময়ের পরিধেয় কাপড় আজও মা রাখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে যে সুমধুর গন্ধ ছিল তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। লীলা সংবরণের পূর্ব্ব রাত্রিতে মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে অঞ্জলি দিয়াছিলেন সে নির্ম্মাল্য এখনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত গানের মধ্যে ১২৪৫টী পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই শ্যামা বিষয়ক; হরি বিষয়ক ১৭টী, মন শিক্ষা সম্বন্ধীয় ৪টী, গুরু সম্পর্কে ৬টী ও শিব সঙ্গীত ৭টী। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি স্বরূপ মা এসব রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত ছয়টী গান নিম্নে দেওয়া গেল।

(১)

হরিনাম কে নিবি ভাই, তোরা সবে দৌড়ে আয়।
নবদ্বীপের মাঝে হরি নাম বিতরে (আমার) গৌররায়॥
গৌর নিতাই দুটী ভাই, এমন দয়াল হতে নাই,
তারা জাতের গৌরব করে নাই, (ছোট বড় সবাইকে)
যেচে যেচে নাম বিলায়॥
এ নাম নিলে মুখে, কারো কি আর জ্বালা থাকে,
হৃদয় ভাসে স্বর্গ সুখে, পাপ তাপ সব দূরে পালায়॥
তাই ন'দেবাসী সবে মিল, আবাল বৃদ্ধ শিশু ছেলে,
তারা সবে প্রেমে গলে, নাম সুধা রস পান করিয়া মাতিয়া
বেড়ায়॥

নামের এমনি গুণ বটে, নাম শুনে সব আস্‌ছে ছুটে,
নামের গুণে অন্ধ দেখে খঞ্জ হাটে আবার বোবা এসে নেচে
নেচে সংকীর্ত্তন গায় ॥
এমনি মধুর হরিনাম, অনন্ত সুখ ধাম,
সদা ভক্ত সঙ্গে গায় অবিরাম, সুধাময় নামদিয়া সবার
প্রাণ বাচায় ॥
অকিঞ্চন বলে এস ভাই সবে মিলে আমরা সবে হরি বলে,
ছুটে যাইয়া ধরি গোরার পায় ॥

(২)

মনরে, কেন এত তমো গুণ কেন এত অভিমান।
যদি হে নিশ্চয় জান রবে না এদেহে প্রাণ ॥
আমি হই আমি করি মিছা আমি আমার করি, বিষয়
যোগ অভ্যাস করি,
আছ সেই অনুরাগে করে অহং জ্ঞান ॥
মায়া মোহে মুগ্ধ হয়ে, দারা পরিজন লয়ে,
অজ্ঞানেতে জ্ঞান হারায়ে, বৃথা ভাব ধন মান ॥
কার কর্ম্ম কেবা করে মন তুমি জান নারে,
ভ্রমিতেছ অহংকারে না জেনে বিধান ॥
অতএব বলি শুন ত্যজ দম্ভ তমো গুণ,
অন্তরে বৈরাগ্য আন করে সত্য অনুষ্ঠান ॥

(৩)

গুরুগো, আর কিছু বাসনা নাই মনে।
কেবল এই এক নিবেদন শ্রীচরণে ॥
যেন তব দত্ত ধন, সদা সর্ব্বক্ষণ, হৃদয় মাঝে রাখি
পরম যতনে।
যখন যা করি, নাম যেন না পাসরি, সদা মন যেন থাকে
ঐ চরণে ॥
গুরুগো, তুমি দয়াময়, নিজগুণে হইয়া সদয়, আশীর্ব্বাদ
কর অকিঞ্চনে ॥

(৪)

ববম্ ববম্ ভোলা ভোলার পরিধানে ব্যাঘ্র ছালা ॥
ভোলা ভাঙ্গ ধুতুরা খাইয়া শ্মশানে মশানে যাইয়া ভূতের
সঙ্গে করে খেলা ॥
ভোলা মুখে বলে হরে হরে শিঙ্গা ডম্বুর করে গলে দিয়া
রুদ্রাক্ষ মালা ॥
ভোলা আপনি যেমন করে তেমন যদি কেহ হয় তার চেলা ॥
ভোলা এ অকিঞ্চনে দয়া করে সদা রাখহ চরণে দিয়া
দুটী চরণ ধূলা ॥

(৫)

ওগো শ্যামা মা আমি দিবা নিশি আর দুঃখের জ্বালায়
জ্বলব কত।
যেন মাতৃ হীন বালকের মত ॥

দুঃখে দুঃখে জনম গেল, আর কত দুঃখ দিবে মা বল,
যাতনা আর সহে না ত ॥
ওগো মাতা বর্ত্তমানে এত দুঃখ সন্তানে, এমত কোথা
শুনি নাত ॥
ওগো তারা ব্রহ্মময়ী মা যার ব্রহ্ম-দীনদয়াময়ী,
তার কপালে কি দুঃখ হয় এত ॥
অভাগা অকিঞ্চন বলে কপালের দুঃখ যা তাই যদি ফলে,
তবে তোমার দয়া কই মা দেখি না ত ॥

(৬)

কালী ওগ মা আমি এখন অসময় যাব কোথা
ওগ মা ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছ জগন্মাতা ॥
ওগ তুমি এমনি পাষাণ মেয়ে আছগ মা নিশ্চিন্ত হয়ে
এখন একবার দেখ না চেয়ে মুখে নাই আর কোন কথা ॥
দেখ মা মনে করে কি ধন রেখেছ আমার তরে ধনের মধ্যে
চরণ তাও ত্রিপুরারি নিয়েছেন হরে আমার কপালে ঝুলি কাথা
তাই বলি মা তোমায় এখন যদি আমায় স্থান দিয়া না রাখ
রাঙ্গা পায় তবে চির দিনের তরে নামেতে রবে কলঙ্ক গাথা ॥

লীলা সংবরণের পরই চাঁদা তুলিয়া সমাধির উপর একখানি ছনের চৌচালা সম্মুখে বারান্দা সহ তোলা হয়। হরপ্রসন্ন বাবুও দশ টাকা দিয়াছিলেন। কাজের ভার জগবন্ধু ভৌমিক

নিয়াছিলেন। উক্ত টাকায় ঘর হইতেছেনা দেখিয়া মা হরপ্রসন্ন বাবুকে বলেন, "ভূইঞাকে কাজে লাগাইয়া সব সরিয়া পড়িলে, এখন ঘর হইতেছে না; সে কি করে? তাঁহার যন্ত্রণা হইতেছে।" হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "আমাকে বিকি বস্‌তে বল নাকি?" মা বলিলেন "আমি আমার জন্য বিকি বস্‌তে বলি না, আমি কি কাহারও নিকট এক পয়সাও চাহিয়াছি নাকি? না, কেহ আমাকে দেও? তোমরা আমাকে কেই বা জিজ্ঞাসা কর? হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "বলতে পার না?" মা বলিলেন, "যদি বল্‌তেই হয় তবে তোমাদিগকে কেন? তোমরা কি কিছু জান না? নারায়ণগঞ্জে যদি বলি, তবে করিবার লোক আমার অনেক আছে।" তিনি জ বন্ধু বাবুর উপর অনেক তম্বি করিলেন, তিনি নীরবে শুনলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তৈয়ারী হইলে শ্রীশ্রীমা এক খানা [illegible]জের কাছে রাখিয়াছিলেন এবং প্রতি দিন পূজা না করিয়া জল গ্রহণও করিতেন না। সমাধির উপর ঘর সমাপন হইলে, মহা সমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ফটো এবং অন্য এক খানা ফটোও স্থাপন করা হয়। তদবধি প্রতি দিন সেখানে ব্রাহ্মণ পূজা আরতি করেন ও ভোগ রাগ দেন। চার বেলাই ভোগ হয়, মধ্যাহ্নে কেবল আতপ অন্নের নিরামিষ ভোগ হয়। এই ভোগ হইতে শ্রীশ্রীমা এক বেলা দুটী খান। প্রতি শনি মঙ্গল বার

পরের ফটো খানা অন্য ঘরে নিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাছ দিয়া ভোগ দেওয়া হইত; এখনও বিশেষ দিনে ও পূজা পার্ব্বণে মাছের ভোগ ভিন্ন ঘরে হয়। বহু লোক প্রসাদ পায়। লীলাবসানের প্রথম ভাদ্র মাস হইতেই ভাদ্র শুক্লা-প্রতিপদে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে উৎসব মহা সমারোহে হয়।

লীলা সংবরণের অল্প দিন পরেই পুরোহিতগণ বসত বাড়ীর রেহাণী দলিল খরিদ করিতে বৃন্দাবন পালের নিকট যান। একথা শুনিয়া ঠাকুর বাড়ী হইতে লোক যায় এবং ম: দেনা শোধ করিয়া রেহাণ মুক্ত করেন। পালেরা স্থদের এক পয়সাও নেয় নাই। চন্দ্রকিশোর দত্ত, চন্দ্রকুমার মণীন্দ্র ঘোষ ও নটবর মুখোপাধ্যায় ঐ টাকা দেন। ১ সনের পৌষ মাসে শ্রীশ্রীমা তাহাদের ঐ টাকাও সব পরি করিয়াছেন।

লীলা সংবরণের পর যাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বরা যাইত তাঁহারা সকলেই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর বাড়ী একা হইয়া বহু রাত্র পর্য্যন্ত নটবর বাবুকে প্রমুখ করিয়া ভাগবত শাস্ত্র পাঠ করিতেন এবং তুমুল কীর্ত্তন করিতেন। নটবর এক নিয়ম করেন যে প্রতি দিন প্রত্যেকে সন্ধ্যার ঠাকুর বাড়ী যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অথবা শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একটী করিয়া গান লিখিয়া নিতে হইবে। প্রত্যে গান লিখিয়া নিতেন এবং সে সব গানও তথায় কীর্ত্তন হইত।

১৩২৭ সনের মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে নটবর বাবুর উৎসাহে ও যত্নে স্বর্গীয় কালীচরণ ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুর স্থাপন করা হয় এবং পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমা'র জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে মহা সমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করা হয়। শ্রীশ্রীমা নিজগুণে কৃপা করিয়া তথায় গিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি দিন ভোগ আরতি হয় এবং প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন উৎসব হয়। শ্রীশ্রীমাও কৃপা করিয়া তথায় যাইয়া থাকেন। সন্ধ্যা আরতির সময় গত বৎসর হইতে প্রতি দিন যে স্তব পাঠ হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

ওঁ শ্রীশ্রীমাঁ!

সান্ধ্য স্তোত্রং।

রাগিণী—পূরবী।

ত্বং হি ত্বং হি ত্বং হি কেবলম্
ভজেহহং সততং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্
মহাকাল রূপং বিরাট্‌পুরুষং
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্॥

চিন্ময় ব্যোমাতীতং নিরুপাধি নিরাশ্রয়ং
বাঙ্মনসাতীতং ওঁকার স্বরূপম্
বিধি হরিহর নিত্য পূজিতম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

আদ্যন্তরহিতম অচিন্ত্যমব্যক্তম্
অনন্তরূপম্ অখণ্ডমব্যয়ম্
বেদাগম্যং বেদান্ত বেদ্যম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

পরিব্যাপ্তমিদং সচরাচরং
মায়াযুক্তং ত্রিপুরাগর্ভসম্ভূতম্
স্বেচ্ছয়া দেবভোগ-পুর্য্যবতীর্ণম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

মোহনতনুং লাবণ্যচ্ছটং
তপ্তকাঞ্চনাভং মুনিমনোলোভম্
সুচারু সুঠাম সুগঠনকায়ম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

তরুণভানু পদকমলং
বিধু খণ্ড-নখ-মণ্ডলম্
সুমধুরগন্ধং সমুজ্জ্বল বর্ণম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

ঢুলু ঢুলু আঁখি প্রেম-বিগলিতং
ভঙ্গি বাঁকা নয়নাপাঙ্গম্
দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিতং নাসাতিলফুলকম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

ত্রিশূলাঙ্কিত বিশাল ললাটং
বক্ষঃ পদ্মচিহ্নম্ আরক্তিম হস্তম্
গুম্ফ মণ্ডিতৌষ্ঠং মৃদুহাস্যমুখম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

নভূতশ্রুত বচনমধুরং
নশ্রুতবীণা-নিন্দিত কণ্ঠম্
রসিক নাগরং সানন্দপুরুষম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

দৃষ্টার্ত্তদুঃখং ধরাবতীর্ণম্
কলৌ সংসারে স্বধর্ম্মতৎপরম্
জীবসেবাব্রতে দেহ প্রাণোৎসর্গম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

সর্ব্বভূতাত্মভূতং ত্যাগদানতিতিক্ষম্
নিষ্কলং শুদ্ধম্ অহিংস ব্রতম্
অমানিনে দীনায় মানদায়কম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

মদনমাদন্ ভীতিভাজনং
লীলা হেতোঃ প্রকৃতিপুরুষম্
নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকারং বাসনাত্যক্তম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

আত্মগোপন বাসনৈকং
দয়া দীনতা ক্ষমা সত্যাঙ্গভূষণম্
বিদেহ বিকল্পিতং ত্রিগুণাতীতম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

কীর্ত্তনপ্রিয়ং দীনদয়ালনন্দনম্
অপরিগ্রাহিণং সদান্তর্য্যামিনম্
নিত্যং নির্লিপ্তম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

রহিত মায়ামোহম্ অকিঞ্চন বেশম্
শক্তিমন্ত্র দীক্ষিতং মহাশক্তিরূপম্
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ং পুরুষ পুরাণম্ ।
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

নেত্যৈবাগম্যং ন সাধনা সাধ্যম্
ন চ যোগযাগেন কৃপয়া হি সিদ্ধম্
কল্পতরুং তৈজসং নির্ব্বাণদায়কম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

ভক্তপ্রিয়ং সদা সঙ্কটবারণম্
বন্ধুহীনানাং বান্ধব কেবলম্
সর্ব্ব নিয়ন্তারং নিয়তি খণ্ডনম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

অজ্ঞান জ্ঞানদং কালভয় বারণম্
ভীষণানাং ভীষণং পাষণ্ডদলনম্
চূর্ণয়িত্বা দর্পং রিপুকুল (ম্লেচ্ছদল) নাশনম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

লোমকূপমেকম্ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডং
হাহা-হূহূ-বিশ্বপাসেবিতম্
যস্মাদুদ্ভবম্ অবতারাগণনম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

মহাযোগেশ্বরং যোগমায়াধীশ্বরং
দেবাদিদেবং রাজরাজেশ্বরম্
অকৃত্যাশ্রিতাণাং বাসনা পূরণম্
প্রণমামি ঈশ-শ্রীদুর্গাচরণম্ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ—

তিনি যখন ঢাকা আসেন, তখন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঠাকুর বাড়ী আসিয়াছিলেন ; সঙ্গে একটী ব্রহ্মচারী ও হরপ্রসন্ন বাবুকে নিয়া আসেন। অন্যান্য লোকদিগকে মানা করিয়া আসিয়াছিলেন যে ওখানে গোলমাল ভাল নয়, মা'র যন্ত্রণা হইবে। পূর্ব্বেই খবর দিয়াছিলেন, বেলা ৯'টার গাড়ীতে এখানে আসিবেন। মা পাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "স্বামীজীকে ভোগের আগেই খাইতে দেও।" স্বামীজী একথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, তা হবে না, আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ সরুক পরে প্রসাদ পাইব।" তাহাই করা হইল। তাঁহার জন্য প্রভৃতিও ভিন্ন পাক হইয়াছিল, মা নিজ হাতে নিরামিষ পাক করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই খাইলেন। সামান্য আনিয়া দেওয়া হইল। খাওয়া দাওয়া করিয়া স্বা মণ্ডপে শুইয়াছিলেন। তখন সাবেক ছনের মণ্ডপ ছি। ঘুম হইতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় শান্তিতে ঘুমাইলা এমন ঘুম আমার বার বৎসরের মধ্যেও হয় নাই।" তি নটবর বাবুর পুকুরে যাইয়া বহু সময় ব্যাপিয়া ডুব দিয়া করেন এবং বলিয়াছিলেন যে সেই স্থানে তাঁহার অত্যন্ত হইয়াছিল। তিনি ৫'টার গাড়ীতে ঢাকা চলিয়া যান। কাপড় দেন, তাহা তিনি মাথায় বাঁধিয়া নিয়া যান। * স্বামি

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদারের বিবেকানন্দ চরিত পৃঃ ৪৭০, ৪৭

এখানে আসিলে আবাল বৃদ্ধ অনেকেই দেখিতে আসিয়াছিল। কালীচরণ ভৌমিক মহাশয় আসিয়াই প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামিজী, আপনি বহু দেশ ঘুরিয়াছেন, মুক্ত পুরুষ কয়টী দেখিয়াছেন?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন— "বহু জঙ্গল দেখা যায়; কিন্তু সিংহ তাহাতে কয়টী থাকে?" অনেকে অনেক প্রশ্ন করিলেন; তিনিও যথাযথ উত্তর দিলেন।

স্বামিজী তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবী ঘুরি[illegible]াম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না। সমুদ্রেরও জোয়ার ভাটা আছে, কিন্তু নাগ মহাশয়ের মধ্যে কে[illegible]নরূপ ভাব বিপর্য্যয় দেখি নাই।" ঢাকা আসার পূর্ব্বে স্বা[illegible]জী বলিয়াছিলেন "ওদেশে যাইয়া আর বক্তৃতা করবার ইচ্[illegible] বা প্রয়োজন নাই। যে দেশ নাগ মহাশয়ের চন্দ্রালোকে আ[illegible]কিত সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলব! উঁহার ন্য[illegible] মহাপুরুষের চিন্তা তরঙ্গে (Thought vibration) দে[illegible]শর চিন্তা স্রোতের গতি ফিরিয়া যায়।"

স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ঃ—

বেলুর মঠের প্রেমানন্দ স্বামী একবার নারায়ণগঞ্জ নিবারণ [illegible]ৗর বাসায় আসিয়াছিলেন। ঠাকুর বাড়ী যাওয়ার সময় [illegible]ীর বায়ু কোণ দিয়া উঠিতেই জুতা ছাড়িয়া দিলেন। উঠানের [illegible]ণে আসিয়া জামা ছাড়িয়া রোয়াইল গাছে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে [illegible]ণাম করিলেন এবং উঠানে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ধূলি লাগিয়া গা পবিত্র হউক।" প্রথম দিন আসার সময়

ভোগের জন্য ফলাদি আনিয়াছিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু ও ৫।৭ জন লোক সহ এখানে আসেন। শ্রীশ্রীমা সকলকে জলযোগ করাইয়াছিলেন।

অন্য এক দিন প্রেমানন্দ স্বামীকে মা খাবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু লোক জন সহ আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের পর তাঁহারা প্রসাদ নিলেন। স্বামিজী নিজে অনেককে দধি পরিবেশন করিলেন। পরে বৈকালে চলিয়া গে
স্বামী প্রেমানন্দ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এ দেশের ডাইল তিতা দিয়ে খেতে ভাল।" পরে এক দিন মা পরমান্ন সহ অন্যান্য সুখাদ্য ও খেসারির তিতা ডাইল দিলেন, তাহা খাইয়া তিনি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি মা প্রেমানন্দ স্বামীকে কাপড় দেন, তিনি তাহা মাথায় বাঁ নিয়াছিলেন।

ইহার দুই তিন বৎসর পর স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্ম আসিয়াছিলেন, উভয়ে জামা খুলিয়া উঠানে একেবারে হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন,—গায়ে ধূলা লাগিয়া দেহ পা হইবে বলিয়া। অনেক লোক সঙ্গে ছিল। মা সকল জলযোগ করাইলেন। উঠানে কীর্ত্তন হইতেছিল। প্রেমা স্বামী হাত তুলিয়া নাচিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রেমানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর হাত ধরি বলিলেন, "দাদা নেচে নেও, এই নাচিবার জায়গা। সব জায়গার পাপ তাপ নিয়ে আসিলে এখানে দিয়ে যাও

ব্রহ্মানন্দ স্বামী দুই একবার নাচন দিতেই ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী পূর্ব্বে কখনও নাচেন নাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ ঢাকায় থাকা কালীন যে সব লোক সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, পূর্ব্ব বঙ্গের লোকের ধর্ম্মের জন্য কোথাও যেতে হবে না। সকল"ক বলিতেন, "দেওভোগ যাও, ঐ ধূলা গায় দেও, আর কিছু দরকার হবে না।"

স্বামী তুরিয়ানন্দ :—

মা কাশীতে পায়ে আঘাত পাইয়া, প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে গেলেন, পা নিয়া বিষম ব্যাপার। পায়ে ৫।৭টা অস্ত্র করা হয়। মথুরা হইতে ডাক্তার আনান হইয়াছিল। মা'র সঙ্গে মহেন্দ্র আবার, ঠা'নদিদি, হরকামিনী দেবী ও তাহার স্বামী কৈলাশ দা ছিলেন। অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইলে, নটবর বাবুকে মহেন্দ্র যাইতে লিখেন। নটবর বাবু গেলে সবাই চলিয়া আসেন, কেবল নটবর বাবু রহিলেন। তুড়ীয়ানন্দ স্বামী তখন বৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নটবর বাবু দেখা করিলেন, তদবধি স্বামিজী মা'কে দেখিতে রোজই আসিতেন। মা কথা বলিতেন না। তিনি আসিয়া মা'র উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন, এবং নটবর বাবুর সঙ্গে আলাপ করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, "এত কঠোর সাধনা করলাম, কৈ, কিছুইত গেল না!" নটবর বলিতেন, "আমি লোহা ছিলাম, পরশ মণির স্পর্শে সোনা হইয়াছি", তখন তুড়ীয়ানন্দ স্বামী চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিয়া হাতে

তুড়ি দিয়া বলিতেন, "ওঁর কথা ? ওঁর কথা ছেড়ে দাও। ওঁর এক বিন্দু কৃপায় কি না হতে পারে ? সব হতে পারে।" নটবর বাবু অন্য কোন দেব দেবী দেখিতেন না। স্বামিজী এক এক জায়গায় বেড়াইতে যাইয়া সব দেখাইয়া ছিলেন। দুই জনে যমুনার ধারে বসিয়া গান গাহিতেন। মা এক দিন তাহাকে পিঠা রাঁধিয়া ও অন্য দিন নটবর ভাত পাক করিয়া খাওয়াইয়া ছি[redacted]লেন। মা নটবর বাবুকে ও স্বামীজীকে গরদের ধুতি দেন, স্বামী[redacted] ঐ কাপড় দিয়া মাথায় পাগড়ী বান্ধিলেন।

উপেন্দ্র চন্দ্র ধর, বাড়ী সরাইল, ত্রিপুরা। ইনি বে[redacted]রস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়িতেন। যে বৎসর শ্রীশ্রীমা'র ম[redacted]দির আরম্ভ হয়, সেই বৎসর তিনি এক দিন লেখকের বাড়ী আ
তিনি লেখকের বাড়ীতেই জুতা খুলিলেন। লেখক জিজ্ঞাসা
"জুতা এইখানেই খুলিলেন কেন ?" তিনি বলিলেন, [redacted]মি তুড়ীয়ানন্দ স্বামীজীর নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে
গ্রামেই জুতা পায় দেওয়া উচিৎ হয় না।" লেখক বলিল,
শুনিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন যে, এক দিন কাশীতে [redacted]ৎ বাবুর বই সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, স্বামীজী বলিলেন, "
কথা পুস্তকে কি লিখিবে ? শরৎ কি জানে ? তাঁহাকে [redacted]ধু লিখিয়াছে, বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহাকে অব
বলিলেও ছোট করা হয়। তাঁহার জন্মভূমি দেওভোগের এ
ধূলি কণা, শত শত অবতার তৈয়ার করিতে পারে।" এ
শুনিয়া এবং তাহার ভক্তি দেখিয়া লেখকের খুব আনন্দ হই
তিনি ঠাকুর বাড়ী দেখিয়া পুনরায় চলিয়া গেলেন।

৺সুরেশ চন্দ্র দত্ত :—

লীলা সংবরণের পর কলিকাতা হইতে সুরেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় দুইবার মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে একটা কাগজের গাঁটরী ছিল। তিনি একাকীই আসিয়াছিলেন। মা বলেন সুরেশ বাবুর জীবন দুধে ধোয়া। তিনিও ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ লিখার জন্য মা'কে অনেক বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা কিছুই বলেন নাই।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—

লীলা সংবরণের এক দিন পর শরৎ বাবু চলিয়া যাওয়ার সময় সমাধির উপর তাহার গায়ের চাদর খানি টানাইয়া রাখিয়া যান। চাকুরি হবার পর যখন তিনি সেরপুর বদ্‌লী যান তখন মা'র সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যান। আর তিনি ঠাকুর বাড়ী আসেন নাই। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কিম্বা শ্রীশ্রীমা'র উপর আর সে ভাব নাই। তিনি তখন বেদ পড়েন, সোহহং বাদী। তিনি শ্রীশ্রীমা'কে বলিয়াছিলেন,"মেয়ে জন্মে মুক্ত হওয়া যায় না, মা তুমি এবার মুক্ত হইতে পারিলে না। পুনরায় তোমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" মা'র সঙ্গে তাঁহার দুইবার কলিকাতায় দেখা হয়। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ লিখার জন্য মা'কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মা কিছুই বলেন নাই বা তাহাকে লিখিতে অনুমতি দেন নাই। তিনি যে বহি লিখিয়াছেন, তাহা ছাপা হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা'কে শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন

"আমি বলিতেও কিছু চাই না, শুনিতেও কিছু চাই না; ঘরে ঘরে বান্দর নাচাইয়া দরকার নাই।"

শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার ঃ—

শ্রীশ্রীমা'র হবিষ্যের সময় এক দিন যখন কেহ বাড়ীতে ছিল না তখন হরপ্রসন্ন বাবুর কাছারিতে যাওয়ার সময় মা তাঁহার ভগিনীর নিকট বলিলেন, "হরপ্রসন্নকে বল চারিটা কমলা আ হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "ফল টলের দরকার নাই, না আপনিই জাউ খাইবে।" কিন্তু কাছাড়ী হইতে আসার চারিটা কমলা আনিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রাদ্ধের তিনি ঢাকা চলিয়া যান।

পাগল হইবার পর হইতেই হরপ্রসন্ন বাবুর আসা যা কমিয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সংবরণের পর অ কমিল। ক্রমে আসা একেবারেই কমিয়া গেল, তিনি রা মঠে যাইতে আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁহার খুব মান সম্ এদিকটা ভুলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি পূজা পার্ব্ব কিম্বা বৎসরে এক আধ বার আসিতেন, এখন একেবারই আসে না। এখন তিনি সকল খানে সপরিবারে যান, সকল খানে খান, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এক ঘর হইতে অন্য ঘরে খাবার নিয়ে খাইতেন না। তিনি নারায়ণগঞ্জ সপরিবারে আসিয়া থাকে কিন্তু ঠাকুর বাড়ী আসেন না। এদিকের কথা এখন তি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। কোন সময় যে এই ব্যক্তি ঐরূপ ছিলেন, তাহা মনে হয় না। লীলা সংবরণের পর

হরপ্রসন্ন বাবু মথুর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বারদী ব্রহ্মচারীর ওখানে যান। তখন মথুর বাবুকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুর বাড়ীও আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস :—

লীলাবসানের পর ১৫ দিন মধ্যে তিনি মা'র হাতের সোণার বালা তৈয়ারী করিয়া আনেন; শ্রীশ্রীমা তাহা হাতে দিয়া এবং [illegible]ল পার কাপড় পরিয়া শ্রাদ্ধের দিন রাত্রে ভাত-সরা দিতে যা[illegible]* শ্রাদ্ধের পরের পর দিন তিনি বাজারের ও গ্রামের ব্রা[illegible] এবং ইষ্ট-কুটুম্বদিগকে চিড়া ফলার করান; কারণ শ্রাদ্ধে মা[illegible] তাহার টাকাও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিজের পালের এ[illegible]টী দামড়ী বাছুর শ্রাদ্ধে দেন।

[illegible] শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ মিত্র ও বিনোদিনী মিত্র :—

[illegible]লীলাবসানের পর পার্ব্বতী বাবু তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া ক[illegible]ক দিন ঠাকুর বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাহার কলিকাতা [illegible]কুরী হইলে পর মা তাঁহাদের বাসায় কলিকাতায় গিয়া চ[illegible]র পাঁচ দিন ছিলেন। আদিত্য ঘোষ ও ভাগিনেয়ী [illegible]রেণ্য সঙ্গে ছিলেন। সেবার তাঁহারা আদর যত্ন খুব করেন। [illegible]র্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ স্নান উপলক্ষে তখন তথায় রাজকুমার [illegible]গের স্ত্রী ও রাজকুমার নাগ প্রভৃতি অনেক লোক

---

* হাতে সোণার বালা ও পারওয়ালা কাপড় পরার কথা শ্রীশ্রীমা'কে [illegible]জ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করি [illegible]াই পরি।"

ছিল। পার্ব্বতী বাবু মা'কে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মা কখনও কলিকাতা গেলে তাহার বাসায়ই উঠিবেন ভাবিয়া তিনি মা'র ব্যবহার জন্য নূতন তোষক বালিশ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন উঠাইয়া রাখিতেন। অন্য কেহ তাহা ব্যবহার করিত না। মা'র খাওয়া থাকার জন্য খোলা প্রাণে উৎসুকের সহিত সুব্যবস্থা ও যত্ন করিতেন। বিনোদিনীর তাহাতে কোনরূপ আনন্দ লক্ষিত হয় নাই। মা শ্রীক্ষেত্র যাবার সময় গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের বাসায় যাইয়া ডাল ভাত খাইয়া সেই দিনই হাওড়া যাইয়া গাড়ীতে পুরী কোন আদর যত্ন নাই; সঙ্গে বন্দরের শ্রীনাথ দত্ত, গদাই হরকামিনী দেবী, কৈলাস দাস ও ঠা'ন্‌দিদি। পরে শ্রীশ্রীমা ও গদাই ঘোষ তাহাদের বাসায় যাইয়া ৫।৭ দিন থাকেন, নিজের বাসায়ও দুই দিন থাকেন, ঘরের গোলমালের মীমাংসা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য, কিন্তু মীমাংসা হইল না। এ আদর যত্ন মন্দ করে নাই। তারপর শ্রীনাথ দত্তকে নিয়া মা যান; সঙ্গে আদিত্য ঘোষের কন্যা কালী, ঠা'নদিদি ও শ্রীন ছেলে। ঘরের মীমাংসা হইল; এবারও আদর যত্ন মন্দ নাই। এবার মা রাজকুমার নাগের বড় কন্যা বাসায়ও গিয়াছিলেন। তাহার স্বামী ৺সতীশচন্দ্র বসু, রাজানগর, বিক্রমপুর, তখন আলিপুরে ওকালতি করিতে তাহারা শ্রীশ্রীমা'কে যথেষ্ট আদর যত্ন করেন, এবং এক বে খাওয়ান।

১৩২৮ সনের ১০ চৈত্র ঠা'নদিদি পরলোক গমন করেন। ১৩২৯ সনের শ্রাবণ মাসে তাঁহার অস্থি গঙ্গায় দিতে মা কলিকাতা পার্ব্বতী মিত্রের বাসায় যান, সঙ্গে ছোট ভগিনী হরকামিনী দেবী ও জগবন্ধু দাস, এবার আদর যত্ন তত নহে। এইবার শরৎ বাবু ও তার স্ত্রীর সঙ্গে পার্ব্বতী মিত্রের বাসায় মা'র দেখা হয়। বধূ বড় অত্যাচার করে বলিয়া তাহাকে একটু শাস্ত করিয়া যাইবার জন্য শরৎ বাবু মা'কে অনুরোধ করেন, বধূ তখন সম্মুখেই ছিল। এই সময় বিনোদিনী মা'কে কথায় কথায় বলিয়াছিল, "আপনি মিথ্যা কথা বলেন।" কথাটা এই যে, মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুর বিবাহের পর প্রথম কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া এক দিন মাছ ধরার সঙ্গে ছিলেন; সে বলিতেছিল, 'যা মিথ্যা।' তাহার মিথ্যা কথার বিষয় শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, "তুই আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিস্ও নাই, আর পারিবিও না।" এই বারই তাহার ছেলের মুখে মা শুনিয়াছিলেন যে পার্ব্বতী মিত্র যে কাজ করে সে কাজ কোন হিন্দুতে করিত না; যত মৃত বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গরু, এবং হাটে যে সব আতুর, অবশ, গরু, ঘোড়া অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সব কিনিয়া আনিয়া কলে পিষিয়া সার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পার্ব্বতী বাবুর আজ্ঞায় নাকি সব কাজ হয়। সে সওয়ালেস কোম্পানীর বড় কর্ম্মচারী। পার্ব্বতী বাবুর প্রথম চাকুরী চট্টগ্রাম এ, বি, রেলে। তারপর কলিকাতা জাহাজ অফিসে কাজ করিতেন। এই কাজ ছাড়িয়া বর্ত্তমান চাকুরী গ্রহণ করেন।

লীলা সংবরণের পর বিনোদিনী যত দিন বাড়ী ছিল, তাহার স্বামী পার্ব্বতী মিত্রের সঙ্গে যায় নাই, তত দিন মাঝে মাঝে এক এক বার আসিত। বিদেশে গিয়াছে পরও যখন বাড়ী আসিত, তখনই এখানে আসিত। পার্ব্বতী বাবু কলিকাতা চাকুরীতে গেলে পর যখনই ছুটির পর নারায়ণগঞ্জ হইয়া কলিকাতা যাইতেন, মা খবর পাইয়া তাঁহাকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ষ্টেশনে ষ্টীমারে পাঠাইতেন। শেষবার ১৩২৮ সনের আশ্বিন মাসে দশহরার পর পার্ব্বতী মিত্র, বিনোদিনী ও তাহাদের বাড়ীর অন্যান্য সব আসিয়াছিল। তখন মা রুগ্না, মা'র সঙ্গে কেহ কোন বলিলেন না, এমন কি দেখাও করিলেন না, কেবল রাজ নাগের স্ত্রী যাবার সময় দেখা করিয়া গেলেন। মা'র সারদা এখানে ছিলেন, সারা দিন তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বা পাচক ঠাকুর পাক করিল, তাঁহারা খাইয়া চলিয়া গেলেন

১৩৩০ সনে বিনোদিনী মিত্রের বই ছাপা হওয়ার ঠা'নদিদির পিণ্ড দিতে গয়া যান। মা তাঁহার নিজ ঘ থাকেন। পার্ব্বতী মিত্র ও বিনোদিনী মা'কে তাহাদের নিতে অনেক অনুরোধ করেন, মা তথায় যান নাই।

পার্ব্বতী বাবুর তাহার স্ত্রী পুত্রদের প্ররোচনায় সম্পূর্ণ ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। * নারায়ণগঞ্জ আর তিনি ঠাকুর বাড়ী যান না। ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা

---

* দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দেখুন।

শ্রীমতি সৌদামিনী বসু ঃ—

যখন তাহার স্বামী সতীশ বাবু কলেজে পড়িতেন তখন সৌদামিনী সহ সে রাজানগরের সাধুর নিকট যাইতেন। সতীশ বাবু এক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া ঐ সাধুর প্রশংসা করেন। তিনি এজন্য তাহাকে হাদা বলিয়া মন্দ বলিয়াছিলেন। এই সাধু তাহার শিক্ষা প্রণালী অনুসারে সৌদামিনীকে মৌনী করে এবং তাহাকে যোগাযোগ* সাধন শিক্ষা দেয়। সতীশ বাবু উকীল হইয়া যখন সৌদামিনীকে সঙ্গে রাখিতেন না, তখন তিনি পিত্রালয় ছিলেন। সৌদামিনী একবার ৪ মাস, অন্য সময় ৩ মাস ঠাকুর বাড়ী আসিয়া থাকেন ; কারণ তাহার ভ্রাতৃ বধূগী তাহাকে মারিতে কাটিতে যাইত। এ সময় তিনি নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার পদ সেবা করিতে প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতেন, তিনি তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন, সৌদামিনীও তাহাতে মুগ্ধা ছিলেন। সৌদামিনী শ্রীশ্রীমা'কে খুব সেবা-যত্ন করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমা'র নিকট তাহার সমস্ত অপরাধ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এক দিন মা সৌদামিনীকে সঙ্গে নিয়া নটবর বাবুর বাড়ী বেড়াইতে যান। মা তথায় থাকিতেই তুফান আরম্ভ হয়। তখন শ্রীশ্রীমা, সৌদামিনী, নটবর বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পূর্বের চৌচালা ঘরে ছিলেন। ঘর জীর্ণ ছিল, তুফানে তাহা তাহাদের উপরই পড়িল। কেহই বেশী চোট পায় নাই।

* যোগাযোগ=যোগ+আযোগ (Practical side of Joga)

নটবর বাবু তাঁহার স্ত্রীকে নিয়াই অস্থির—কোন চোট পাইল কি না, ইহা দেখিতে। মা'কে একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, মা কোনরূপ আঘাত পাইয়াছেন কি না? এই ব্যবহার দেখিয়া সৌদামিনীও অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়:—

মা একবার অষ্টমী স্নানে লাঙ্গলবন্দে পাল গিয়াছিলেন। সঙ্গে যোগেন্দ্র ঘোষ, আদিত্য ঘো ও জগবন্ধু দাস ছিলেন। পরে তথায় নটবর বাবুর হেমেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়। মা একখানা ঘর করেন। স্নানের পর খাওয়া দাওয়ার সব জিনিষ কিনা ইতিমধ্যে যোগেন্দ্র তাঁহার মাতার বাসায়, হেমেন্দ্র ভ্রাতৃবধূর বাসায় খাইয়া আসেন। তাঁহারা বাসায় আ মা খাইতে সাধেন কিন্তু তাঁহারা খায়ও না, বলেও না যে, তাঁ খাইয়া আসিয়াছেন, আদিত্য ঘোষ ও জগবন্ধু দাস খাইলে। কিন্তু যোগেন্দ্র ও হেমেন্দ্র না খাওয়ায় মা খাইলেন খাওয়ার জিনিষ তথায় রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়া নটবর বাবুকে বলেন যে, যো ঘোষ মা'কে না খাওয়াইয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তি যোগেন্দ্র বাবুর উপর অত্যন্ত চটিয়া যান।

ঠা'নদিদি মা'র জন্য পাক করিয়া রাখিয়াছিলেন আসিয়া খাইলেন। খাওয়ার পর মা'র বমি হয়। তাহা

নটবর বাবু আরও ক্রুদ্ধ হন, যদিও মা'র এইরূপ বমি পূর্ব্বেও হইত। এজন্য পরে নটবর বাবু যোগেন্দ্র বাবুকে অনেক গালি-গালাজ করেন। মা তাহাতে প্রতিবাদ করিলেন। এই বিষয় নিয়া রাগারাগি লাফালাফি হইতে থাকে। মা ঠেলা লাগিয়া খাট হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন। যোগেন্দ্র বাবু বারান্দার চৌকির উপর ছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি মা'কে ধরিতে গেলেন। যেই যাওয়া, অমনি নটবর বাবু জুতা-পায়ে যোগেন্দ্র বাবুকে লাথির উপর লাথি দিতে লাগিলেন। লাথি খাইয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। আদিত্য ঘোষ, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রকুমার দাস ঘরে ঠা'নদিদির চৌকির উপরে ছিলেন। আদিত্য বাবু মা'কে ধরিতে গেলে নটবর বাবু তাঁহাকেও-লাথি মারিলেন, কিন্তু তাহা লাগে নাই। খাট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় মা'র হাটুতে ভয়ানক আঘাত লাগে একটী দাঁত লড়িয়া যায়, সে দিন মা অতি ক্রুদ্ধা হইয়া নটবর বলিয়াছিলেন, "তুই ছিলি মাথায়, গেলি অধঃপাতে।"

ইহার পরও তিনি সর্ব্বদা ঠাকুর বাড়ী আসিতেন, ভগবতাদি ও তুমুল কীর্ত্তন করিতেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমা'র পরের স্থান দিতেন এবং সেরূপ ভক্তি ও সম্মান করিতেন। মা তাঁহাকে ছাড়া কোন পূজা পার্ব্বণই করেন সে কোন পূজাদিতে না আসিলে, মা নিজে যাইয়া তাঁহাকে নিয়া আসিতেন। গত ছয় বৎসর যাবৎ তিনি ঠাকুর আসেন না, মা'কেও এখন সেরূপ ব্যস্ত দেখি না।

তাহার এখন সম্যক্ ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহার ছেলে প্রফুল্লও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমানের যখন চাকুরী যোগার হইয়াছিল না, তাহার মাতা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রীকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং পুত্রবধূকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন তাহার স্ত্রী লেখকের আশ্রয়ে কয়েক মাস অবস্থান করে ও সে ঠাকুর বাড়ীর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়। তাহাদের বাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর পশ্চিমদিকে, ঘর হইতে বাহির হইলেই শ্রীশ্রীমা'র মন্দির যায়। ঘুম হইতে উঠিয়া শ্রীমন্দির দেখিতে হইবে ভয়ে পুত্র ঐ বাড়ীর স্বত্ব পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। গত তিন ব যাবৎ তাহারা স্থানান্তরে থাকেন। ঠাকুর, তোমার লীলা!

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ :—

নটবর বাবুর স্ত্রী মনে করিতেন যে, তাঁহার স্বামীর উপ সব মা'কে দিয়া ফেলেন ইত্যাদি, এজন্য প্রায়ই মা'কে যথে গালাগালি করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায়ই নটবর বা চাকুরী থাকিত না, তখন মা'ই তাঁহার সংসার এক দিন এইরূপ গালি দিয়াছেন শুনিয়া যোগেন্দ্র বাবু অধীর হইয়া পকেট হইতে চাকু খুলিয়া তাহার নিজের বাম এক টানে অনেকখানি কাটিয়া ফেলেন—দেখিতে অতি ভয়ঙ্ক যোগেন্দ্র বাবুর অবস্থা তখন এরূপ যে, তিনি মা'র জন্য প্র দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। মা যে পথে বাড়ীতে

হাটিতেন ও ঘাটে যাইতেন তাহাতে কোনরূপ তৃণ কণাও থাকিলে যোগেন্দ্র বাবু তাহা হাতে বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। মা হাটিলেও যেন তিনি প্রাণে ব্যথা পাইতেন; একেবারে প্রাণ দেওয়া ভাব।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দত্ত ও মাধব চন্দ্র দে :—

সংবরণের পর এক দিন সূর্য্য কুমার চক্রবর্ত্তী চন্দ্র-[illegible]র বাবুকে তাহাদের অফিসে বসিয়া বলেন, নাগ মহাশয়ের বা[illegible] খুব গান হয়, তাহার জামাতা মহেন্দ্র আম্বলী প্রভৃতি অ[illegible] রাত্রি পর্য্যন্ত খুব গান গায়। ইহা শুনিয়া তিনি এক দি[illegible] গান শুনিতে ঠাকুর বাড়ী গেলেন এবং নটবর বাবুকে নেংটা [illegible] গাহিতে শুনেন, তাহাতে তার মন আকৃষ্ট হয়। নটবর বাবু তাঁ[illegible]ক মাঝে মাঝে আসিতে বলেন, তদবধি তিনি যাইতে থা[illegible]। মাধব বাবু রেলী ব্রাদার্সের পাটের অফিসে গোদনাইল [illegible] করিতেন। তিনি চাকুরীর কোন গোলমালে চন্দ্রকিশোর [illegible] খবর দেন, "আমাকে আসিয়া দেখ, আমি বিপন্ন।" তিনি [illegible] দিনই গোদনাইল যান। মাধব বাবু তাহাকে দেখিয়া [illegible]কটা আশ্বস্ত হন। তিনি চন্দ্রকিশোর বাবুর নিকট শুনিয়া [illegible]র বাড়ী আসিতে থাকেন। চাকুরীর গোলমাল ক্রমে সারিয়া [illegible]। তদবধি তিনি ব্রাহ্মণগাঁ হইতে প্রতি দিন আসিতে [illegible]কেন। মাধব বাবু ও চন্দ্রকিশোর বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেও [illegible]সিতেন।

চন্দ্রকিশোর বাবু বলেন তিনি যে দিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে [illegible]খিতে আসিতেন সেই দিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত যেন কেমন

একটা ভাব থাকিত, মন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে ঝুকিয়া পড়িত, কিন্তু ক্রমে সে ভাব ছুটিয়া যাইত। প্রথম হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা তাঁহার বোধ ছিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতেন, এই ভাবিয়া যে, যাহা মনে বলা যায়, তাহা তিনি জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস :—

ইনি চন্দ্রকিশোর বাবুর নিকট শুনিয়া ঠাকুর বাড়ী আ আরম্ভ করেন। তিনি গত ১৩ বৎসর যাবত বাড়ী ঘর ছ শ্রীশ্রীমা'র কাজে দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর ভিন্ন কিছু জানেন না। তিনি সময় সময় ভগ ৎ ভোগ পাইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বিয়োগের পর গত তিন ব যাবৎ ছেলে মেয়ের যত্নের জন্য একটী সেবিকা রাখিয়া এখন তাঁহার নিজের গৃহস্থির দিকেও মন দিয়াছেন দুর্দ্দিনেও নিতান্ত ঠেকা ছাড়া রাত্রিতে বাড়ী ছাড়া অ তিনি থাকেন না।

শ্রীযুক্ত জ্ঞান চন্দ্র গাঙ্গুলী :—

ইনি পারজোয়ার পরগণার কোণ্ডা নিবাসী গাঙ্গুলীর পুত্র। তিনি কলিকাতা কণ্ট্রাক্টারী করিতেন। লী সংবরণের অনেক দিন পরে তাহার পিতা মাধব বাবুদের বা নিমন্ত্রণ খাইতে যান, মাধব বাবু ঠাকুর বাড়ী আসা যাও করেন, এই জন্য তিনি অতি উৎসুকতার সহিত বলিয়াছি যে, রথ যাত্রার সময় তাঁহার ছেলে পুরীতে গিয়াছিল, রাস্তা

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "অল্প দিন হইল।" জ্ঞান পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় থাকেন?" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "বৃন্দাবনে।" এই বলিয়া দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেলেন। দুই চারি পা যাইতে না যাইতেই তাহার মনে হইল যে শ্রীশ্রীঠাকুর ত লীলা সংবরণ করিয়াছেন! অমনি খোঁজা খুঁজি। আর কোথায় কে? তিনি পূর্ব্বেও ঠাকুর ... আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ ছিল।

৺সারদা দেবী :—

ইনি ঠাকুরের ভগিনী। লীলা সংবরণের পর তিনি অনেক বার এখানে আসিয়াছেন। এখন মা'র উপর আর ...াব নাই। এখন মা'র জন্য তিনি জীবন দিতেও প্রস্তুত। ... বার মা'র অসুখের সময় যখন তিনি এখানে ছিলেন, তখন ...র খাওয়া দাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইতেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁহাকে ...তি আদর করিতেন এবং অতি যত্নে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ...ওয়াইতেন। তিনি এক পুত্র, উপেন্দ্র এবং দুই কন্যা, সরলা ... লাবণ্যকে বর্ত্তমান রাখিয়া ১৩২৮ সনে পরলোক গমন ...। লাবণ্য দেবী মাঝে মাঝে পূজা পার্ব্বণে এখানে ...সেন ও থাকেন; সরলা দেবী ও উপেন্দ্র ঘোষ কদাচিৎ ... চারি বৎসরে এক আধ দিন আসিয়াই অমনি চলিয়া ...ইতেন। সরলা দেবী ১৩৩৬ সনে পরলোক গমন করেন।

হরপ্রসন্ন বাবু নটবর বাবু প্রভৃতির ব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেন "জগা মাধা একটা কান্ধার বাড়ি দিয়াছিল, ইহারা শত শত কান্ধার বাড়ি দিয়াছে, তবুও আবার আদর করিয়াছি।"

বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা।

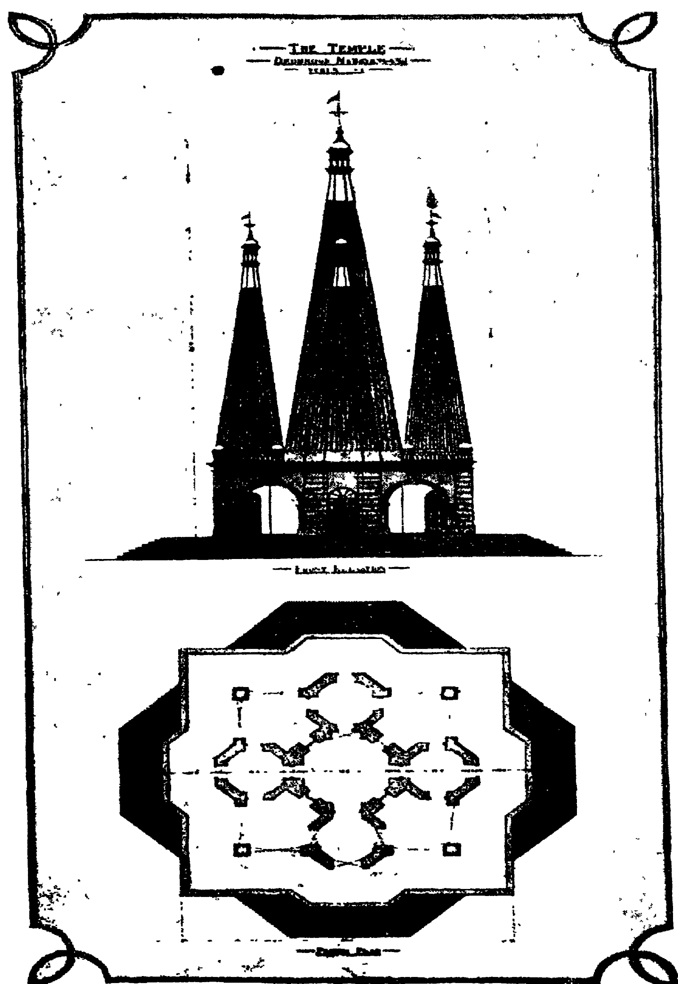
বাড়ীর দক্ষিণে যে ছোট গর্ত্ত ছিল, সেই জায়গায় একটী ছোট পুকুর কাটা হয়। কিছুকাল পরে পশ্চিমের ভিটির পর পাকের জন্য এক খানা দোচালা টিনের ঘর তোলা হয়। ই সময় সাবেক মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান টিনের চৌচালা ঘর লা হয়। পাকের ঘর ও মণ্ডপ তোলার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের কা র পূর্ব্বের ভিটার ছনের দোচালা ঘর ভাঙ্গিয়া ছনের চৌচালা, সা নে বারান্দা সহ তোলা হয়। চারি পাঁচ বৎসর পর উহা ভা য়া টীনের চৌচালা সম্মুখে বারান্দা সহ তোলা হয়। তার অনে ন পরে তিন দিকে লোহা কাঠের খুটী দিয়া মূলি বাঁ র কেচার বারান্দা দেওয়া হয় ও ঐ ঘর আট চালায় পরিণত হ । ঐ তিন দিকে খোলা বারান্দা থাকে। কিছু দিন পর দক্ষি ভিটীতে টিনের দোচালা ঘর সম্মুখে বারান্দা সহ তোলা হয়।

১৩২৪ সনে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিন শ্রীশ্রীঠাকু সমাধির উপর মন্দির নির্ম্মাণ মানসে স্তম্ভ রোপন করা হ ঢাক বাদ্য সহ পুরোহিত বাস্তু পূজা উক্ত নেওর ভিতরে ক তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো নিয়া পূজা করা হয়। বাজিয়া উঠিল, মা উচ্ছ্বসিতা হইলেন। শুভক্ষণে শ্রীমন্দি অগ্নিকোণের দেওয়ালের নীচে শ্রীশ্রীমা ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপ

করিলেন। নেও চওড়া ১০´ ফুট গভীরও ১০´ ফুট ছিল। তারপর ঐ নেও ঘুরিয়া নেওর ভিতর খুব কীর্ত্তন হইতে লাগিল, যেন মাটী ভেদ করিয়া কীর্ত্তন উঠিতে লাগিল। মহা সমারোহে বহু লোক ভোজন করান হইল। মন্দিরের কাজ ভূমি সমতল হইয়া বন্ধ থাকে। মন্দিরের কাজ আরম্ভ করার সময় সমাধির উপরের সাবেক চৌচালা পশ্চিমের ঘরের লাগ দক্ষি উঠান হইল। কিছু দিন পরে উহা ভাঙ্গিয়া টিনের চৌখুঁলা সম্মুখে বারান্দা সহ তোলা হয়। ঐ ছনের চৌচালা মায়াহিহার ভগিনীকে দেন।

স.১৩২৯ সনের ১৫ই অগ্রহায়ণ পূর্ব্বের ভিটীর ঘর ভাঙ্গিয়া সেনিনে শ্রীশ্রীমা'র মন্দিরের ভিত্তি স্তম্ভ রোপণ করা হয় ও কা বাআরম্ভ হয়। জয় ঢাক বাজে, লোক জন খাওয়ান হয়। চোব ৭ঠ পর্য্যন্ত উঠিয়া কাজ বন্ধ থাকে। কাচার পূর্ব্ব পারে কবারকান্ত গাঙ্গুলীর বাড়ী। শ্রীশ্রীমা সেই বাড়ী খরিদ কখরিয়াছিলেন, সেখানে ঐ আট চালা ঘর উঠাইবার জন্য ঐ দি তই খুঁটি গাড়া হয় এবং ভিটী সহ সম্পূর্ণ ঘর উঠান হয়। পূ্য়া ভিটীতে যখন ঐ টিনের ঘর উঠান হয়, তখন কৈলাস দাস মহাশয় কিছু টাকা দিয়াছিলেন, সেজন্য মা কয়েক দিন পরে ঐ সম্পূর্ণ আটচালা ঘরও তাঁহার ভগিনীকে দান করেন। ঐ পূর্ব্ব ভিটীর ঘর ভাঙ্গাতে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণের ই টীর পশ্চিমের টিনের চৌচালা ঘরে থাকিতেন।

াই



শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দির, দেওভোগ



শ্রীশ্রীমা'র মন্দির, দেওভোগ।

১৩৩৪ সনে হরিচরণ কুরি ঠাকুর বাড়ীর উত্তরে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া, মাঁটী ভরট করিয়া ও কাটা তারের বেরা দিয়া ঠাকুর বাড়ী যাতায়াতের দুটী রাস্তাই বন্ধ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের কাজ পুনরায় ১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হইয়া ভিটীর চারি ফুট পর্য্যন্ত হইয়া কাজ বন্ধ আছে। চারিদিকের খোলা রোয়াক ছাড়া মন্দিরের আয়তন ৫৬´-৯´´ × ৫৬´-৯´´। তাহার ফটো দেওয়া গেল। ে দিন সমাধির উপরের ঘর ভাঙ্গা হয়, সেই দিনই শ্রীশ্রীঠা রের ফটো মণ্ডপে আনা হয়। এই বৎসর মণ্ডপ পিছনে সর য়া

ীমার মন্দিরের সমসূত্রে উঠান হয় এবং পাকা রা হয়

শ্রীশ্রীমা'র মন্দির পুনরায় ১৩৩৫ সনে শ্রাবণ মাসে অ হইয়া ফাল্গুন মাসে শেষ হয় এবং ৯ই ফাল্গুন শুক্লা ত্র তিথিতে শ্রীশ্রীমা মন্দিরে পদার্পণ করেন। ইহারও দেওয়া গেল। যে চৌচালা টিনের ঘরে মা থাকিতেন ত া তিনি তাঁহার ভগিনীর দৌহিত্রকে দান করেন। এই বৎ মাঘ মাসে মাটী ভরট করিয়া পিছনে সরাইয়া পাকের ঘর উঠ া হয় এবং পাকা ভিটী করা হয়। তাহার দক্ষিণে ভোগের মাছ প করার জন্য একখানা ছোট টিনের ঘর মাটী ভরট করিয়া উঠ ন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দির উঠাইবার সময় পূর্ব্বের কাচা া হয়। ঐ মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের গুম্বজের পূর্ব্ব দেওয়াল কাচ া পড়িয়াছে, এখানে নেও ১৪´ ফুট এবং শ্রীশ্রীমা'র মন্দিরের পূ দিকের পার্টিকোর পূর্ব্ব দেওয়াল কাচার কিনারায় পড়িয়া

এবং বারান্দার দেওয়াল কাচায় পড়িয়াছে। এখানেও নেও ১৪´ ফুট। বাড়ীতে পশ্চিমের পুকুর হইতে এক বারা মাটী তোলা হইয়াছিল, পুনরায় দক্ষিণের পুকুর কাটিয়া বাড়ীতে মাটী তোলা হয়। এখন আর বর্ষায় জল উঠে না। দক্ষিণের ঘরের পশ্চিমে গরুর ঘর। যে স্থানে শ্রীশ্রীগঙ্গা উঠিয়াছিলেন, সেই জায়গায় একটী স্তম্ভ তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীমা'র মন্দি .র দক্ষিণ দিকে পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

১৩৩৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর দক্ষিণের পুকুরের দক্ষিণস্থ বে া ভূমির পূর্ব্বাংশ হইতে মাটী খনন করিয়া শ্রীশ্রীমা'র ম ্রের চারিদিক সমতল করা হয়, এবং শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের ভি ঁ ভরট করা হয়। ১৩৩৬ সনে পশ্চিম দিকের পুকুর খনন কা া তাহার দক্ষিণ পার মাঠের সমসূত্রে বান্ধান হয়। সম বাড়ী উচ্চ করিয়া সমতল করা হয়। এই পুকুরের উত্তর পূর্ব কোণে ঘাট্‌লা বান্ধান হয়। এবং ১৩৩৭ সনে ঐ কোলা ভূ , সম্পূর্ণ খনন করিয়া দক্ষিণস্থ পুকুর ভরট করিয়া ফুল বাগিচা ক া হয়, এবং ঐ পুকুরের পশ্চিমাংশে ঘাট্‌লা বান্ধান হয়। ঐ সময়ে বাড়ীর উঠানও বান্ধান হয়। একটী টিনের তিন ত া নহবতখানা পাকা ভিটিসহ ফুল বাগিচার উত্তর পূর্ব্ব ে ণে উঠান হয়। ১৩৩৯ সনের ১লা বৈশাখ ঐ নহবতখানা স ইদ করা হয়। ইহারও ফটো দেওয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসানের পর বহু উল্লেখ যোগ্য ঘটনা টিয়াছে তাহা এই পুস্তকে অঙ্গীভূত করা হইল না।



নহবতখানা

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজার বিধি।

আচমন করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান।

ধ্যায়েন্নিত্যং চিন্ময়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ শ্রীদুর্গাচরণম্।
তরুণ ভানু পদকমলং বামপদ যুগ্ম কণিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠম্,
তপ্ত কাঞ্চনাভং সুঠাম সুগঠন সুমধুর গন্ধ কায়ম্।
ঢুলু ঢুলু প্রেমবিগলিত ভঙ্গি বাঁকা নয়নাপাঙ্গম্,
দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিতং নাসা তিল ফুলকং।
ত্রিশূলাঙ্কিত বিশাল ললাটং বক্ষ পদ্ম চিহ্নং আরক্তিম হস্তং
গুম্ফ মণ্ডিতৌষ্ঠং, মৃদু হাস্য মুখম্ বীণানিন্দিতকণ্ঠম্ বচন মধুরং
অকিঞ্চনবেশং ভাগলপুরি বস্ত্রাচ্ছাদনং
নাতি পরিচ্ছন্ন বসনং লম্বকুচা সমন্বিতং।
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ং রসিক নাগরম্ সানন্দ পুরুষং
মহা যোগেশ্বরং যোগমায়া অধীশ্বরং লীলাহেতু প্রকৃতিপুরুষম্,।
নির্ব্বিকল্পং নির্ব্বিকারং দেবাদিদেবং রাজরাজেশ্বরম্
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ ॥

জলশুদ্ধি মন্ত্র।

গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

কোসের জলে তুলসী তিল সহ তিন বার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

স্নান মন্ত্র।

ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

এই মন্ত্রে তিন বার জল দ্বারা স্নান করাইবে। অর্থাৎ উক্ত জল ছিপ দ্বারা কোসা হইতে টাটে দিবে।

পূজা মন্ত্র।

ইদম্ আসনং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ভগবন্ শ্রীদুর্গাচরণ ইহ সুস্বাগতম্।
এতৎ পাদ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎ অর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ইদম্ স্নানীয়জলং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎ বসনং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎ আভরণং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এষ গন্ধঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎসচন্দনতিলতুলসীপত্রং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এষ গন্ধপুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এষ দীপঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

অন্ন ব্যঞ্জন ও ফল মিষ্টাদি নিবেদন মন্ত্র।

ইদম্ অন্নব্যঞ্জনং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ,
ইদম্ ফলং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।
ইদম্ মিষ্টং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ,
ইদম্ পানীয়জলং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

অঞ্জলি মন্ত্র।

এষ গন্ধপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

নমস্কার ও জপ মন্ত্র।

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীদুর্গাচরণায় নমঃ।

বালকদের প্রতি উপদেশ

মহাত্মাদিগের কএকটী কথা
অবলম্বন করিয়া অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইল।

শ্রীদুর্গাচরণ নাগ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও তৎকর্ত্তৃক কুমারটুলি বনমালী সরকারের
লেন, ১০ নং বাটী হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ক লি কা তা।

৭, চৈতন সেনের লেন,
কে, ডি, মুখার্জ্জী প্রেস।



সন ১২৯২ সাল।

বালকদিগের প্রতি উপদেশ।

-*-

প্রথম উপদেশ।

পিতামাতার আদেশ পালন এবং আহার-ব্যবহার।

বৎস! তুমি বালক, এখনও কোন কাজে সক্ষম হও নাই, অতএব তুমি তোমার নিজের বুদ্ধিতে চলিও না। তোমার পিতা মাতা ও গুরুজনের উপদেশ সকল গ্রহণ কর, কারণ করুণাময় ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যাঁহারা শিশুকাল হইতে কত প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যথা সাধ্য প্রাণ পণে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কখনও তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া মতের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। এখন হইতে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে পারিলে, তোমার মুখের জ্যোতি অতি সুন্দর দেখাইবে। বৎস! যদিচ তুমি দরিদ্র, বাহ্যিক ব্যবহারার্থ অলঙ্কার অথবা অঙ্গাচ্ছাদন জন্য ভাল পরিচ্ছদাদি নাই তাহার জন্য মনে কোন রকম ক্ষোভ করিও না, এবং তোমার সম বয়স্ক কোন বালকের বহু মূল্য অঙ্গাভরণ দেখিলে তাহার জন্য তোমার পিতা মাতার নিকট প্রার্থনাও করিও না; কারণ তোমার পিতার অর্থ সঙ্গতি তদ্রূপ না থাকিলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন না, এবং ইহাতে তাঁহাদের মনে অনেক কষ্ট হইতে পারে, আর তোমারও পাইবার আশা থাকিবে না। যাহারা

ধনী তাহারাই ধনের বাহুল্য প্রযুক্ত আপনাদের সন্তান-সন্ততিদিগের ভোগার্থ নানাবিধ অলঙ্কার ও বেশ ভূষা দ্বারা সজ্জীভূত করে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের নিজের ধনের মাত্র গৌরব প্রকাশ পায়, নতুবা শরীর সম্বন্ধে অথবা জ্ঞান লাভের কোন ফলাশ্রুতি হয় না, বরং ইহাতে অনেকে আরও তাহাদিগকে অহংকারী মনে করিয়া নিন্দা বিদ্বেষ করিতে পারে, এবং দুশ্চরিত্র লোকেরা নির্জ্জনে পাইলে পরে, অপহরণ করিয়া প্রাণহানিও করিতে পারে, অতএব তুমি এরূপ বাহ্যিক অলঙ্কারের জন্য লুলুপীত না হইয়া তোমার পিতার জ্ঞান গর্ভ উপদেশ পূর্ণ বাক্য স্বরূপ যে অলঙ্কার তাহাই গ্রহণ কর, ইহাই চিরস্থায়ী বহু মুল্য মণি স্বরূপ হইয়া তোমার শিরোভূষণ হইবে, এবং মাতার আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন কর, তাহাই তোমার গলদেশে উজ্জ্বল হারের ন্যায় শোভা পাইবে। বৎস! যদি তুমি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন সময় একটী অহিত কার্য্য কর, তৎজন্য তোমার পিতা মাতা শাসন করিলে সেই শাসন-জনিত যন্ত্রণার দিকে মন না দিয়া সুবিবেচনাতে জ্ঞান উপদেশের কথা সকল অবধারণ করিয়া হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখ, তাঁহাদের এরূপ ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে মঙ্গল জনক, এবং জীবনের পথ স্বরূপ, ইহাতে জ্ঞান লাভ হইলে তোমার চিত্ত আহ্লাদিত হইবে এবং তাঁহারাও তোমার এরূপ প্রফুল্ল চিত্ত দর্শন করিয়া সর্ব্বদা তোমাকে নানা বিষয় শিক্ষা উপদেশ দিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিবেন।

বৎস! সেইরূপ আহার-ব্যবহার সম্বন্ধেও তোমাদের অবস্থানুসারে যখন যেমন সংস্থান থাকে তদনুসারে তোমার জননী অথবা যিনি তোমাকে খাইতে দেন, তাঁহার নিয়মানুসারে তোমার জন্য যখন যাহা প্রস্তুত থাকে, তাহাই অতি সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিও, তদ্ব্যতীত তোমার নিজের ইচ্ছায় লোভী হইয়া ভাল কোন সুস্বাদু বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না, এবং কখন কোন কারণবশতঃ যদি তোমার আহারীয় সামগ্রীগুলি ভালরূপ প্রস্তুত না হয়, অথবা কিছু অসম্পূর্ণ থাকে তাহার জন্য ঝগড়া বিরোধও করিও না, কারণ তোমাদের তাহা অভাব থাকিলে তুমি পাইবে না, এবং তোমার জননী অথবা যিনি তোমাকে খাইতে দেন তিনিও তাহাতে অসুখী হইবেন, অতএব বিবাদ যুক্ত পরিপূর্ণ আহার অপেক্ষা শান্তি যুক্ত অতি অল্প আহারই শ্রেষ্ঠ। যাহারা পেটুক তাহারাই লোভাকৃষ্ট হইয়া খাওয়া পরার বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া কলহ করে, ইহাতে তাহাদের পরম হিতৈষী পিতা মাতা এবং আত্মীয় পরিজন, সকলেই তাহাদের উপর বিরক্ত থাকেন, এবং নিজেরা অপরিমিত আহার ব্যবহার করিয়া অচিরে রোগ গ্রস্থ হইয়া অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতেই আজীবন নানা প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কাল কবলে পতিত হয়, অতএব তোমার জন্য যখন যাহা প্রস্তুত থাকে, তাহাই তুমি পরিমিতরূপে আহার কর, ইহাতে সর্ব্বদা সুস্থ থাকিয়া সন্তোষ পাইবে, এবং তোমার পিতা মাতা তোমাকে সুস্থ ও শান্ত প্রকৃতি দেখিলে সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিয়া সুখে বাস করিতে পারিবেন ॥

———

দ্বিতীয় উপদেশ।

অলসতা ও কর্ম্মক্ষম লোকদের বিষয়।

বৎস! অলসতা ত্যাগ কর, বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর তাঁহার এই সংসারকে কল্প বৃক্ষ করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, ধন ইত্যাদি নানাপ্রকার তাহার ফল স্বরূপ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আজ্ঞানুসারে আলস্য ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম সহকারে চেষ্টানুসন্ধান না করিলে কেহই কিছু পায় না, অতএব মানব জাতি তাহাদের আপন আপন পরিশ্রমানুরূপ কর্ম্মানুসারে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, আমরা এ সংসারে যে সকল ধার্ম্মিক, বিদ্বান, ধনী ইত্যাদি মহাত্মাদিগের যশঃপূর্ণ কীর্ত্তি দর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও মোহিত হইতেছি তাহারা সকলেই শিশু কাল হইতে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অতি যত্নের সহিত সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ত্তার নিয়মানুসারে পরিশ্রম করিয়াছেন, ইহাতে কেহই ক্রুটী করেন নাই, অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেও বঞ্চিত করেন নাই। বৎস! যদি তুমি সেই দয়াময় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অলস হইয়া কেবল নিদ্রা অথবা খেলা করিয়া সময় অতিবাহিত কর, তাহা হইলে তাঁহার দয়ার প্রতি কোনই আশা ভরসা থাকিবে না। এবং শীঘ্রই ঘোর বিপন্নাবস্থায় দরিদ্রতা আসিয়া দস্যুর ন্যায় আক্রমণ করিবে, সুতরাং তোমার আর ক্লেশ যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা থাকিবে না, যাহারা অলস তাহাদের এ সংসারে কিছুই সম্পন্ন হয় না, কারণ তাহাদের

গন্তব্যের পথ কণ্টকের বেড়া স্বরূপ কোন ক্রমেই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না, মনে করে এ পথ অতি দুর্গম, ইহাতে গমনোদ্যোগী হইলে শীঘ্রই ঘোর বিপদে পতিত হইয়া বিফলে প্রাণ বিনষ্ট হইবে, একারণ তাহারা এ সংসারে সকল বিষয়েই নিরস্ত থাকিয়া কোন কাজেই সক্ষম হয় না, কেবল ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পানাহার না করিলে জীবন রক্ষা পায় না, অতএব আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের গলগ্রহ হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় সময় অতিবাহিত করিতে থাকে, আলস্য প্রযুক্ত কিছুতেই তাহাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা দূর হয় না এবং সর্ব্বদা অভিলষণীয় বিষয়ের অভাবে নানাপ্রকার দুঃখের চিন্তায় রত থাকে। কপাট যেমন কব্জার মধ্যে থাকিয়া ঘোরে, তাহারাও তদ্রূপ আপন বাসস্থানে নিদ্রাবশে মগ্ন থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় নানা প্রকার বাসনা করে, কিন্তু অলসের বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, কেবল মনের ব্যথায় নত হইয়া আপনাকে মৃত্যুসাৎ করে, অতএব সকল অবস্থায়ই জীবনের পরম শত্রু আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কাজে রত হও, অর্থাৎ আপন পিতা মাতা এবং শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা, বিদ্যাভ্যাস, নানা প্রকার শিক্ষানুষ্ঠানে যত্নশীল হও, ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তোমার জীবন অতি শুভকর হইবে, জগদীশ্বরের দয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সদা সুখে কাল হরণ করিবে। বৎস! যদি তোমাকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়, এমত কেহ না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিয়মে এ সংসারে

অনেক শিক্ষাস্থল আছে। দেখ, পিপীলিকাদের কেহ শিক্ষক নাই, কেহ প্রভু নাই অথবা শ্রম না করিলে শাসন করে এমত কেহ কর্ত্তাও নাই, তথাপি তাহারা আপনাদের শিক্ষানুসারে ক্ষণ মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া সর্ব্বদাই কেমন পরিশ্রমের সহিত শস্য কাটিয়া আহারীয় দ্রব্য সঞ্চয় করে, অতএব যাহারা স্বভাবতঃ কর্ম্মঠ তাহাদের আলস্য নাই, কোন বিষয় কাহারও নিকট অনুসরণও করে না, সর্ব্বদাই নিজের হাতে কর্ত্তৃত্ব পায়, অধিক পরিশ্রম করিলে ক্লান্ত হয় না, হৃদয় অত্যন্ত বলবান, সাহসে পরিপূর্ণ; কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদাই রত থাকে কখনও তাহাতে বিমুখ হয় না, ইহাতে তাহাদের গমনের পথ অতি দুর্গম হইলেও অতি সহজে রাজপথের ন্যায় চলিয়া যায়, কিছুতেই গতি রোধ করিতে হয় না, অতএব তাহাদের জীবনের পথ ক্রমেই নিম্ন হইতে অপসরণ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, ইহাতে নিত্য নূতন অভিলষণীয় বিষয় ফল ভোগ করিয়া আনন্দে কাল হরণ করিতে থাকে।

বিদ্যাভ্যাস ও মূর্খতা।

বৎস! বিদ্যা অমূল্য ধন, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা ইত্যাদি বাণিজ্য লভ্য বহু মূল্য সামগ্রী অপেক্ষা ইহার বাণিজ্য অতি শ্রেষ্ঠ, কারণ সকল প্রকার ধনই ইহা দ্বারা সংস্থাপন হয় তোমার

অভীষ্ট এমন কোন বস্তু নাই যাহার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে এমন মহা মূল্য ধনের বাণিজ্যার্থে উদ্যোগী হও, এ বাণিজ্যে কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হয় না, করুণাময় ঈশ্বর দয়া করিয়া এ অমূল্য রত্ন লাভ করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত করিয়া দিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিয়মানুসারে শিশুকাল হইতে পিতামাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া পরিশ্রম সহকারে চেষ্টানুসন্ধান করিলেই এই অমূল্য ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। আর এ বাণিজ্যে কাহার কোন লোকসানও হয় না, ইহার পথ অতি মনোরঞ্জন, যিনি যে পরিমাণে গমনশীল হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে অতি সন্তোষের সহিত এ মহা রত্ন লাভ করিতে পারিবেন, এ ধন কেহ অপহরণ করিতে পারে না, দান করিলেও ক্ষয় হয় না বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় অনন্ত কাল স্থায়ী কোন প্রকারে নষ্টও হয় না, অতএব তুমি তোমার পরম হিতৈষী পিতামাতার এবং শিক্ষকের মুখের উপদেশ বাক্য গ্রহণে বিমুখ না হইয়া তাহা অতি সাবধানপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করতঃ এই মহা মূল্য ধন উপার্জ্জনে প্রাণ পণে যত্নশীল হও, ইহাতে কখন অমনোযোগী হইও না, কারণ তাঁহাদের উপদেশ স্বরূপ পথ অবলম্বন করিয়া তোমার এই অমূল্য ধন লাভ হইলে জীবন সফল হইবে ; ইহার জ্যোতির শোভা সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত হইলে তুমি সকলেরই অতি মনোরম্য হইবে এবং অপূর্ব্ব শান্তি সুখ অনুভব করতঃ নিষ্কণ্টকে কালহরণ করিবে কখন কোন প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা

জানিতে পারিবে না, যখন তুমি একা থাকিবে, তখন বিদ্যা তোমার পরম হিতৈষী বন্ধু হইয়া নানা প্রকার সদালাপ করিবে এবং গমন কালীন তোমার সঙ্গের সাথী হইয়া অতি সাবধানে সরল পথে লইয়া যাইবে, নিদ্রার সময় রক্ষক হইয়া শিয়রে বসিয়া প্রহরী থাকিবে, এ প্রকারে তোমার অভিপ্রায় সম্পন্ন করতঃ সর্ব্বদা তোমার সহায় থাকিয়া শান্তি দান করিবে, অতএব জগদীশ্বরের দয়ায় এমন কল্প রত্ন ধন গ্রহণে কখনও বঞ্চিত হইও না। যাঁহারা এই মহা মূল্য ধন লাভ করেন তাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহাদের দ্বারা এ সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন হয় সর্ব্বদাই মঙ্গলময় ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া জ্ঞান লাভের উৎকৃষ্টতা ব্যক্ত করেন, এবং পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের ক্লেশ যন্ত্রণা দূরকরণার্থ নানা প্রকার হিতানুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হয়েন ইহাই তাহাদের জীবনের কার্য্য অতএব তাঁহারাই ধন্য। যাঁহারা এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া নিজে সুখী হইয়া অন্যের সুখ-সন্তোষের জন্য লালায়িত হয়েন তাঁহারা ইহ জগতে কাহার না ভক্তি ভাজন হইবেন কিন্তু যাহারা মূর্খ তাহারা ইহাতে বঞ্চিত থাকিয়া আরও বিশেষ অমঙ্গলের পথ করেন।

বৎস! যাহারা শিশু কাল হইতে পরম হিতৈষী পিতামাতার অবাধ্য হইয়া বিদ্যাভ্যাস অবহেলা করে তাহারাই মূর্খ হয়, মূর্খের জীবন বিফল, কারণ তাহাদের হিতাহিত ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বরের দয়ার কার্য্য কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাদের অন্তঃকরণ অব্যবস্থিত, পরিণামের ফলাফল

কোন বিষয় বুঝিতে পারে না, কেবল নানা প্রকার অহিত বিষয় উন্নতি মনে করিয়া নিজের অবস্থানুসারে অশেষ দোষ অনুশীলন করিতে থাকে ইহাতে সকলের পক্ষেই বিশেষ অসুখের কারণ হয় কেহ তাহাদের দ্বারা সুখী হয় না, মূর্খ পুত্র পিতার মনস্তাপ জন্মায়। স্নেহময়ী জননী নানা প্রকার উপদ্রপ ভোগ করিয়া সর্ব্বদা শোকে ম্রিয়মান থাকেন, পরমাত্মীয় ভাই বন্ধু সকলেই তাহাদের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করে প্রতিবাসিরা নানা প্রকার কটুক্তিতে ঝগড়া কলহে বিরক্ত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা দিতেও কেহ ক্ষান্ত হয় না এবং সর্ব্বদাই তাহাদের বিনাশ-কামনায় রত হয় কারণ মূর্খ-দুর্ব্বৃত্ত লোকদের মরণই মঙ্গল, অতএব সকলের নিকটই ঘৃণার পাত্র হইয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়। বৎস! তুমি কখন মুর্খের সহবাসেও থাকিও না, কারণ তাহাদের মূর্খতাই সর্ব্বনাশের পথ, যেখানে যায় কেবল ঝগড়া কলহ করে, বিবাদ তাহারা সঙ্গে লইয়া যায় অতএব মুর্খের বন্ধু হইলেও বিপদ ঘটায়।

মিথ্যাকথা ও ন্যায় অনুষ্ঠান।

বৎস! তুমি সর্ব্বদাই ন্যায় অনুষ্ঠানের চেষ্টা কর কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা বলিও না কারণ "মিথ্যা কথা বড় দোষ" যদি কখনও তোমার পিতা মাতা অথবা অন্য কাহারও

নিকট কোন একটী অপরাধ করিয়া মনে কর তাহা অস্বীকার করিলে সেই অপরাধ জনিত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে তাহা কখনও নহে বরং এরূপ ব্যবহার করিলে তোমার মিথ্যা কথা কহা হইল ইহাতে তাঁহারা আরও রাগ করিবেন এবং তুমিও অধিক দণ্ডনীয় হইবে। আর যাহার নিকট অপরাধ করিয়া থাক তিনি যদি ততদূর অনুসন্ধান করিয়া শাসন না করেন, তাহা হইলে একবার শাস্তি হইতে মুক্তি পাইলে বটে কিন্তু তোমার পক্ষে আরও বিশেষ অমঙ্গলের কারণ হইল, কারণ মিথ্যাবাদীর জিহ্বা প্রাণ সংহারক যাহারা এরূপ দুই একবার মিথ্যা কথা ব্যবহারে অদণ্ডনীয় থাকে, তাহারা ক্রমেই পাপের প্রশ্রয় পাইয়া অধিক উৎসাহান্বিত হইয়া একেবারে সত্যের পথ হারা হয়, এবং সর্ব্বদাই ছল, মিথ্যা কথা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাভিচারের পথ অনুসন্ধান করিয়া এমত কুপথে পতিত হয় যে, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে ও দেখিতে পারে না এবং তাহাদের কোন একটী কথাও শুনিতে ইচ্ছা করে না, যদি কখনও একটী সত্য কথা কহে তাহাও মিথ্যা মনে করিয়া সকলে অগ্রাহ্য করে ও নানা প্রকার তিরস্কার লাঞ্ছনা করিয়া, নিকট হইতে দূর করিয়া দেয় ইহাতে কখনও তাহারা মহতের উপযুক্ত হইতে পারে না এবং পরস্পর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট ঘৃণাস্পদ হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণায় বিফলে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে। বৎস! তুমি সত্যভাষী হও, যে সত্য কথা বলে সে পরের প্রাণ রক্ষা করে, সে ধার্ম্মিক, সে

মিথ্যা কথা ঘৃণা করে অতএব তুমি সত্যের জন্য লালায়িত হও ইহাতে যদি তোমাকে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তথাপিও প্রাণান্তে একটী মিথ্যা বলিও না যদিচ তুমি শিশু তথাপি অত্যন্ত সাহসের সহিত সত্যের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করিবে ইহাতে কখনও ক্ষান্ত হইও না ভবিষ্যতে তোমার অনেক মঙ্গল হইবে কারণ সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় ঈশ্বর যিনি সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়া মিথ্যা ব্যাভিচার ইত্যাদি সকল প্রকার পাপ, আপদ, বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আজন্ম নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই কারণ, সত্যই এ সংসারে সার।

প্রতিবাসী ও সমবয়স্ক বালকদিগের প্রতি ব্যবহার।

বৎস! যাহারা নির্ভয়ে তোমাদের বাসস্থানের নিকট বাস করে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন কোন মন্দ সংকল্প করিও না কারণ তোমরা যাহাদের সঙ্গে একত্রে আলাপ ব্যবহার করিয়া সুখী হও, মাতা শোক তাপে সন্তপ্ত হইলে যাহাদের নিকট যাইয়া ক্লেশ যন্ত্রণা দুর করেন এবং তোমাদের কখন কোন দ্রব্যাদির অভাব হইলে যাহাদের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হও বিপদে আপদে যাহারা সর্ব্বদা সহায় হয় তুমি তাহাদের প্রতি কখনও বিরুদ্ধাচরণ করিও না, দূরস্থ আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা এরূপ নিকটস্থ প্রতিবাসী অতি শ্রেষ্ঠ। যদি তুমি

তাহাদের কাহারও কথন একটী অহিত কার্য্য কর তাহা হইলে অতি কুকর্ম্ম করা হইবে কারণ যিনি তোমাদের হিতার্থী তোমার তাঁহার প্রতি অনিষ্টাচরণ হইল ইহাতে তিনি অতি রাগ করিবেন, এবং তোমার পিতা মাতাও অসন্তোষ হইয়া নানা প্রকার শাসন করিবেন কারণ যাহারা এরূপ উপকারীর প্রতি অনিষ্টাচরণ করে তাহারা প্রাণের বিরুদ্ধে মহা পাপ করে, জগদীশ্বরের নিকট অতি ঘৃণিত হয় এবং ইহ সংসারে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পারে না ইহাতে অনেক প্রকার দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া ভবিষ্যতে ঈশ্বরের বিচারে অশেষ দণ্ড পায়, অতএব তুমি এমত হিতকারী প্রতিবাসীদিগের প্রতি কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করিও না। তাহাদিগকে সম্মান করিবে এবং তাহাদিগের কোন প্রকার প্রত্যুপকার করিতে তোমার উপায় থাকিলে তাহাতে যত্নশীল হও আর যদি কখন তাঁহারা তোমার প্রতি আদেশ করেন অথবা কোন একটী দ্রব্যের জন্য অনুরোধ করেন এবং তাহা থাকে তাহা হইলে কখন অস্বীকার করিও না, বরং তুমি বালক বলিয়া তাহাতে অনধিকার থাকিলে তাহা অতি বিনীত ভাবে তোমার মাতার নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর ইহাতে তোমার জননী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন আর তাহারাও তোমার এরূপ সাধু ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া স্নেহের সহিত নানা প্রকার আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা হইলে তুমি সকলের নিকটে অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া থাকিবে এবং তাঁহাদের সাহায্যে অনেক বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারিবে এপ্রকার তোমার সম বয়স্ক বালকদিগের প্রতিও কোন অনিষ্টের পথ

মনোনীত করিও না। যাহারা তোমার সঙ্গে একত্রে লেখা পড়া করে এবং সময় ২ তুমি যাহাদের নিকট যাইয়া খেলা করিয়া সুখী হও, তাহাদের সঙ্গে কখন অকারণে ঝগড়া কলহ করিও না। যদি কেহ তোমার সহিত অন্যায় পূর্ব্বক বিবাদ করিতে প্রস্তুত হয়, তুমি তাহা পরিহারের চেষ্টা করিও, কারণ বিবাদে নিবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের গৌরব, কেহ কোন প্রকার উপদ্রব করিয়া তোমার কিছু অনিষ্ট করিলে তুমি তাহাতে বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল হও ইহাতে সে তোমাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিয়া নানা বিষয় সাহায্য করিবে, এইরূপ পরস্পরের হিত কামনায় রত থাকিলে কেমন সুখে কাল যাপন করিবে।

কটুভাষা ও নম্রশীলতা।

বৎস! কাহাকেও কটু কথা কহিও না কটুভাষী হইলে তোমার পিতা মাতা অসুখী হইবেন এবং সর্ব্বদাই তোমার প্রতি রুষ্ট থাকিয়া নানা প্রকার শাসন করিবেন কারণ, কটু কথাতে সকলেরই ক্রোধ জন্মায়, যে কটু কহে কেহ তাহাকে ভালবাসে না এবং দেখিতেও পারে না, আত্মীয় ভাই বন্ধু সকলেই তাহার কটূক্তিতে বিরক্ত হইয়া অশেষ প্রকার তিরস্কার লাঞ্ছনা করে সম বয়স্ক বালকেরা তাহার সঙ্গে খেলা করিতে চাহে না,

সকলেই ঘৃণা করিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে কেহ আলাপ করিতেও চায় না ইহাতে সে কোথাও সুখী হইতে পারে না যেখানেই থাকুক সর্ব্বত্রই কেবল ঝগড়া কলহে শত্রুতা বৃদ্ধি করিয়া চির দুঃখে কাল হরণ করিতে থাকে অতএব তুমি কাহাকেও কখন কটু কথা না বলিয়া সকলের প্রতি অতি নম্রশীল হও, কথাতে সকলেরই মন প্রফুল্লিত হয় যদি তোমাকে কেহ কটু কথা বলে অথবা তোমার সহিত ঝগড়া করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে তুমি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া মিষ্ট কথা ও সরল ব্যবহার দ্বারা বিবাদ পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে ইহাতে সে লজ্জিত হইয়া তোমার অহিতাচরণ করা দূরে থাকুক বরং তোমার বন্ধুর ন্যায় হিত কামনায় রত হইবে। বৎস! কটু ভাষায় যেমন মিত্র শত্রু হইয়া উঠে, বিনয় বাক্যে সেইরূপ শত্রুকে মিত্র করা যায়। মিষ্ট কথায় সকলেই আহ্লাদিত হইয়া থাকেন, এজন্য যিনি মিষ্টভাষী সকলেই তাঁহার সহবাস ইচ্ছা করেন। বৎস! তুমিও বিনয় ব্যবহার অনুশীলন কর তোমাকে সকলে ভালবাসিবে ও তোমার মঙ্গল কামনা করিবে।

দয়াশীলতা।

বৎস! তুমি সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল হও, কাণা, খোঁড়া, গরীব দুঃখী লোকদিগকে দেখিয়া উপহাস করিও না, যাহারা তাহাদের প্রতি উপহাস করে তাহারা তাঁহাদের

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ধিক্কার দেয় অতএব যাহারা অনাথা, গরীব, খাওয়া পরার কোন প্রকার সংস্থান নাই, রোগে, শোকে ক্লান্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোন প্রকার উপায় করিতে পারে না অশেষ ক্লেশে প্রাণের দায়ে দ্বারে দ্বারে দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, তুমি তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া যথা সাধ্য প্রতিকার করিতে যত্ন কর তাহাতে তোমার অনেক মঙ্গল হইবে কারণ যাহারা এমত দীন হীন গরীব দুঃখীদিগকে দয়া করে তাহারা তাহাদের বাসস্থান আশীর্ব্বাদ যুক্ত করে করুণাময় ঈশ্বরের দয়ায় তাহাদের সমস্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে এবং প্রাণে শান্তি পায় অতএব তুমি কখন এমত হিতানুষ্ঠান কার্য্যে ক্ষান্ত হইও না এখন হইতে তাহার পথ অনুসরণ করিয়া খুব পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিক্ষা ও ন্যায় পথে ধন উপার্জ্জন ইত্যাদি নানা প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হও ইহাই এ সংসারের প্রিয় কার্য্য, এই উদ্দেশ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি কখন ইহাতে বিমুখ না হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তিনি তোমার সহায় হইয়া সকল বিষয় সম্পন্ন করিবেন, ইহাতে তোমার চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল থাকিবে, এবং পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন সকলেই সুখী হইবেন কারণ দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদের বাসস্থান শান্তিনিকেতন হইয়া উঠিবে।

দুর্ব্বৃত্ত ও ধার্ম্মিক।

বৎস! তুমি কখন দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সঙ্গে পরিভ্রমণ করিও না, তাহাদের সঙ্গ অত্যন্ত ভয়ানক কখন যে বিপদ উপস্থিত হইবে তাহা তাহারা জানে না, কারণ তাহারা অত্যন্ত দৌরাত্ম্যপ্রিয়, বিবেচনাপূর্ব্বক কখন কোন কাজ করে না, সর্ব্বদাই পাপানুষ্ঠানে মত্ত হইয়া নানা প্রকার অনিষ্টের চিন্তা করে, অজ্ঞানতাবশতঃ ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই ভাবে না, পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় গুরু জন কাহারই কোন সৎ উপদেশের কথা গ্রহণ করে না কেবল আপনার ইচ্ছানুরূপ কিসে কার অনিষ্ট করিবে এইরূপ চিন্তায় দুষ্ক্রিয়াতে রত হয় কিন্তু ইহাতে কখন তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারে না, পাপাশ্রিত হইয়া সর্ব্বদাই তাহাদের মনঃপ্রাণ শশঙ্কিত থাকে কোন প্রকার স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না শীঘ্রই আশা প্রদীপ নিবিয়া যাইয়া তাহার বিপরীত ফল ভোগ করে, কারণ দুষ্ট লোক যে বিষয় ভয় করে, হঠাৎ তাহাই আসিয়া ঘটনা হয়, নিজ পাপরূপ রজ্জুতে বন্ধন হয়, এবং নিরাশ্রয় হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে ইহাতে সহায় হইয়া প্রতিকার করিতে কেহই থাকে না বরং তাহাদের বিনাশ হইলে সকলেরই হৃদয় আনন্দিত হয়, নানা প্রকার দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পায়, এবং আশঙ্কা দূর হয় কারণ তাহারা সকলেরই অপকার কল্পনা করে, আপন বন্ধুদিগকেও লোভপ্রলোভনে পথ ভ্রান্ত করিয়া কুপথে লইয়া যায়, এবং নানা প্রকার দুরভিসন্ধি করিয়া বিপদ ঘটায় অতএব তুমি তাহাদের

নিকট দিয়াও যাইও না তাহা হইতে বিমুখ হইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ধার্ম্মিকতার পথ অবলম্বন কর।

বৎস! যাঁহার দয়ায় এ সংসারে বাস করিতেছ, যাঁহার দয়ায় পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীদিগকে পাইয়া তাঁহাদের স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছ; সেই করুণাময় ঈশ্বরের দয়া গুণ মনে করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তির সহিত বিনীতভাবে প্রার্থনা কর,এবং নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই দয়ায় যাঁহারা তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন এবং নানা প্রকার শিক্ষা উপদেশ দিয়া মঙ্গল কামনায় রত হয়েন, অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া সৎ পথ অনুসরণ কর। যাঁহারা সত্য অবলম্বন করেন তাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহাদের দ্বারা কাহারই কিছু অনিষ্ট হয় না, তাঁহারা নিজে উন্নতি লাভ করিয়া সংসারে অনেক মঙ্গল সাধন করেন, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, আত্মীয় পরিজন সকলেই তাঁহাদের দ্বারা অত্যন্ত সুখে থাকে কারণ কখন তাহারা কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন না, সকলেরই সুখ সন্তোষের জন্য চেষ্টানুসন্ধান করেন, পিতার জ্ঞান উপদেশ বাক্য গ্রহণে অত্যন্ত মনোযোগী হয়েন, মাতা যখন যাহা আদেশ করেন, অতি যত্নের সহিত তাহা প্রতিপালন করেন, জ্যেষ্ঠ ভাই ভগ্নীদের প্রতি অতি সম্মানের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং যাহারা কনিষ্ঠ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হয়েন ইত্যাদি আত্মীয় পরিজনদিগকে যথা নিয়মে সকলকেই রক্ষণাবেক্ষণ করেন; এবং বিপদে আপদে সকলের সহায় হন ও অনাথা

গরীব দুঃখী লোকদিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া অনেককে প্রতিপালন করেন, তাহাদের শরীরে রাগ দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি কিছুই থাকে না কেবল সর্ব্বদাই করুণাময় ঈশ্বরের দয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মরূপ বীজ বপন করেন, তাহাতে জীবনদায়ক বৃক্ষ হইয়া অনেক মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পায় এপ্রকার নানা বিষয় হিতানুষ্ঠানে যথাংসাধ্য পরিশ্রম করিতে কখনও ত্রুটি করেন না ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইলেও ক্ষান্ত হন না কারণ তাঁহারা নিজের সুখ মনে করিয়া কখনও পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না অতএব আপনারা অভুক্ত থাকিয়াও আহারীয় অংশ অপরকে দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন তাহাতেই মঙ্গলময় ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, কখন তাহাদের মনন নিষ্ফল হয় না, কোন প্রকার বিড়ম্বনাও ঘটে না, সকল প্রকার শঙ্কট হইতেই উত্তীর্ণ হয় কারণ করুণাময় ঈশ্বরের দয়ায় তাহারা নিত্য স্থায়ী ভিত্তি স্বরূপ, কিছুতেই কখন বিচলিত হয় না সর্ব্বদাই আনন্দে নানা প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে ইহাতে সকলেই তাহাদের সুখে সুখী হয় কারণ, ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইলে সকলেরই হৃদয় আনন্দিত হয়। অতএব তাহারাই ধন্য, যাহারা করুণাময় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে রত হইয়া সংসারে অনেক মঙ্গল সাধন করে।

পরিশিষ্ট।

কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাগুলিও সর্ব্বদা যখন যেখানে যেটী খাটে সেইটী বলিতেন।

১। রাখে কৃষ্ণ মারে কে! মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

২। ভগবান দয়াবান।

৩। হাতে দৈ, পাতে দৈ, তবুও বলে কৈ কৈ!

৪। এলোমেলো করিলে ধর্ম্ম হয় না।

৫। ধ্যান করবে বনে, কোণে ও মনে।

৬। সংসারের গুরু মন্ত্র দেয় কাণে,জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

৭। যাহা রাম, তাহা নাহি কাম, যাহা কাম তাহা নাহি রাম, দিবস রজনী নাহি রহে এক ঠাম।

৮। পদে পদে অপরাধ ক্ষমা কর রঘুনাঁথ।

৯। ফল ফলাচ্ছ ফলাগাছে।

১০। মেয়ে না মায়া, সব নিল খাইয়া।

১১। জানায় মানায় না।

১২। মুক্তিমিচ্ছস্তি চেতঃ বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজেৎ।

১৩। ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত তিন সমান, রূপে প্রভেদ।

১৪। বিদ্যারূপে দিয়া জ্ঞান, কাকে কর পরিত্রাণ।
আবার অবিদ্যায় আবৃত করে মোহ গর্ত্তে টেনে ফেলে।

১৫। আমরা যে খেয়ে আছি এ ত ভগবানের অসীম দয়া।
কত লোক না খাইয়া মারা যাইতেছে।

১৬। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটী পাতাও নড়ে না।

১৭। ভগবানের কৃপার শেষ নাই।

১৮। জপ তপ যত কর, কিন্তু মরতে পারলে হয়।

১৯। সারা জীবন জপ করা কেবল শেষ সময়ে ভগবানকে মনে করার জন্য।

২০। ভগবানই সার আর সকল অসার।

২১। তোতা পাখী সারা জীবন হরে কৃষ্ণ বলে, বিড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে।
জীবও সমস্ত জীবন হরি হরি বলে, শেষ কালে আত্মীয় স্বজন মনে করে।

২২। যখন ভগবান যাহাকে যে ভাবে রাখেন, তাহাকে সেই ভাবেই থাকিতে হয়।

২৩। ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তাঁকে জানতে পারে।

২৪। দেব দ্বিজ, গুরু মন্ত্রে বিশ্বাস থাকা উচিত।

২৫। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ হয় না।

২৬। সাপ হয়ে কাট তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়।
হাকিম হয়ে হুকুম দেও, প্যাদা হয়ে মার ॥

২৭। সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি ॥

২৮। দিনমে মোহিনী, রাত্‌মে বাঘিনী, পলক পলক লঁহু চোষে
দুনিয়া ভরকে বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥

২৯। তুচ্ছং ব্রহ্ম পদং পর বধূ-সঙ্গঃ কুতঃ।

৩০। কাম ছাড়লে রাম, রতি ছাড়লে সতী।

৩১। আমল্ করকে করে ধ্যান,
সংসারী হোকে বাতায় জ্ঞান,
সন্ন্যাসী হোকে কুটে ভগ,
এই তিন কলিকা ঠগ।

৩২। হবিষ্যান্ন খাইয়াও গোমাংস খাওয়া হয়,
আবার গোমাংস খাইয়াও হবিষ্য করা হয়।

৩৩। মনমে চাঙ্গা, কোটরমে গঙ্গা।

৩৪। আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন কার ঘরে,
যা চাবে এখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

৩৫। জীব যখন শিব হয়, শিব যখন শব হয়,
মা সচ্চিদানন্দময়ী তখন হৃদয় কমলে নাচেন।

৩৬। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাক্তে নয়।

৩৭। মানুষ শব্দের অর্থ=মান+হুঁষ।

৩৮। আমার কর্ম্ম দ্বারা আমি বদ্ধ, আমার কর্ম্ম দ্বারা আমি মুক্ত হব, কে রাখে?

৩৯। মেয়ে পুরুষ বলিয়া আত্মায় কোন ছাপ দেওয়া নাই।

৪০। মেয়েদের কোথা গিয়াও ধর্ম্ম হয় না। তাহাদের ধর্ম্ম হয় ঘরে বসে।

৪১। যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়।

৪২। মেয়ে ভক্ত কেঁদে গড়াগড়ি দিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।

৪৩। প্রাক্তন ভোগ কেহ খণ্ডাইতে পারে না।

৪৪। জীব তিন রকম, বদ্ধ, মুক্ত, ও মুমুক্ষু—
বদ্ধ জীব নিজেও ঠাকুরের নাম নেয় না অপরকেও নিতে দেয় না।
মুক্ত জীব সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণ করে।
মুমুক্ষু জীব ভগবানের দিকে চাহিয়া থাকে এবং তাঁহার দয়া হইলে ধন্য হইয়া যায়।

৪৫। মানুষের বাহিরের আকার এক হইলেও, ভিতরে তাকাইলে দেখা যায়, কেহ বাঘ, কেহ ভল্লুক।

৪৬। মায়ের দশ ছেলে, তিনি কাহাকে চুষি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও এটা ওটা দিয়ে মত্ত করে রেখেছেন, আর অশান্ত ছেলেটিকে কোলে করে বসে আছেন কিন্তু যেই কোন অশান্ত ছেলে সমস্ত ত্যাগ করিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, মা অমনি তাহাকে কোলে স্থান দেন ও শান্ত করেন। সেইরূপ এ সংসারেও যে মানুষ, সমস্ত খেলা ছারিয়া মা'র জন্য আকুল হয়, চিন্ময়ী মা তাহাকে কোলে তুলে নেন।

৪৭। ভগবানের কৃপা হলে জ্বালার হাত এড়ান যায়, নচেৎ নয়।

৪৮। ভগবান মঙ্গলময়।

৪৯। জনক রাজা চতুর ছিলেন, কিছুতেই ছিল না ত্রুটী।
একুল ওকুল দুকুল রেখে খেয়ে গেলেন দুধের বাটী॥

৫০। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে, তবু সন্ধান নাহি পায়।

৫১। সখি, যত কাল থাকি, তত কাল শিখি।

৫২। পুরাণাদি সকলই সত্য, কিছুই ভুল নয়,
পরমহংসদেব বলিতেন, তাও বটে, তাও বটে।

৫৩। এক দিন মহম্মদ ঘুমাইয়া আছেন, শত্রুগণ তাঁহাকে ঘেড়িয়াছে। এক জন তাঁহাকে তদবস্থায় মারিতে চাহিল; কিন্তু তাহাদের ভিতর বাদানুবাদের পর স্থির হইল, জাগাইয়া মারা হইবে। তখন তাহাকে জাগান হইল। অন্য এক জন মহম্মদের বুকের উপর বল্লম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহম্মদ এখন কে তোমাকে রক্ষা করিবে?" তখন মহম্মদ বুকের কাপড় ফেলিয়া জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আল্লা আমাকে রক্ষা করিবেন!" এই কথা বলা মাত্র শত্রুদের হস্তস্থিত বল্লম পড়িয়া গেল এবং তাহারা কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। মহম্মদ চলিয়া গেলেন।

৫৪। যীশু পেরেকবিদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান, ইহাদের দোষ গ্রহণ করিও না; কারণ ইহারা জানে না কি করিতেছে।"

৫৫। মহাপ্রভু বলিতেন, রমণীর কোল, মাগুর মাছের
ঝোল; বোল হরি বোল।

৫৬। একই ভগবান সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিতেছেন।

৫৭। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

৫৮। ভগবান ও তাঁহার ভক্ত কাহারও দোষ গ্রহণ করেন না; কারণ গুণগ্রাহী জনার্দ্দন।

৫৯। পাশবন্ধ ভবেৎ জীবঃ।
পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ॥

৬০। মায়াকে চিনিলে, মায়া আপনি পলায়।

৬১। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।

৬২। হ'তে হ'তে যাহা হয়। এই সংসারে কেহ কিছু করিতে পারে না, সকলই তাঁর ইচ্ছা।

৬৩। মঙ্গলময় হইতে অমঙ্গল হয় না।

৬৪। মনে বলে পাপ কর্ম্ম করিব না আর,
স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার?

৬৫। সুমতি কুমতি সবই মা ভগবতী।

৬৬। বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়।

৬৭। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ।

৬৮। এই হাসি এই কান্না বলে গেছে রাম সন্ন্যা।

৬৯। দোষ করিলে ভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিতে হয়,
তিনিই কেবল আমাদের দোষ ক্ষমা করিতে পারেন।

৭০। পাপ ও পায়রা কখনও গোপন থাকে না সময়ে প্রকাশ পায়ই।

৭১। ভ্রমিয়া বার, ঘরে বসিয়া তের।

৭২। যুবতী কন্যার সহিত পিতাও নির্জ্জনে থাকিবে না।

৭৩। যত দিন পুড়ে শ্মশানে না পড়ে ছাই, তত দিন সতীত্বের বিশ্বাস নাই।

৭৪। পূজা, ধ্যান, জপ সকলই শেষ মুহূর্ত্তে ভগবৎভাব জাগাইবার জন্য।

৭৫। যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৭৬। পঞ্চ ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

৭৭। সংসারের কথাবার্ত্তা কাক কোন্দলবৎ।

৭৮। যদ্যপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ী যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

৭৯। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।

৮০। লিঙ্গই সিংহ হইয়া ঘাড় কামরায়।

৮১। কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনা করে, যেমন লাউ কুমড়ার আগে ফল পরে ফুল।

৮২। চারা গাছে বেড়া।

৮৩। প্রাতঃকালে তোলা মাখন যেমন জলে মিশে না, সেইরূপ ছোটকালে ভগবৎপরায়ণ হইলে আর মায়া বদ্ধ হয় না।

৮৪। কলিকালে বহু লোক কীর্ত্তন করিবে নাচিয়া গাইয়া শেষে নরকে যাইবে॥

৮৫। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, কাক কোন্দলবৎ মনে করিবে।

৮৬। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল।

৮৭। প্রদীপের স্বভাব আলো দেওয়া—কেহ ভাগবৎ পাঠ করিতেছে কেহ রান্না করিতেছে, কেহবা জাল বুনিতেছে।

৮৮। কাঁচা মাটীতে গড়ন চলে, একবার তাহা পাকা হইলে শত চেষ্টাতেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।

৮৯। মূলা খেলে মূলার ঢেকুর উঠে, যাহার হৃদয়ে যে ভাব আছে, তাহা আপনি বাহির হইয়া পড়ে।

৯০। মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্ত্তা ভজা।

৯১। পতঙ্গ আলো ভালবাসে, আলো দেখিলেই তাতে পড়ে, বাধা মানে না। সেইরূপ ভক্ত ভগবানের নিকট চলিয়া যায়, সংসারের শত বাধা তাহাকে রাখিতে পারে না।

৯২। অমৃত কুণ্ডে যেভাবেই হউক পড়িলেই হইল।

৯৩। ভগবানে তন, মন ও ধন দিতে হয়।

৯৪। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়।

৯৫। মানুষ ব্রহ্মকে না জানিলে সংসার ছাড়িতে পারে না। জলৌকা যেমন একটী অবলম্বন গ্রহণ করিয়া অন্যটী ছাড়ে, সেইরূপ জীব ভগবানের বিমল সুখ পাইলে সংসারানন্দ ভুলিতে পারে।

৯৬। এ সংসার ধোকার টাটি।

৯৭। ভগবান যাকে ধরে তার পা বেতালে পড়ে না।

৯৮। দেহ জানে আর জানি আমি, মন তুমি আনন্দে রহ।

৯৯। সাধ করে ফোড়াইলাম কাণ কচু দিতে যায় প্রাণ।

১০০। খামের একান্তা ওকান্তা।

১০১। সোণার বেনে জানে সোণা যে মূল,
কাঙ্গালের দুয়ারে রঙ্গ সমতুল।

সমালোচনা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্রের পুস্তকের কয়েকটী মিথ্যা উক্তি দেখান হইল।

শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বহি ঃ—

ক্ষেত্রমোহন দের পুত্র কৃষ্ণমোহন দে। তাঁহার নিজ পৈত্রিক বাড়ী হরিতকী বাগান লেন, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় তিনি চিৎপুর, ৯নং ব্রজদুলাল সাহা লেনে থাকিতেন। তিনি ইংরেজী ১৯২৫ কি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মারা যান। বড় নামজাদা কারবারী ছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কলিকাতার পরিচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সংবরণের কথা শুনিয়া সমাধির উপর ঘর তুলিতে পাঁচ শত টাকা শরৎ বাবুর নিকট দেন। হরপ্রসন্ন বাবু মা'কে আসিয়া এই কথা জানান এবং বলেন যে, "শরৎ বলেন পাঁচ শত টাকায় সমাধির উপর ঘর কি হইবে? আমি এই টাকা দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ লিখিয়া ছাপাইলে, তাহাতে যে আয় হইবে তাহা দিয়া মন্দির করা যাইবে"। মা বলিয়াছিলেন, বই লিখিয়া ঘরে ঘরে বাঁদর নাচাইবার দরকার নাই। কিন্তু তিনি মা'র বিনানু-মতিতেই বই ছাপান। ঐ টাকা আজ পর্য্যন্তও শরৎ বাবু শ্রীশ্রীমা'কে কিম্বা মন্দিরের কাজের জন্য দেন নাই, অন্য টাকা ত দূরের কথা। ইহা হইতে তাঁহার চরিত্র আপনারাই বিচার করিবেন।

তাঁহার বহি "সাধু নাগ মহাশয়" তৃতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ১ম :—

"১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র নাগ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।"

ইহা ভুল। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম ৭ই ভাদ্র শনিবার, ৬ই ভাদ্র নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কুষ্ঠির রাশি চক্র ও সন, তারিখ এই পুস্তকে দেওয়া হইল।

ঐ বহি পৃঃ ১১ :—

ফুট নোটে সুরেশ দত্তের মুখে বলান হইয়াছে "নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া Campbell Medical Schoolএ ভর্ত্তি হইয়া দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন।...... তিনি Hiley's Grammar পড়িতে পারিতেন। অনেক স্থল কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু সকল কথা ভালরূপ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।... তিনি আমার কাছেও একটু একটু ইংরাজী পড়িতেন।"

এই প্রসঙ্গটী একেবারেই অমূলক; কারণ মা বলেন, ঠাকুর মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, স্কুলে নয়, এবং শেষ পরীক্ষার অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রফেসার সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদের মার-পিঠের সময় হাঁটুতে আঘাত পাইয়া কলেজ ছাড়িয়া দেন, আর পরীক্ষা দেওয়া হয় না। ঠাকুরের যে কয়েকখানি ডাক্তারী পুস্তক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গুহ মহাশয়ের নিকট আছে, তা, সবই ইংরাজীতে লেখা কলেজের পাঠ্য। বিশেষতঃ তিনি বি, এল ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন, ভাদুড়ী মহাশয় মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভিন্ন অন্যকে

পড়াইতেন না। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে এক সময়েই ডাক্তারি পড়িতেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে শ্রীশ্রীঠাকুর কলেজেই পড়িতেন এবং ইংরেজী ভাষায়ও তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সুরেশ দত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবনে পরিচয় হয়। তখন তাঁহার নিকট ইংরেজী শিখিবার কি প্রয়োজন ?

ঐ বহি পৃঃ ৪০ ঃ—

"সত্য বটে, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ নাই।...কিন্তু কেবল অন্নবস্ত্রেত হৃদয়ের অভাব পূর্ণ হয় না। স্বামীর অনুরাগই নারী জীবনের এক মাত্র অবলম্বন।"

শরৎ বাবু অনধিকার চর্চ্চা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি ? শ্রীশ্রীমা'র মনের ভাব পর্য্যন্ত তিনি অনুমান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কখনও কিছু বলেন নাই ; অন্য কাহাকেও নহে।

ঐ বহি পৃঃ ৪৬ ঃ—

"নাগ মহাশয় বুঝিলেন,.........তিনি এখনও এ পবিত্র সাধুর চরণ স্পর্শ করিবার যোগ্য হন নাই।"

ঐ বহি পৃঃ ৭৩ ঃ—

পরমহংসদেবকে গুরু নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,"গুরু নিন্দা শুনিলে এই অক্রোধ পরমানন্দ সাধকের ধৈর্য্য চ্যুতি হইত।"

ইহাও শরৎবাবু অনুমান করিয়াই লিখিলেন। মা বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন যেখানে যাইতেন, মা'কে বলিয়া যাইতেন এবং

যেখানে যে ঘটনা ঘটিত, মা'র সঙ্গে দেখা হইলেই, কথাচ্ছলে সব বলিতেন। শরৎ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুমান-সিদ্ধ ও মিথ্যা। মা বলেন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, যখন রামকৃষ্ণ দেব প্রণাম করিতে দিলেন না, তখন তিনিও সংকল্প করিলেন যে আর তাঁহাকে প্রণাম করিবেন না।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে লিখা দরকার যে পরমহংস দেবের নিকট এই সময় যখন ঠাকুর প্রথম যান তখন ঠাকুরের পিতা দেশে প্রত্যাগত এবং মাতাঠাকুরাণীকেও তাঁহার সেবার জন্য দেশে পাঠাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা ছিলেন। পিতৃ আদেশে দুই বার বিবাহ করিয়া এযাবৎ ত্রিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে একত্র বসবাস করিয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া যিনি মা ও ছয় মাসের শিশুর ন্যায় স্ত্রী-অঙ্কে ঘুমাইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, যাঁহার কাম-কাঞ্চন ত্যাগ জন্মাবধি মজ্জাগত, সেই বিদেহী পরমানন্দ পুরুষ যেই মাত্র সুরেশ বাবুর মুখে শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে "কামকাঞ্চনত্যাগী সাধু আসিয়াছেন"—জীবের অগম্য দেবারাধ্য—"কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী" শব্দ শুনিবা মাত্র তাঁহার প্রাণে আনন্দ ঝঙ্কারিল, অমনি বলিলেন, "আজই যা'ব" এবং দক্ষিণেশ্বর গেলেন। সকলেই পরমহংসদেবকে প্রণাম করিলেন। জহুরী জহর চিনিলেন, কাজেই শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি দিবেন কেন? পা টানিয়া নিলেন, প্রণাম করিতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিলেন, "যেন জ্বলন্ত

আগুণ, জ্বলন্ত আগুন।" পরমহংস দেবও কামকাঞ্চনের বিভীষিকায় স্পন্দিত হইয়াছিলেন ;* কিন্তু এ মহাবিরাট্ সকল অবস্থাতেই সম ভাবে হিমাদ্রি সদৃশ অচল, অটল ছিলেন। তাঁহার রামকৃষ্ণ দেবের চরণ স্পর্শ জন্য ক্ষোভ হইবার কারণ কি হইতে পারে—? এবং তাঁহার অন্যের নিকট—যাঁহারা কামকাঞ্চনে ভীত তাঁহাদের নিকট শিখিবারইবা কি আছে, তাহা আমরা ভাবিতে অক্ষম। এ সমস্ত জানিয়াও শরৎ বাবুর এরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য আপনারাই স্থির করিবেন। প্রথম বারের ভূমিকায়ও কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

শরৎ বাবুর দায়ীত্বশূন্য লেখায় অনেকে বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন। সেটী ভিত্তি শূন্য ভুল ধারণা। বহু পূর্ব্বে তিনি কুল গুরু হইতে মন্ত্র নিয়াছিলেন। শরৎ বাবুর বহি—"সাধু নাগ মহাশয়" ৩৯ পৃষ্ঠাতেও ইহার উল্লেখ আছে। পরমহংস দেবের সহিত প্রথম দিন সাক্ষাৎ হইতে কলিকাতা কর্ম্মজীবন শেষ করিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ছয় মাস সময় মধ্যে পরমহংসদেবের নিকট খুব বেশী

---

* রামচন্দ্র দত্ত কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত সংস্করণ ১২৯৭ সাল পৃঃ ১৫৮। স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (সাধকভাব) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৮৮, ৩৫২, ৩৫৩। শ্রীম কথিত শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ কথামৃত তৃতীয় ভাগ ৫ম সংস্করণ পৃঃ ১৪৭, ২য় ভাগ ৬ষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ১৭৮। শশীভূষণ ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৩৩২ সন সংস্করণ পৃঃ ৯০, ১৬৯।

দিন যাতায়াত করেন নাই। কাজেই শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে বহু লোকের নাম ভক্ত বলিয়া লেখা আছে যাহারা সর্ব্বদা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন; কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম তথায় পাওয়া যায় না। কথামৃত তৃতীয় ভাগে এক দুর্গাচরণ ডাক্তারের (৺সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জির পিতা) নাম আছে। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুর ন'ন। গুরু শিষ্য সম্পর্ক থাকিলে এবং বহু যাতায়াত থাকিলে এরূপ জীবনের কাহিনী পরমহংস দেব সম্বন্ধীয় আদি পুস্তক সমূহে বিশদ ভাবেই উল্লেখ থাকিত। কারণ কেহ কেহ কোন মহাপুরুষকে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের শিষ্য বা ভক্ত বলিতে পারিলেই বিজয় বৈজয়ন্তি হইল মনে করেন, কাজেই ভিন্ন পন্থী এমন কি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৺কেশব চন্দ্র সেন প্রভৃতিও তাহাদের হাতে অব্যাহতি পান নাই। অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুথিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা কতক শুনা বা মন গড়া কাল্পনিক কথা—কারণ তাহার উক্তি, "কৃষ্ণবর্ণ সে পুরুষ মাংস নাহি গায়", পড়িলেই মনে হয় লেখক নিজে তাঁহাকে দেখেন নাই। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মগোপন একমাত্র উদ্দেশ্য না থাকিলে ধর্ম্মজগতে আজ শ্রীশ্রীঠাকুর অদ্বিতীয় ভাবে প্রচারিত হইতেন।

বর্ত্তমানে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ ১৪ জন ব্যক্তির জন্ম তিথি উপলক্ষে তিথি পূজা ও উৎসবাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়) পরমহংসদেবের শিষ্য হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জন্ম তিথি পূজা ও উৎসব এযাবৎ বেলুড় মঠে বাদ না পড়িয়া বরং বিশদ ভাবেই হইত। এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ থাকিলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পরমহংসদেবকে গুরু স্বীকার না করিয়া ৺বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গুরু বলিতে পারেন কি ? শ্রীশ্রীমা আরও বলেন যে, কুল গুরু ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য কোন গুরু করেন নাই"।

ঐ বহি পৃঃ ৪৮ ঃ—

"কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সেখানে বসিয়া নাগ মহাশয়কে তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন···কেবল মনে এক ক্ষোভ—ঠাকুর পদধূলি দেন নাই"।

মা বলেন, ইহার সবই মিথ্যা, আরও বলেন যে পরমহংস দেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলে অস্থির হইয়া যাইতেন। পরমহংস দেবের শেষ সময় যখন মুহুর্মুহু অন্তর্দাহ হইতেছিল, তখন ঠাকুর যাওয়া মাত্র তাঁহাকে নিকটে যাইতে বলিলেন এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্তর্দাহ শীতল করিয়াছিলেন (শরৎ বাবুর বহি পৃঃ ৬৪)। সেই ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া আনিতে বলা ইত্যাদি ত হইতেই পারে না। শরৎ বাবুকে এসব কে বলিয়াছে ? সবই আনুমানিক, ও মন গড়া কথা। শরৎবাবু 'রামকৃষ্ণ দর্শন' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন সবই তাঁহার নিজ কল্পিত ও মিথ্যা এবং অনধিকার চর্চ্চা। দুই একটী কথা মাত্র সত্য, তাহা এই পুস্তকে উল্লেখ করা গেল।

ঐ বহি পৃঃ ৫২ ঃ—

"যে বৃত্তি ঈশ্বর লাভের প্রবল অন্তরায় বলিয়া রামকৃষ্ণদেব নির্দ্দেশ করিলেন, সে বৃত্তি দ্বারা অন্ন-বস্ত্র লাভে আমার প্রয়োজন নাই। সেই দিনই বাসায় আসিয়া ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তকাদি লইয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন", ইত্যাদি।

একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি শেষ বার যখন কলিকাতার কর্ম্ম জীবন অবসান করিয়া দেশে আসেন তখনও পঞ্চাশ টাকার ঔষধ কিনিয়া দেশে আনেন, বই, বাক্সত আনেনই। এবং দেশেও কয়েকটী সাংঘাতিক রোগী নিরাময় করেন ;—যথা রতিকান্ত চক্রবর্ত্তীর কলেরা, যতীন্দ্র দাসের কলেরা, যতীন্দ্র দাস, বিনোদিনী ঘোষের অর্দ্ধাঙ্গ, এই তিনটীর মাত্র নাম দিলাম। যতীন্দ্র দাস এখনও নারায়ণগঞ্জে উকিল। অনেক বৎসর পরে কতক বই ও বাক্স গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গুহ মহাশয়কে দিয়া ফেলেন। কোন কোন বই নটবর বাবুও নেন, আমার নিকটও তাঁহার একখানা বই আছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বাবু ও শ্রীযুক্ত নটবর বাবু এখনও জীবিত আছেন।

ঐ বহি পৃঃ ৬৭ ঃ—

"১২৯৩ সালে যখন রামকৃষ্ণ দেব লীলা সংবরণ করিলেন, সংবাদ পাইয়া নাগ মহাশয় শ্মশানে গমন করেন।"

ইহা একবারেই মিথ্যা। শ্রীশ্রীমা বলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে ছিলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১১৯ ঃ—

গঙ্গা উত্থান সম্বন্ধে শরৎবাবু লিখিয়াছেন—"অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বাপ গঙ্গাতে যাইতে চান, তখন নাগ মহাশয় বলিলেন, যদি মানুষের যথার্থ অনুরাগ থাকে, মা ভাগীরথী গৃহে আসিয়াই দর্শন দেন" ইত্যাদি।

এই ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও কাল্পনিক।

ঘটনাটী—নাঙ্গলবন্দের আষাঢ়ি পূর্ণিমার স্নানের পর দিন হইয়াছিল! এই পুস্তকে সবিস্তারে দেওয়া গেল। শ্রীশ্রীমা প্রথম দেখেন, এবং মাত্র চারি জনে দেখেন,—শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, হরকামিনী দেবী ও ঠা'নদিদি। অন্য লোক ছিল না। ঠাকুর হরকামিনীকে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে জন্য অন্য কেহ জানিতে পারে নাই ও আসে নাই। দাদা (ঠাকুরের পিতা) ঘরে ছিলেন, বাহির হইয়া পর্য্যন্ত দেখেন নাই।

ঐ বহি পৃঃ ১৪৪ ঃ—

"নটবর কখন কখন কলিকাতায় আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণের পদ ধূলি লইয়া যান।"

নটবর বাবু বলেন, ইহা একেবারেই মিথ্যা। তিনি কখনও কাহারও পদ ধূলির জন্য কলিকাতা যান নাই,অন্য কাজে যাইয়াও কেহর পদ ধূলি লন নাই।

ঐ বহি পৃঃ ১৪৮ ঃ—

"ইহাদিগকে নাগ মহাশয় "লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।"

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। হরপ্রসন্ন বাবু বলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিতে কখনও শোনেন নাই, বরং বিনোদাকে আসিতে দেখিলে তিনি জোরে জোরে বলিতেন, 'অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী তথা। পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥' সে চলিয়া গেলে আরও কত কি বলিতেন।"

ঐ বহি পৃঃ ১৬৩ ঃ—

"সহসা নাগ মহাশয় 'বাঁচাও বাঁচাও' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মাতা ঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি না আমায় বলিয়াছিলেন—মৃত্যুকালে একটুকু মোহও আপনাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না! তবে কেন আপনি এরূপ করিতেছেন ?"

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও বলেন নাই এবং মাও এরূপ উত্তর দেন নাই। মা বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর মা'কে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার, তুমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার।" মা বলিয়াছিলেন, "আমার কি সাধ্য রাখার ?" তখন পুনরায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি রাখ্‌লে রাখতে পার, তুমি রাখ্‌লে রাখ্‌তে পার।" মা নীরব রহিলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১৬৪ ঃ—

"নাগ মহাশয় বলিলেন, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনেই মহা যাত্রা করিব। আমি কাঁদিয়া গিয়া মাতা

ঠাকুরাণীকে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আর কেন কাঁদ বাবা, উনি কিছুতেই আর শরীর রাখবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, রামকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! উনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করুন, দেখে আমরা আনন্দিত হব।”

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা একেবারেই মিথ্যা। তিনি এরূপ কখনও বলেন নাই। প্রাণের প্রতিমা চলিয়া যাইবে, আর মা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন! মা বলেন, ইহা একমাত্র শরতের মুখেই শোভা পায়। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎ বাবু সম্বন্ধে বলিতেন, “ইনি খাইল পাতে বাহ্যে করে” অর্থাৎ যে পাত্রে খান সেই পাত্রেই মল ত্যাগ করেন।

শ্রীমতি বিনোদিনী মিত্রের বহি :—

বিনোদিনী মিত্র, “শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়” নাম দিয়া যে বই লিখিয়াছে, যখন শ্রীশ্রীমা’র মুখে যুগল লীলা শুনিলাম, তখন এই বইখানাকে কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। তাহার নিজের ও স্বামীর কাল্পনিক জীবনী এবং বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিন্দা বাদ, ইহাই এই পুস্তকের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সত্যের সঙ্গে কোন কথারই সংশ্রব নাই,—শরৎ বাবু হইতেও বহু ডিগ্রী উপরে। বিনোদিনী মিত্র রাজকুমার নাগের দ্বিতীয়া কন্যা, পার্ব্বতী চরণ মিত্রের স্ত্রী। রাজকুমার নাগ ৺দীনদয়াল নাগ মহাশয়ের দূরস্থ

জ্ঞাতি ; জন্ম মৃত্যুতে ডুব মাত্র অশৌচ হইত। এই সম্পর্কে তিনি ঠাকুরের জ্ঞাতি ভাই হইতেন। *

যদিও এই বই সমালোচনার একেবারেই অযোগ্য, তথাপি তাহার রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিব, তাহাতেই তাহার পুস্তক কতদূর সত্য, বুঝিতে পারিবেন।

জন-সমাজের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য বিনোদিনী মিত্র বা নাগ দুহিতা রচিত "শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়।" ইহা লিখিয়া হাটে,ঘাটে, পত্রিকায়, বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি করিয়াছে, যেন ঠাকুর-কন্যার রচিত পুস্তক মনে করিয়া সকলে তাহার পুস্তক খরিদ করে। এইরূপ মিথ্যা দ্বারা জন সমাজকে ভ্রমে ফেলিয়া পুস্তক কাট্‌তি দ্বারা যে অর্থশালিনী হইতে ইচ্ছা করে, সে কিরূপ লোক তাহা আপনারাই স্থির করিবেন।

* কাশীরাম নাগ		আত্মারাম নাগ
রামমোহন	রামমনি	
অজ্ঞাত	প্রাণকৃষ্ণ	অজ্ঞাত
রঘুনাথ	দীনদয়াল	কৃষ্ণকুমার নাগ
	শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ	রাজকুমার নাগ
বর্ত্তমান আছে বেতকা বাড়ী।	সন্ন্যাসী	

কাশীরাম নাগ ও আত্মারাম নাগের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা নাই। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও রাজকুমার নাগের ঘনিষ্ঠতা দেখুন।

শ্রীমতি বিনোদিনী মিত্রের বহি পৃঃ ৬৫—৬৭ ঃ—

"মা ঠাকুরাণীর বয়স এখন ষোল বৎসর।...তাঁহারা সাধারণ লোকের মত এক বিছানায় শুইয়া থাকিতেন। মাতাঠাকুরাণী অনেক রকম চেষ্টা করিলেন কিছুতেই তাঁহাকে বশে আনিতে পারিলেন না। মা ঠাকুরাণী তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া রহিলেন, নাগ মহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, সকলই বৃথা হইল। মা ঠাকুরাণী কোন মতেই হৃদয়ের ভাব দূর করিতে পারিলেন না। নাগ মহাশয় তাঁহাকে কত উপদেশ দিলেন, তিনি কোন মতেই প্রবোধ মানিতে পারিলেন না। নাগ মহাশয় মাথা খুড়িয়া রক্ত পাত করিলেন, তাহাতেও তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে রান্না ঘরের পিছনে যে আম গাছ আছে, তাহাতে মাঠাকুরাণী ফাঁস দিলেন। নাগ মহাশয় মাঠাকুরাণীকে ছাড়াইয়া আনিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। হৃদয় হইতে কাম ভাব একেবারে চলিয়া গেল......। মা ঠাকুরাণী শত চেষ্টায়ও তাঁহাকে টলাইতে পারেন নাই।"

এখানেও কয়েকটী কথা লিখা দরকার। যখন মা'র বয়স ষোল বৎসর, তখন বিনোদিনী মিত্রের জন্মই হয় নাই, মাও তাহাকে বলেন নাই এবং তাঁহার পিতাকে ঠাকুর বাড়ীতে আমি বই নিয়া পড়িয়া শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এসব জানেন কিনা। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনিত জানেনই না এবং এরূপ কথা কোন দিন শোনেনও নাই। এ দেশের লোকে এমন কথা কোন দিন শোনেও নাই এমন কি কল্পনা করিতেও

পারে না। আমি মা'কে নিজে লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "মা যেমন ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুমায়, আমি সেইরূপ আজীবন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে নিয়া ঘুমাইয়াছি। এক দিনের জন্যও অন্য ভাব মনে আসে নাই।" বিনোদিনী যাহা কিছু লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজের চরিত্র ও প্রকৃতিকে রঙ্গ বিরঙ্গে চিত্রিত করিয়াছে মাত্র। আপনাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে। কত বাল বিধবা, কত কুলীন ব্রাহ্মণের অবিবাহিতা মেয়ে, কত স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা মেয়ে আছে, কে এইরূপ করে, বা ফাঁস দেয়—যাহা ইতর লোকের মধ্যেও দেখা যায় না? এরূপ ভাবে এই নিখুঁত চরিত্রকে বর্ণিত করা যে কিরূপ ধৃষ্টতা, এবং যে কথা কেহ জানে না এমন বিষয় কল্পনা করিয়া লিখা যে কিরূপ চরিত্রের লোক দ্বারা সম্ভবপর, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন।

ঐ বহি পৃঃ ১৭৫—১৭৯ (চুম্বক):—

বিক্রমপুর কুচিয়ামোড়া বিনোদার স্বামী গৃহ। তথা হইতে রাত্রে সে কাহাকেও না বলিয়া স্বামীকে না জানাইয়া বিমলাচরণ দের সঙ্গে পলাইয়া যায়। এই ব্যাপার নিয়া পার্ব্বতী বাবু, তাহার স্বামী সন্ন্যাসী হওয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং তাহার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়াছিলেন ইত্যাদি।

বিনোদার পিতা মুন্সীগঞ্জে উকিল ছিলেন, তাঁহার কৌশলে সে ঝোকটা সারিয়া যায়। সত্য ঘটনা যাহা হইয়াছিল এই

গ্রন্থে তাহা পাইবেন। এখন তাহার চরিত্র আপনারাই বিচার করুন।

ঐ বহি পৃঃ ২৬৪ ঃ—

"নাগ মহাশয় পিতার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে যে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়াছিলেন, তাহা মা ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন।"

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ঠাকুর কখনও এরূপ করেন নাই, মাও বিনোদিনীকে এসব কথা কখনও বলেন নাই। ঠাকুরের পিতা যে ভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

ঐ বহি পৃঃ ২৭৩—২৭৪ ঃ—

"শ্রাদ্ধের পর মাছ খাওয়ার দিন জ্ঞাতির হাতে খাইতে হয়।···মা মনের সাধ পূরাইয়া রান্না করিয়া নাগ মহাশয়কে খাওয়াইয়াছেন।"

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা অক্ষরে অক্ষরে মিথ্যা। শ্রাদ্ধের পর মাছ খাওয়ার দিন বিনোদিনীর মাতা দেওভোগই ছিলেন না। ঠাকুর তাঁহার হাতে কোন দিনই খান নাই। তিনি তাঁহাকে পাক করিতে দিবেন ইহাত বড় কথা, তিনি কাহাকেও এক ঘটী জল পর্য্যন্ত আনিতে দেন নাই।

ঐ বহি পৃঃ ২৭৫ ঃ—

"ঠাকুর-দাদা দেহত্যাগ করিয়াছেন পর নাগ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "আমার পিতা সদা শিব ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ

বৎসর যাবৎ আমার মা মারা গিয়াছেন, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে স্বপ্নেও তাঁহার রেতঃ পাত হয় নাই” ইত্যাদি।

ইহা একেবারেই মিথ্যা, শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও এরূপ বলেন নাই বা বলিতে পারেন না; কারণ ঠাকুর-দাদা মহাশয়ের কলিকাতায় অবস্থান কালে একটী সেবা দাসী ছিল।

ঐ বহি পৃঃ ৩৮৫—৩৮৬ ঃ—

“এক দিন নাগ মহাশয় ঘরে শুইয়া তিন বার হরিবোল বলিয়া তারাকান্তকে বলিলেন, আমাকে বাহির করিয়া ফেল্‌রে।...মা ঠাকুরাণী বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ? তিনি ভয় পাইয়া তারাকান্ত বাবুকে অভিসম্পাত দিলেন, তুই নাগ মহাশয়কে ভুলিয়া বিপথে যা!......মা ঠাকুরাণীর সাপের পূর্ণ ফল ফলিল।”

শ্রীশ্রীমা বলেন, এইসব একেবারেই মিথ্যা। মা কাহাকেও কোন দিন অভিসম্পাত করেন নাই। এসব-ই বিনোদিনীর নিজ কল্পিত; সত্য ঘটনা এই গ্রন্থে দেওয়া গেল।

ঐ বহি পৃঃ ৪৮৮—৪৮৯ ঃ—

“মা ঠাকুরাণী বলিলেন, “আমার সাবিত্রীর বর আছে, আমি স্বামী বাঁচাইতে পারিব। নাগ মহাশয় মা ঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, এত শক্ত হইও না!”

শ্রীশ্রীমা বলেন তিনি এরূপ কখনও বলেন নাই। এসবই মিথ্যা উক্তি। যাহা যাহা হইয়াছিল, এই গ্রন্থের অবয়বে দেখিতে পাইবেন।

ঐ বহি পৃঃ ৫২৯ ঃ—

"স্বামীর কাজ দেখিয়া, মা ঠাকুরাণীও বলিলেন, আপনি জন্ম জন্মান্তরে পুত্র ছিলেন ; পুত্রের কাজ করিলেন" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা সর্ব্বৈধ মিথ্যা, তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই।

ঐ বহি পৃঃ ৫৩০ ঃ—

"স্বামী বিক্রমপুর হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া গোয়ালা সহ ক্ষীর নিয়া গেলেন।......ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার সময় ক্ষীর ও সামান্য টাকা দেন।"

শ্রীশ্রীমা বলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ঠাকুরের শ্রাদ্ধে মা অন্যের কিছুই গ্রহণ করেন নাই ; এমন কি, মা তাঁহার ভগ্নাপতি কৈলাস দাসের টাকা পর্য্যন্ত নেন নাই।

ঐ বহি পৃঃ ৫৬৭—৫৬৮ ঃ—

"অনেক কাল প্লীহা ও লিবারের জ্বর ভোগ করিয়াছি। অসুখ হেতু সময় সময় ঋতু বন্ধ হইত। এক বার নয় মাস হইয়া যাইতেছে, পেট ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতেছে। বড় বড় ডাক্তার দেখান হইল, কেহ বলিতে পারিল না যে, আমার নয় মাসের গর্ভ।......নাগ মহাশয়ের কৃপায় অতিশয় অসুস্থ শরীরে একটী কন্যা প্রসব হইল। প্রসব বেদনা জনিত কষ্ট একেবারেই অনুভব করিলাম না।"

রুচির বাহাদুরী বটে! শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সব হইতে পারে, ইহা আমি শত মুখে স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ ব্যারাম দ্বারা ঋতু

২৩—

বন্ধ হইয়া সন্তান হওয়া এবং নয় মাসেও বড় বড় ডাক্তারের পরীক্ষা দ্বারা টের না পাওয়ার উক্তি কতদূর সত্য, তাহা গভীর গবেষণার বিষয় বটে!

বিনোদিনী তাহার পুস্তকে অনেক জায়গায় মাতাঠাকুরাণী ও ঠাকুরের নাম দিয়া অনেক কথা লিখিয়াছে, শ্রীশ্রীমা তাহার একটী কথাও স্বীকার করেন না, সবই উহার নিজ কল্পিত ও মিথ্যা, লোকের প্রত্যয় জন্য সে এরূপ উক্তি করিয়াছে।

অবশেষে আপনারা বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে একাই ঠাকুরের নিকট গিয়াছে, না, তাহার সমস্ত ভগিনী, ভাই, বাপ, মা, পিসী ইত্যাদি সকলেই গিয়াছেন? কেবল তাহারই উপর মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দয় ব্যবহারের কারণ সে নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, তাহারা ঠাকুরের কুটুম্ব। আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিয়াছি, তাহাতে, আপামর জন সাধারণ যেখানে আপন মাতৃ স্নেহ হইতেও অধিক আদর যত্ন পায়, সেখানে একমাত্র তাহার উপর ঠাকুরের কুটুম্ব বলিয়া এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক কিনা এবং ইহাও জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাহার এরূপ বিজাতীয় ক্রোধের নিগূঢ় কারণ সে কি সাহস করিয়া বলিতে সক্ষম?

শ্রীশ্রীমা'র প্রতি বিজাতীয় ক্রোধের কারণ যাহা আমরা জানি তাহা এইমাত্র বলিয়া রাখি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ রুক্ষ ও কঙ্কাল মাত্র ছিল তথাপি বিনোদার সুচতুর দৃষ্টি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরও এড়াইতে পারেন নাই। সে নানারূপ অপবিত্র ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইত ও তাঁহার বিছানায় বসিত।

অন্যতম কারণ বিনোদাকেই জিজ্ঞাস্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার এসব ব্যবহার ত্যক্ত বোধ করিতেন। কাজেই সে যখনি নির্জ্জনে ও গভীর রাত্রে একাকী ঠাকুরের নিকট যাইত বা বসিয়া কথা বলিত, তখন মা তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। এসব নানা কারণে তার শ্রীশ্রীঠাকুরেরর নিকট যাওয়াটা মা'র কেমন কেমন লাগিত এবং অযথা তাঁহাকে শুইতে খাইতে সময় অসময় ত্যক্ত করা মা'র প্রাণে বড়ই বাজিত। এসব সত্ত্বেও মা তাহাকে এক দিনও সম্মুখে কিছুই বলেন নাই বা আদর যত্নের ক্রুটী করেন নাই। বিনোদার লিখিত পুস্তক হইতে কয়েকটী স্থান পৃষ্ঠার নম্বর সহ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পড়িলেই তাহার চরিত্রের আভাস পাইবেন।

উপরোক্ত যে কয়েকটী ঘটনা লিখা হইল, ইহা পড়িয়া আপনারা শরৎ বাবুকে ও বিনোদিনী মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে মহাপুরুষদের জীবন জীব বুদ্ধি দ্বারা অনুমান ও কল্পনা করিয়া লিখার অধিকার তাহারা কোথায় পাইলেন; এবং এরূপ অনধিকার চর্চ্চার কোন দায়িত্ব আছে কিনা।

শ্রীমতি বিনোদিনী মিত্রের বহির উদ্ধৃতাংশ ও পৃষ্ঠার নম্বর।

ঐ বহি পৃঃ ৬৭ ঃ—

তিনি নাগ মহাশয়ের সমস্ত অঙ্গ সজীব দেখিতে পাইলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১১৩ ঃ—

আমি (লেখিকা) মনের আবেগে পড়িয়া গেলাম তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া পিঠে হাত বুলাইলেন আমাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১১৫ ঃ—

(লেখিকা) সুখময়ের বাতাসে সুখে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অন্ধকারে তিনি দাড়াইয়াছিলেন আমি (লেখিকা) ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

............মা অন্ধকারে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমাকে ধরিল।

ঐ বহি পৃঃ ১১৭ ঃ—

এমন ভাবে আমার দিকে (লেখিকার) তাকাইয়া রহিলেন আমি কথা বলিতে একটু লজ্জা পাইলাম। তিনি সরল ভাবে হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া তাহাকে আমার মহা আপন বলিয়া মনে হইল। লজ্জা ভাঙ্গিল।

ঐ বহি পৃঃ ১১৮ ঃ—

আমার (লেখিকার) মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এমন সুখময়কে শান্তিময়কে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? দয়াময় মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে নিয়া দক্ষিণের ঘরে গেলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১২০ ঃ—

(লেখিকা) তথায় যাইয়া দেখি নাগ মহাশয় পথের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাহাকে দেখিবা মাত্র তাড়াতাড়ি যাইয়া ধরিলাম।

ঐ বহি পৃঃ ১২১ ঃ—

শরীর অবসন্ন হইল। তিনি আমাকে (লেখিকাকে) কোলে করিয়া নিয়া বারান্দায় গেলেন এবং শোয়াইয়া রাখিলেন।

আজ কেবল এখানে সেখানে যাইতেছেন কি করি?

ঐ বহি পৃঃ ১২২ ঃ—

(লেখিকাকে) তিনি কোলে করিয়া নিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন।

ঐ বহি পৃঃ ১২৩ ঃ—

(লেখিকার) পিতা, মাতা, স্বামী, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা হইত না, কেবল তাহাকেই দেখিতে ইচ্ছা হয় তাহার কাছেই থাকিতে বাসনা হয়।

ঐ বহি পৃঃ ১৪০—১৪১ ঃ—

এমন ভাবে আদর করিলেন আমি (লেখিকা) এক বারে গলিয়া গেলাম……আমি লজ্জায় অধঃমুখী হইলাম।

ঐ বহি পৃঃ ১৪৩ ঃ—

আমি (লেখিকা) আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম, তাহাকে দেখিতে দেখিতে সংজ্ঞা হারাইলাম।

ঐ বহি পৃঃ ১৭৩ ঃ—

বয়স হইল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই হইল। আমরা (লেখিকা) চর্ম্ম সুখ ভোগ করিলে তিনি আমাদিগকে ভাল বাসিবেন না।

ঐ বহি পৃঃ ২১৭ ঃ—

পরমহংসদেবের স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ এক দিন তাঁহার স্ত্রী সহবাস ইচ্ছা হইয়াছিল।

ঐ বহি পৃঃ ৩১১ :—

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র তিনি আমার (লেখিকার) খোজ করিতেন।

ঐ বহি পৃঃ ৩১১—৩১২ :—

রাত্র ১টা বাজিয়া গেল (লেখিকার) তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা, তিনি আমাদের কাছে বসিয়া রহিলেন। গভীর রাত্র।

ঐ বহি পৃঃ ৩২৯ :—

আমাকে (লেখিকাকে) তাহার নিকট দেখিয়া নাগ মহাশয় বলিলেন। এত রাত্রিতে এখানে কেন ?

ঐ বহি পৃঃ ৩৩৫ :—

আমি (লেখিকা) তাহার স্নেহে আত্মহারা হইয়া নাগ মহাশয়কে ধরিতে তাহার সাম্‌নে যাইতেছি।

ঐ বহি পৃঃ ৩৬১ :—

কেহ নাগ মহাশয়ের মত আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। যতই গোপনে থাকুক না কেন কৃপাবশে ভক্তপাশে (লেখিকা) ধরা পড়িয়া ছিলেন।

ঐ বহি পৃঃ ৩৭৯ :—

সংসার হিসাবে আমার (লেখিকার) লজ্জা বড় কম ছিল।

(লেখিকার রুচি)

ঐ বহি পৃঃ ৪০৭ :—

কামাতুরা রমণী কি কখনও ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা চরিতার্থ না করিয়া তাহা ভুলিয়া থাকে ? সে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিতে

কি না করে ? লজ্জা ভয় ভুলিয়া গিয়া সদাসদ্ বিচার ছাড়িয়া দিয়া সুপথ কুপথ না ভাবিয়া যে প্রকারে হউক ভোগ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক বোধ করে। তখন তাহার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না যে কোন রূপে হউক সেই বাসনা পূর্ণ করিতে জীবন পণ করে।

ঐ বহি পৃঃ ৪০৭ :—

স্বামী ভাবে ভগবানে আসক্তি বেশী হয়।

ঐ বহি পৃঃ ৪১০ :—

গোপীরা স্বামীভাবে ধরিয়াই তাহাকে পাইয়াছিলেন। নাগ মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কি সহজে ধরা যায় ?

ঐ বহি পৃঃ ৫৭১ :—

উদ্বেলিত মনের পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না স্বয়ম্ভু জগদেবানী সেই ব্রহ্মা মন্মথ শরাঘাতে সেই মানস্ কন্যার পিছনে দৌড়াইয়াছিলেন।

বিনোদার পুস্তকে তাহার কথিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উক্তি।

ঐ বহি পৃঃ ১৫০ :—

ইহারা (লেখিকা) কেবল দেখিয়াই সুখী। যাহাকে দেখিতে আসে তাঁহার সুখের দিকে চায় না। চক্ষে দেখে উনি সময় মত খান না, সময় মত শোন না। লোকের জন্য কত খাটিতে হয়।

ঐ বহি পৃঃ ৩২৯ :—

অনেক রাত্র হইয়াছে। মানুষের (লেখিকার) জ্বালায় সময় মত শুইতে পারেন না সময় মত খাইতে পারেন না ইত্যাদি।

লেখিকার প্রতি উপদেশ।

ঐ বহি পৃঃ ৪১১ ঃ—

নাগ মহাশয় সকলকেই উপদেশ দিতেন। যাহার যাহা উপযোগী তাহাকে তাহা বলিতেন।

ঐ বহি পৃঃ ১৩৩ ঃ—

তোমার ভয়ে ভুত কাঁপবে………।

ঐ বহি পৃঃ ১৯৯ ঃ—

কাহাকেও বিশ্বাস করিও না।

ঐ বহি পৃঃ ২০০ ঃ—

পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান।

ঐ বহি পৃঃ ২০৩ ঃ—

মেয়েদের সতীত্ব থাকিলে সকলই থাকে।

ঐ বহি পৃঃ ৪০১ ঃ—

মেয়েদের ধর্ম্ম ঘরে বসিয়া হয়। কোথাও গিয়া তাহাদের ধর্ম্ম হয় না। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না।

ঐ বহি পৃঃ ৪১৫ ঃ—

সতীত্ব তোমাদের রত্ন। তাহা একবার হারাইলে লোকে তাহা বলিবেই।

ঐ বহি পৃঃ ৪২৩ ঃ—

এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন যে স্বামী স্ত্রীকে শাসন না করে সে স্বামীর যোগ্য নয়।

ঐ বহি পৃঃ ৪৬৬ ঃ—

কলিকালে লিঙ্গই সিংহ হইয়া ঘাড় কামড়াইয়া দেয়। সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না।